পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১
Poultry Rearing and Farming-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক
মুহাম্মদ কামরুল হাসান ভূঞা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পোল্ট্রি)
গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাজীপুর।

সম্পাদক
মোঃ জহুরুল ইসলাম
চীফ ইন্সট্রাক্টর (পোল্ট্রি)
শেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শেরপুর

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর,২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : ,২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র-

প্রথম পত্র (বিষয় কোড-৮০১৩)

অধ্যায়	শিরোনাম (তাত্ত্বিক)	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	পোল্ট্রির অর্থনৈতিক গুরুত্ব	০১
দ্বিতীয়অধ্যায়	মুরগির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পরিচিতি	০৯
তৃতীয় অধ্যায়	মুরগির বিভিন্ন জাত পরিচিতি	১৭
চতুর্থ অধ্যায়	মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	মুরগির বিভিন্ন ধরনের খামার স্থাপন	৪০
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলাদেশে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্রয়লার হাইব্রিড পরিচিতি	৪৭
সপ্তম অধ্যায়	ব্রয়লার পালন পদ্ধতি	৫০
অষ্টম অধ্যায়	ব্রয়লার পালনের বাসস্থান প্রস্তুতি	৫৬
নবম অধ্যায়	লিটার	৫৯
দশম অধ্যায়	ব্রয়লার বাচ্চা সংগ্রহ ও পরিবহন	৬৩
একাদশ অধ্যায়	ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং	৬৭
দ্বাদশ অধ্যায়	ব্রয়লারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৭৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ব্রয়লারের বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনা	৮৫
চতুর্দশ অধ্যায়	ব্রয়লারের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	৮৭
পঞ্চদশ অধ্যায়	ব্রয়লার বাজারজাতকরণ	১২৬
ষোড়শ অধ্যায়	ব্রয়লারের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি	১৩০

ব্যবহারিক	জবের নাম	পৃষ্ঠা
জব নং-০১	মুরগির বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শনাক্তকরণ	১৩৫
জব নং-০২	মুরগির আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের শনাক্তকরণ (পরিপাকতন্ত্র)	১৩৭
জব নং-০৩	মুরগির আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের শনাক্তকরণ (প্রজননতন্ত্র)	১৩৯
জব নং-০৪	মুরগির জাত শনাক্তকরণ	১৪২
জব নং -০৫	ব্রয়লার খামারের প্রকল্প প্রণয়ন	১৪৬
জব নং-০৬	ব্রয়লার পালন কক্ষ প্রস্তুতকরণ	১৪৮
জব নং-০৭	ব্রয়লার ঘরে যন্ত্রপাতি স্থাপন	১৫০
জব নং-০৮	ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং	১৫২
জব নং -০৯	লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন	১৫৪
জব নং- ১০	ব্রয়লার খাদ্য উপকারসমূহ শনাক্তরণ	১৫৬
জব নং-১১	ব্রয়লারের সুষম রেশন তৈরি	১৬০
জব নং-১২	ব্রয়লারের পালনে প্রতিষেধক টিকা প্রদান	১৬২
জব নং-১৩	ব্রয়লার ড্রেসিং পদ্ধতি	১৬৪
জব নং-১৪	ব্রয়রারের প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ	১৬৬
জব নং-১৫	ব্রয়লার খামার পরিদর্শন	১৬৮

দ্বিতীয় পত্র (বিষয় কোড-৮০২৩)

অধ্যায়	শিরোনাম (তাত্ত্বিক)	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	বাংলাদেশ প্রাপ্ত লেয়ার হাইব্রিড পরিচিতি	১৭১
দ্বিতীয় অধ্যায়	লেয়ার খামার স্থাপন	১৭৫
তৃতীয় অধ্যায়	লেয়ার মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি	১৮০
চতুর্থ অধ্যায়	লেয়ার পালনের বাসস্থান প্রস্তুতকরণ	১৮৬
পঞ্চম অধ্যায়	লেয়ারের প্রকারভেদ ও ব্যবস্থাপনা	১৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়	লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং	১৯৫
সপ্তম অধ্যায়	লেয়ার ঘরে আলোক কর্মসূচি	২০৩
অষ্টম অধ্যায়	লেয়ারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	২০৬
নবম অধ্যায়	লেয়ারের বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনা	২২১
দশম অধ্যায়	লেয়ার খামারের কার্যাবলি	২২৫
একাদশ অধ্যায়	লেয়ার মুরগির রোগ ব্যবস্থাপনা	২২৯
দ্বাদশ অধ্যায়	ডিমপাড়া মুরগির ঠোঁট কাটা বা ডিবিকিং	২৮২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ডিম উৎপাদন ও সংগ্রহ	২৮৭
চতুর্দশ অধ্যায়	ডিম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ	২৯৪

ব্যবহারিক	জবের নাম	পৃষ্ঠা
জব নং-০১	লেয়ার হাইব্রিড মুরগি শনাক্তকরণ	২৯৯
জব নং-০২	লেয়ার মুরগি বাছাইকরণ	৩০১
জব নং-০৩	নন-লেয়ার মুরগি বাছাইকরণ	৩০৩
জব নং-০৪	অধিক ও কম উৎপাদনশীল মুরগি পার্থক্য	৩০৫
জব নং -০৫	মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	৩০৭
জব নং-০৬	লেয়ার মুরগির ঘরে খাবার ও পানির পাত্র স্থাপন	৩০৮
জব নং-০৭	লেয়ার মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন	৩০৯
জব নং-০৮	খাঁচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি পালন	৩১১
জব নং-০৯	লেয়ার বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা	৩১৩
জব নং-১০	মুরগির ঠোঁট কাটা	৩১৫
জব নং-১১	লেয়ার খামারের প্রকল্প প্রণয়ন (১০০০ লেয়ারের জন্য)	৩১৭
জন নং-১২	লেয়ার খামারে টিকাদান পদ্ধতি	৩১৯
জন নং-১৩	লেযার মুরগির সুষম খাদ্য তৈরিকরণ	৩২২
জন নং-১৪	মুরগির খামারে তথ্য সংরক্ষণ	৩২৪
জন নং-১৫	খামারের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৩৩০
জন নং-১৬	লেয়ার মুরগির খামার পরিদর্শন	৩৩১
	তথ্য উৎস	৩৩৩

প্রথম অধ্যায়
পোল্ট্রির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীতে প্রায় আট হাজার ছয়শত প্রজাতির পাখি রয়েছে। এসব পাখি নানাভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রেখেছে। মানুষ কিছু কিছু পাখিকে পোষ মানিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করে দীর্ঘদিন যাবৎ খাদ্য চাহিদার এক বিরাট অংশ পূরণ করেছে। আবার কিছু কিছু পাখি মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্যও পালন করে থাকে। পোষ মানানো এবং গৃহে পালিত সকল পাখিকেই সাধারণত গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রির অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। পোল্ট্রি (Poultry) বলতে সেসব পাখিকেই বুঝানো হয় যেগুলোকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত: ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে, মানুষের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করা হয়। আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি ও জাতের পাখি পালন করতে দেখা যায়। তবে, হাঁসমুরগি পৃথিবীর সকল দেশেই গৃহপালিত পাখি হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে আসছে। আমাদের দেশেও স্মরণাতীতকাল থেকেই মানুষ হাঁসমুরগি পালন করছে। আর এ পাখিগুলো আমাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে মানুষও পাখি পালনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হওয়ার নানা কৌশল আয়ত্ত করেছে। তাই কৃষিপ্রধান আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি পালনের আধুনিক জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

১.১ পোল্ট্রির সংজ্ঞা ঃ

পোল্ট্রি বলতে পাখির ঐ সমস্ত প্রজাতিকে বুঝায় যেগুলো মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে লালিত-পালিত হয়, বংশবৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক তাদের পোল্ট্রি বলে। যেমন: হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি।

পোল্ট্রির চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান:

(ক) পাখির নির্দিষ্ট প্রজাতি
(খ) মানুষের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়।
(গ) মানুষের তত্ত্বাবধানে বংশ বৃদ্ধি করে এবং
(ঘ) পালন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ।

১.২ বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রির নাম :

বর্তমানে পাখির ১১টি প্রজাতি পোল্ট্রি শ্রেণিভুক্ত :

১. মুরগি
২. হাঁস
৩. কবুতর
৪. রাজহাঁস
৫. কোয়েল
৬. গিনি ফাউল বা তিতির।
৭. পি ফাউল
৮. ফিজেন্ট
৯. সোয়ান
১০. টার্কি ও
১১. উট পাখি

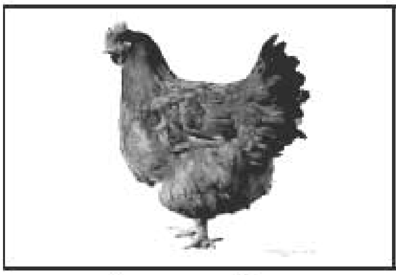

চিত্র-১.১ মুরগি

চিত্র-১.২ হাঁস

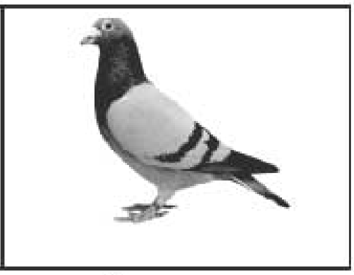

চিত্র-১.৩ কবুতর

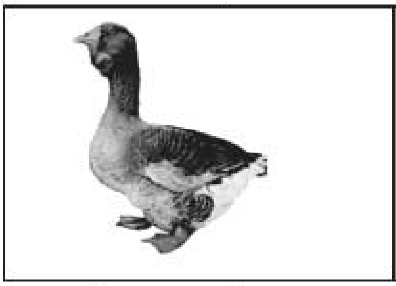

চিত্র-১.৪ রাজহাঁস

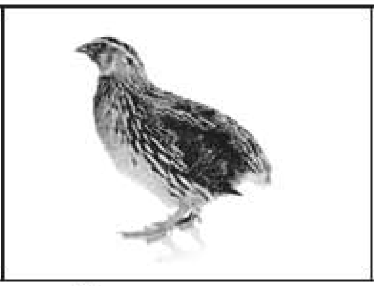

চিত্র-১.৫ কোয়েল

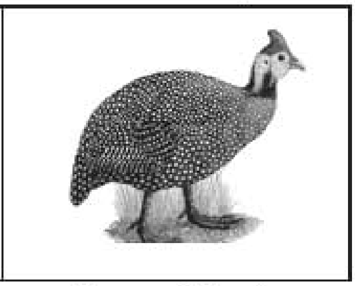

চিত্র-১.৬ গিনি ফাউল

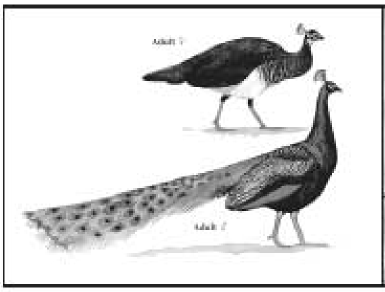

চিত্র-১.৭ পি ফাউল

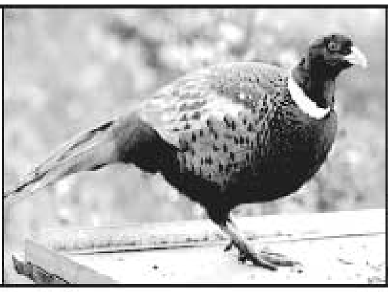

চিত্র-১.৮ফিজেন্ট

চিত্র-১.৯ সোয়ান

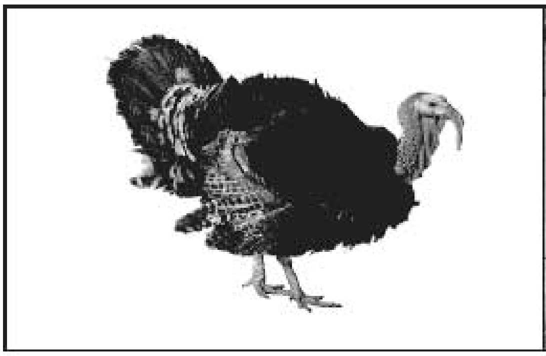

চিত্র-১.১০ টার্কি

চিত্র-১.১১ উট পাখি

চিত্র:১.১ বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি

১.৩ পোল্ট্রি সম্পর্কিত পরিভাষা

- **পোল্ট্রি :** পোল্ট্রি বলতে ঐ সব পাখির প্রজাতিকে বুঝায় যেগুলো মানুষের তত্ত্বধানে লালিত-পালিত হয়, বংশবৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক। যেমন-মুরগি, হাঁস, রাজহাঁস, কবুতর, কোয়েল, তিতির, টার্কি এবং উট পাখি।
- **পোল্ট্রি বিজ্ঞান :** বিজ্ঞানের যে শাখায় পোল্ট্রির উৎপত্তি, ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং রোগদমন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পোল্ট্রি বিজ্ঞান বলে।
- **লেয়ার :** ডিমপাড়া মুরগিকে সাধারণভাবে লেয়ার বলা হয়।
- **লেয়ার ব্রুডার :** জন্মের পর থেকে ৪-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত স্ত্রী জাতীয় মুরগিকে লেয়ার ব্রুডার বলে।
- **লেয়ার গ্রোয়ার :** ৫-৭ সপ্তাহ বয়স থেকে শুরু করে ১৩-১৫ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত স্ত্রী জাতীয় মুরগিকে লেয়ার গ্রোয়ার বলে।
- **লেয়ার :** ১৪-১৬ সপ্তাহ বয়স থেকে শুরু করে ৭২-৮২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত স্ত্রী জাতীয় মুরগিকে লেয়ার বলে।
- **ককরেল :** এক বছরের কমবয়স্ক পুরুষ জাতীয় মুরগিকে ককরেল বলে।
- **পুলেট :** এক বছর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী জাতীয় মুরগিকে পুলেট বলে।
- **রাইটেইল :** যে লেজ স্থায়ীভাবে একদিকে হেলে থাকে তাকে রাইটেইল বলে।
- **কম্ব :** মোরগ-মুরগির ঝুঁটিকে কম্ব বলে।
- **ডিবিকিং :** মোরগ-মুরগির ঠোঁট কেটে দেওয়ার পদ্ধতিকে ডিবিকিং বলে।
- **ডিবিকার :** পাখির ঠোঁট কাটার যন্ত্রকে ডিবিকার বলে।
- **ক্লাচ :** মুরগি একনাগাড়ে যে কয়দিন ডিম পাড়ে তাকে ক্লাচ বলে।
- **পচ :** দুটি ক্লাচের মধ্যবর্তী ডিম পাড়ার বিরতি কালকে পচ বলে।
- **কক :** এক বছরের বেশি বয়স্ক পুরুষ জাতীয় মুরগিকে কক/মোরগ বলে।
- **হেন :** এক বছর অপেক্ষা বেশি বয়স্ক স্ত্রী জাতীয় মুরগিকে হেন বলে।
- **রেডি টু লে পুলেট :** খুব শীঘ্রই ডিম পাড়বে এমন মুরগিকে রেডি টু লে পুলেট বলে।
- **জাত :** জাত বলতে এমন একদল প্রাণীকে বোঝায় যাদের একই আকার, আকৃতি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চালিত হয়। যেমন–লেগহর্ন, আরআইআর।
- **উপজাত :** শুধুমাত্র পালকের রং এবং ঝুঁটির গঠনের ওপর ভিত্তি করে একটি জাতের অধীনস্থ পাখিসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হলে তার প্রত্যেকটি ভাগকে এক একটি উপজাত বলে। যেমন–হোয়াইট লেগহর্ন, সিংগল কম্ব আরআইআর।
- **বিশেষ উপজাত :** কোনো প্রজননকারী কর্তৃক কমপক্ষে পাঁচ বংশ ধরে বিশেষ প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট বিশেষ নামধারী মুরগির উপজাতের অধীনস্থ দলকে বিশেষ উপজাত বা স্ট্রেইন বলে। যেমন–স্টারক্রস, লোহম্যান, হাইসেক্স, হাই ব্রো, স্টার ব্রো।
- **পুষিন :** ডিম উৎপাদনকারী স্ট্রেইনের পুরুষ বাচ্চাকে মাংসের জন্য পালন করলে তাকে পুষিন বলে।
- **ক্যাপন :** অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খোঁজাকৃত (খাসিকৃত) মোরগকে ক্যাপন বলে।
- **প্লুমেজ :** পাখির শরীরের বাহিরের পালকের আবরণকে প্লুমেজ বলে।
- **ডাবিং :** মোরগ-মুরগির ঝুঁটি, কানের লতি কেটে দেয়াকে ডাবিং বলে। যাতে তাপ বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য শীতপ্রধান দেশে ডাবিং করা হয়।

- **ডন :** বাচ্চা ফোটার পর পরই বাচ্চার শরীরে যে নরম পালক থাকে তাকে ডন বলে।
- **কক ব্রিডার :** যে মুরগির ডিম থেকে বেশিসংখ্যক পুরুষ বাচ্চা হয় তাকে কক ব্রিডার বলে।
- **ব্রুডিনেস্ (কুঁচেভাব):** মুরগির মাতৃসুলভ আচরণ বা ডিমে তা দেয়ার প্রবণতাকে ব্রুডিনেস্ বলে।
- **পিক অর্ডার :** মোরগ-মুরগির মাতব্বরি করার বৈশিষ্ট্য/স্বভাবকে পিক অর্ডার বলে।
- **স্পার :** মোরগের ক্ষেত্রে পায়ের পেছনের দিকে আংগুলের মতো অতিরিক্ত অংশকে স্পার বলে।
- **রোস্টার :** ৩-৮ মাস বয়সের মোরগকে রোস্টার বলে।
- **স্ট্যাগ :** ৯-১০ মাস বয়সের খোঁজাকৃত মোরগকে স্ট্যাগ বলে।
- **ক্রপ :** পোল্ট্রির খাদ্য থলিকে ক্রপ বলে।
- **ক্রপ মিল্ক :** কবুতরের বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য কবুতরের (পুরুষ ও স্ত্রী) খাদ্য থলিতে যে দুধের মতো তরল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে ক্রপ মিল্ক বলে।
- **শ্যাংক :** পোল্ট্রির পায়ের নলাকে শ্যাংক বলে।
- **চিকেন :** ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুরগিকে চিকেন বলে।
- **স্ট্রেইট রান চিক :** যেসব মুরগির বাচ্চার স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করা হয়নি সেগুলোকে একত্রে স্ট্রেইট রান চিক বলে।
- **ব্রয়লার :** বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাংসের জন্য ৬-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত যেসব মোরগ-মুরগি পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার বলে।
- **লিটার :** মোরগ-মুরগির বিছানা হিসেবে যেসব দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তাদের লিটার বলে। যেমন- ধানের তুস, কাঠের গুঁড়া, আখের ছোবড়া, খড়ের টুকরা, বালি, ছাই ইত্যাদি।
- **ব্রুডার :** যে যন্ত্রের সাহায্যে পাখির বাচ্চাকে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার বলে।
- **চিক গার্ড :** যে গোলাকার বেষ্টনির সাহায্যে বাচ্চা ঘিরে রাখা হয়, তাকে চিকগার্ড বলে।
- **ইনকিউবেটর :** যে যন্ত্রের সাহায্যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো হয় তাকে ইনকিউবেটর বলে।
- **ক্যান্ডলার :** যে যন্ত্রে আলোর সাহায্যে ডিমের ভিতরের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়, তাকে ক্যান্ডলার বলে।
- **ফিডার :** মোরগ-মুরগির খাবারের পাত্রকে ফিডার বলে।
- **ওয়াটারার:** মোরগ-মুরগির পানির পাত্রকে ওয়াটারার বলে।
- **কেজ :** মোরগ-মুরগি পালনের খাঁচাকে কেজ বলে। একে ব্যাটারিও বলা হয়।
- **গ্রোয়িং চিক :** ৮ সপ্তাহ (২ মাস) থেকে ১৮ সপ্তাহ (৪ মাস) বয়স পর্যন্ত মোরগ-মুরগিকে গ্রোয়িং চিক বলে।
- **মোল্টিং :** মুরগির পালক পাল্টানোকে মোল্টিং বলে।
- **ডে ওল্ড চিক :** জন্মের পর থেকে শুরু করে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত মুরগির বাচ্চাকে ডে ওল্ড চিক বলে।

১.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের পরিসংখ্যান :

বাংলাদেশে পোল্ট্রি একটি দ্রুতবর্ধনশীল সেক্টর। দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমিষের ঘাটতি মেটাতে পোল্ট্রি শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এ শিল্প সর্বনিম্ন মূল্যে সবচেয়ে ভালো গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ (ডিম ও মাংস) সরবরাহ করে থাকে। আমাদের দেশে মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্যতা বছরে ৭.৬ কেজি, অথচ সারা বিশ্বের স্টান্ডার্ড হলো ৮০ কেজি। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাংসের ৫০-৫৫% আসে মুরগির মাংস থেকে (যার ৬৫-৭০% আসে ব্রয়লারের

মাংস থেকে এবং ৩০-৩৫% আসে দেশি হাঁস-মুরগি ও বাতিল লেয়ার মুরগি থেকে)। মোট প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৩৮% আসে মুরগির মাংস ও ডিম থেকে। প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এ সেক্টরের সাথে জড়িত।

শহর ও উপশহর এলাকায় লেয়ার ও ব্রয়লার খামার গড়ে উঠলেও এখনও গ্রামে-গঞ্জে দেশি মুরগিই বেশি পালন করা হয়। ছেড়ে পালা পদ্ধতিতে এখনও ৬০-৭০% মুরগি পালা হয়। নিবিড় পদ্ধতিতে ৩০-৩৫% মুরগি পালা হয় এবং আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ২-৩% মুরগি পালা হয়। ব্রয়লার খামার করে দ্রুত আমিষের চাহিদা মেটানোসহ টাকা তাড়াতাড়ি রিটার্ণ পাওয়া যায় বলে ব্রয়লার পালন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

এ শিল্পের সাথে জড়িত হ্যাচারি, ফিড মিল, যন্ত্রপাতি তৈরির প্রতিষ্ঠান, ব্রয়লার ও ব্রয়লারজাত পণ্য বিপণন করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ব্রয়লার জীবন্ত হিসেবে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। আবার প্রক্রিয়াজাত করে আস্ত ব্রয়লার বা বিভিন্ন অংশ আলাদা করে প্যাকেটজাত ব্রয়লার বড় শপিং মলে বিক্রি করা হয়। ব্রয়লারের আস্ত গ্রিল মাংস একটি জনপ্রিয় খাদ্য। এদেশে প্রায় ১৩০টি হ্যাচারি বাচ্চা উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকলেও বর্তমানে এর ৬৫-৭০% কার্যকর আছে। ৮৫% হ্যাচারি শুধু ব্রয়লার বাচ্চা উৎপাদন করে এবং ১৫% হ্যাচারি লেয়ার ও ব্রয়লার দুই ধরনের বাচ্চাই উৎপাদন করে।

গ্রামে পারিবারিক পদ্ধতিতে এখনও অনেক মুরগি পালন করা হয়। গ্রামের ৯০% পরিবার দেশি হাঁস ও মুরগি পালন করে থাকে। বাংলাদেশে মোট পোল্ট্রির সংখ্যার ৯০% হলো মুরগি, হাঁস ৮% এবং অন্যান্য পোল্ট্রি (যেমন- কবুতর, রাজহাঁস, কোয়েল) হলো ২%।

হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যান

পোল্ট্রির নাম	বছর				
	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
মোরগ-মুরগি (মিলিয়ন)	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.১১	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩
হাঁস (মিলিয়ন)	**৪৫৭.০০**	**৪৭২.৫৪**	**৪৮০.০৪**	**৫০২.২২**	**৫২২.৪০**

উৎস : পশুসম্পদ অধিদপ্তর

বিগত বছর অনুযায়ী ডিম ও মাংস উৎপাদন ও চাহিদা

পণ্যের নাম	একক	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
ডিম	মিলিয়ন মেট্রিক টন	১০১৬৮.০	১০৯৯৫.২	১১৯১২.৪
মাংস	মিলিয়ন সংখ্যায়	৪.৫২	৫.৮৬	৬.১৫

উৎস: পশুসম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা

পণ্যের নাম	চাহিদা		উৎপাদন		প্রাপ্যতা		অভাব	
সাল	২০০১	২০১৬	২০০১	২০১৬	২০০১	২০১৬	২০০১	২০১৬
মাংস (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	৫.৬৯	৭.০৫	০.৭৮	৬.১৫	১৬.৪৪	১০৬.২১	৪.৯১	০.৯
ডিম(মিলিয়ন)	১৩৫২০	১৬৭৪৪.০	৪৪২৪	১১৯১২.৪	৩৪.০৩	৭৫.০৬	৯০৯৬	৪৮৩১.৬

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণী সম্পদের অবদান :

বিবরণ	অবদান
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৬)	৩.২১%
জিডিপি (২০১৫-২০১৬)	১.৬৬%
কৃষিতে প্রাণী সম্পদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	১৪.২১%
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (প্রত্যক্ষ)	২০%
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (পরোক্ষ)	৫০%
জিডিপি ভলিউম (মিলিয়ন টাকায়)	৩২৯১০০

(BBS 2015-2016)

জিডিপিতে প্রাণী সম্পদের অবদান :

	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
জিডিপি	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬
প্রবৃদ্ধির হার	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩	৩.১০	৩.২১

উৎস : পশুসম্পদ অধিদপ্তর

১.৫ পোল্ট্রি পালনের গুরুত্ব

মোরগ-মুরগি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। পোল্ট্রি আমাদের আমিষজাত খাদ্য ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন মানুষের দৈনিক ১১০-১২০ গ্রাম আমিষের প্রয়োজন, যার মধ্যে ২১ গ্রাম প্রাণিজ আমিষ পাচ্ছি। দেশে ব্যাপক চাহিদা এবং অধিক হারে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি খামারকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ী, পেশাজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

মানবজীবনের সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং দৈনন্দিন জীবনে পোল্ট্রির গুরুত্ব নিচে দেওয়া হলো:-

১. উন্নত মানের সুস্বাদু প্রাণিজ আমিষ হিসেবে ডিম ও মাংস উৎপাদন :

পোল্ট্রি পালনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ডিম ও মাংস উৎপাদন। এদেশে বেশির ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করে। তারা অপুষ্টির শিকার। আমিষ খাদ্য আমাদের পুষ্টি সরবরাহ,শরীর গঠন ও ক্ষয় পূরণ করে এবং রুচি বৃদ্ধি করে। বসতবাড়িতে কিছু না কিছু পাখি পালন করে তার ডিম ও মাংস দ্বারাও ঘাটতি পূরণ করা

২০২০

সম্ভব। হাঁস-মুরগির ডিম অন্যান্য প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের চেয়ে তুলনামূলকভাবে দামে কম এবং সহজলভ্য। ২৫০ গ্রাম মাছের চেয়ে ২টি হাঁস বা মুরগির ডিমের পুষ্টিমান অনেক বেশি।

২. আয়ের উৎস হিসেবে : আমাদের দেশে প্রত্যেক কৃষকের বাড়িতেই কমবেশি হাঁস-মুরগি আছে। নিজ পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে তারা তাদের অবশিষ্ট ডিম ও মুরগি বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছে। বাণিজ্যিকভাবে অল্প সময়ে মুরগি পালনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

৩. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণে : বেকার সমস্যা দূরীকরণ তথা জাতীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এখন দরকার কর্মসংস্থান। এক্ষেত্রে পোল্ট্রিশিল্প বেকারদের জন্য আশার আলো জ্বালাতে পারে। শিক্ষিত বেকাররা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠান পোল্ট্রি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে পোল্ট্রি পালনসহ পোল্ট্রি সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

৪. জৈব সার হিসেবে বিষ্ঠার ব্যবহার :- মুরগির বিষ্ঠা বা খামারের লিটার সবজির বাগানে ও ফসলের ক্ষেত্রে উত্তম সার হিসেবে ব্যবহার হয়। বড় বড় খামারিরা তাদের খামারের লিটার কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য কৃষকদের নিকট বিক্রি করছে। পোল্ট্রির লিটার উত্তম জৈব সার যা অন্যান্য পশুপাখির বিষ্ঠা অপেক্ষা বেশি গুণগতমানের। এই জৈব সার মাছ চাষেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পোল্ট্রি লিটার থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে জ্বালানির সাশ্রয় হয় এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে।

৫. সার হিসেবে হাড়ের ব্যবহার : হাঁস-মুরগির নরম ও সরু হাড় সহজে গুঁড়া করা যায় এবং জমিতে তাড়াতাড়ি মিশে গিয়ে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়।

৬. পালকের ব্যবহার : ঘরদোর পরিষ্কার করা ও ধুলাবালি ঝাড়ার জন্য এক ধরনের পালকের ঝাড়ু বাজারে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বালিশ, গদি ও সার প্রস্তুতে পালক ব্যবহার করা হয়। পোল্ট্রির পালক দ্বারা খেলনা তৈরি করা হয়।

৭. অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার : ডিমের বিভিন্ন অংশ ভ্যাকসিন, কালচার মিডিয়া, পশুপাখির খাবার, জমির সার, বার্নিশ, ছাপার কালি, ছবি তোলা, বই বাঁধানো, সাবান, শ্যাম্পু, চামড়া শুকানো, সুতার রং করা ইত্যাদি শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

৮. উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার : গৃহপালিত পাখির রক্ত, নাড়িভুঁড়ি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯. গবেষণা কাজে : গবেষণাগারে হাঁস-মুরগিকে গবেষণা প্রাণী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১০. আমোদ প্রমোদের উৎস হিসেবে : মোরগ লড়াই এখনও গ্রামে-গঞ্জে মজার খেলা উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া মাসকোভী ও রাজহাঁস শোভাবর্ধনকারী হিসেবে পালা হয়।

১১. পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি : পুরুষের পাশাপাশি নারীরা হাঁস-মুরগি পালন করে ডিম ও মুরগি বিক্রির অর্থ দ্বারা বাচ্চাদের লেখাপড়ার খরচ মেটানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট ছোট প্রয়োজন মেটাতেও পারে। এতে পরিবারে ঐ নারীর মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করে তার সম্পদ বৃদ্ধি পেলে সমাজে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

২০২০

অতএব উল্লিখিত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পোল্ট্রি শিল্প এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পোল্ট্রি কাকে বলে?
২. পৃথিবীতে কত প্রজাতির পাখি আছে?
৩. পোল্ট্রি বিজ্ঞান কাকে বলে?
৪. ডে ওল্ড চিক কাকে বলে?
৫. ক্লাচ কী?
৬. ডন কাকে বলে।
৭. পুষিন কাকে বলে।
৮. আমাদের দেশে পোল্ট্রির মোট সংখ্যার শতকরা কত ভাগ মুরগি?
৯. আমাদের দেশে মুরগির সংখ্যা কত মিলিয়ন?
১০. সারা দেশে ডিমের ও মাংসের বার্ষিক উৎপাদন কত?
১১. পুলেট ও ককরেল কাকে বলে ?
১২. পচ কী?
১৩. বেবিচিক কী?
১৪. ক্যান্ডলার কী?
১৫. মোল্টিং কী?
১৬. ডাবিং কী?
১৭. চিক গার্ড কী?
১৮. প্লুমেজ কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পোল্ট্রির বৈশিষ্ট্য লিখ।
২. পোল্ট্রির প্রজাতিগুলোর নাম লিখ?
৩. জৈব সার হিসেবে বিষ্ঠার ব্যবহার লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পোল্ট্রির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. বাংলাদেশের পোল্ট্রির পরিসংখ্যানের বিবারন দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুরগির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পরিচিতি

২.১ মোরগ-মুরগির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ:

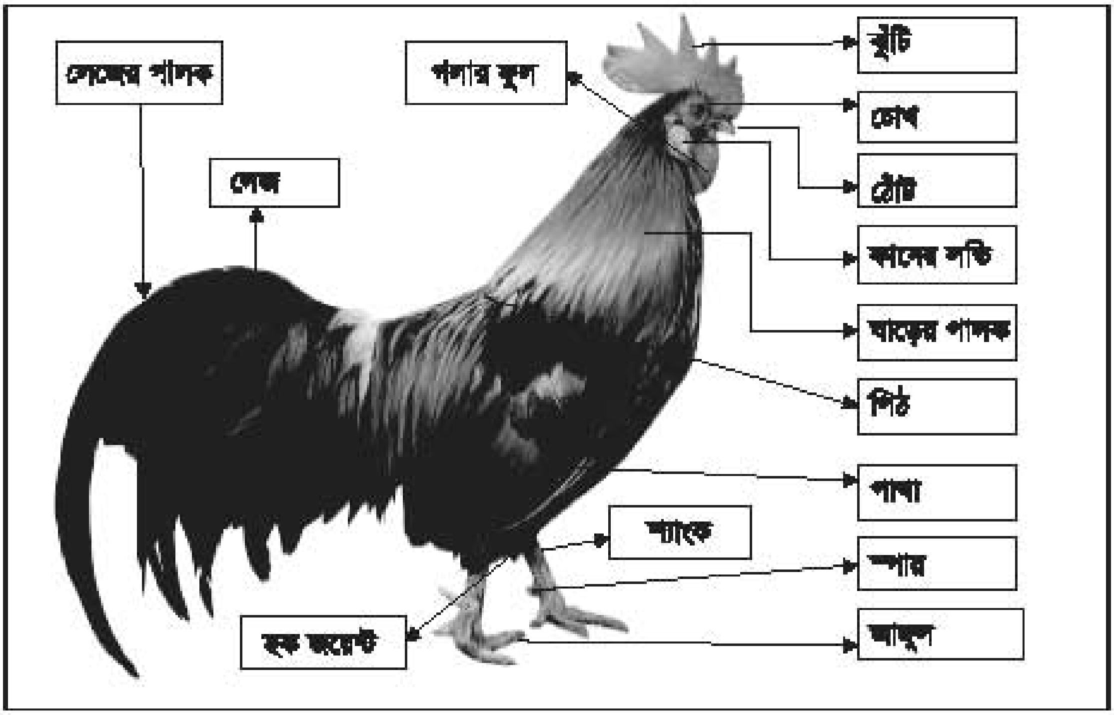

চিত্র : ২.১ মোরগের বাহ্যিক অঙ্গ সমূহ।

মোরগের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ:

ক) মাথা, ঠোঁট, নাকের ছিদ্র, কান, কানের লতি, ঝুঁটি, ওয়াটল ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত দেহের অগ্রভাগ।

খ) চোখ : মাথার, দুই পাশে দুটি গোল চোখ।

গ) ঝুঁটি : মাথার উপর খাঁজকাটা ঝুঁটি থাকে।

ঘ) ওয়াটল। ঠোঁটের কাছে দুই পাশে দুটো লাল রঙের মাংসপিণ্ডই ওয়াটল।

ঙ) কানের লতি : প্রত্যেক কান থেকে একটা চামড়ার মতো লতি ঝুলে থাকে।

চ) গ্রীবা বা গলা : গ্রীবা মাথা ও ধড়কে সংযুক্ত করে, এর সাহায্যে মোরগ মাথা এদিক ওদিক ঘোরাতে পারে। গলদেশের দুই পাশে সরু পালক থাকে। আবার পালক নাও থাকতে পারে। এদেরকে গলাছিলা বলে।

ছ) খাদ্য থলি : গলার নিচের অংশে খাদ্য জমা হওয়ার থলি অবস্থিত। খাদ্য প্রথমে এখানে জমা হয়।

জ) পাখা : পিঠের উপর দুইদিকে বিস্তৃত দুটি ডানা থাকে, যা দ্বারা মোরগ উড়তে পারে।

ঝ) পালক : পাখার যে পালক থাকে তা উড়বার কাজে লাগে।

ঞ) পা। মোরগের পশ্চাৎভাগে দুইটি পা থাকে। পায়ের উপরের অংশকে উরু, নিচের অংশকে শ্যাংক এবং উরু ও শ্যাংকের মাঝের গাঁটকে হক (Hock) বলে।

ট) বুক : গলার নিচের দিকে দেহের তলদেশের মাংসল অংশই হলো বুক।

ঠ) পায়ের আঙ্গুল : প্রতি পায়ে ৪টি আঙ্গুল থাকে। সামনের দিকে ৩টি ও পিছনের দিকে ১টি আঙ্গুল। আঙ্গুলের আগায় নখ থাকে।

ড) স্পার : মোরগের বয়স হলে পেছনের আঙ্গুলের উপর কাটার মতো বর্ধিত অংশ তৈরি হয় তাই স্পার।

ঢ) সিকল ফেদার : মোরগের লেজের কাস্তের মতো বাঁকানো পালকগুলোকে সিকল ফেদার বলে।

ন) জিন (Shadle) পালক : লেজের গোড়া থেকে নিচের দিকে ঝুলে থাকা পালককে জিন পালক বলে।

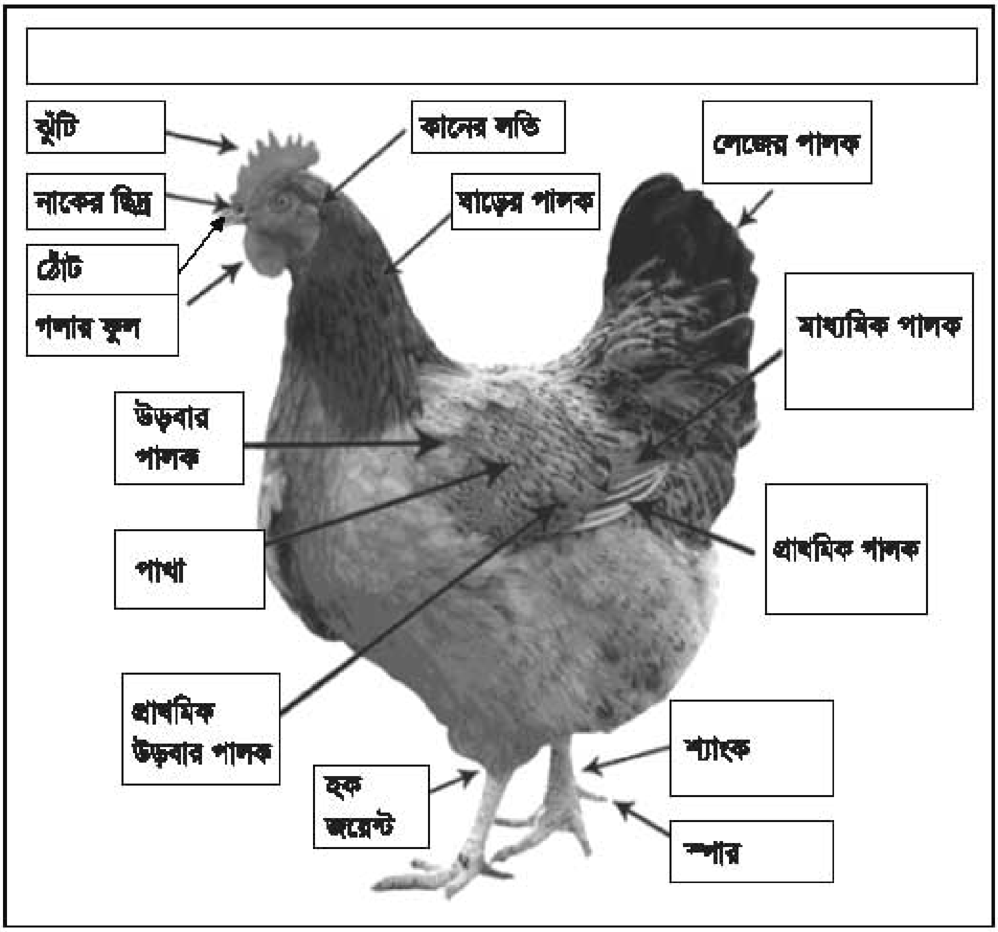

চিত্র : ২.২ মোরগির বাহ্যিক অঙ্গ সমূহ।

মুরগির বাহ্যিক অঙ্গসমুহ

মোরগের মতোই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তবে-

ক) ঝুঁটি মোরগের থেকে ছোট থাকে।

খ) পায়ে স্পার থাকে তবে ছোট।

গ) হেকল (Hackle) ফেদার : মুরগির লেজের উপরের ঊর্ধমুখী পালককে হেকল ফেদার বলে।

ঘ) গদি পালক : মুরগিতে লেজের গোড়ায় গদির মতো যে পালক থাকে।

২০২০

২.২ মোরগ–মুরগির বাহ্যিক অঙ্গ দেখে পার্থক্য নির্ণয়।

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য	মোরগ	মুরগি
১	ঝুঁটি	তুলনামূলক বড় উজ্জ্বল	ছোট কম উজ্জ্বল
২	কণ্ঠস্বর	কর্কশ	কর্কশ নয়
৩	ঘাড়ের পালক	লম্বা ও চকচকে	পালক স্বাভাবিক
৪	জিন পালক	মোরগে থাকে	মুরগিতে গদি পালক থাকে
৫	কাস্তে পালক	বেশ বড় হয়	তেমন বড় হয় না
৬	পায়ের স্পার	মোরগে বড় থাকে	মুরগিতে থাকে তবে ছোট

২.৩ মুরগির অভ্যন্তরীন অঙ্গসমূহ (পরিপাকতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র)

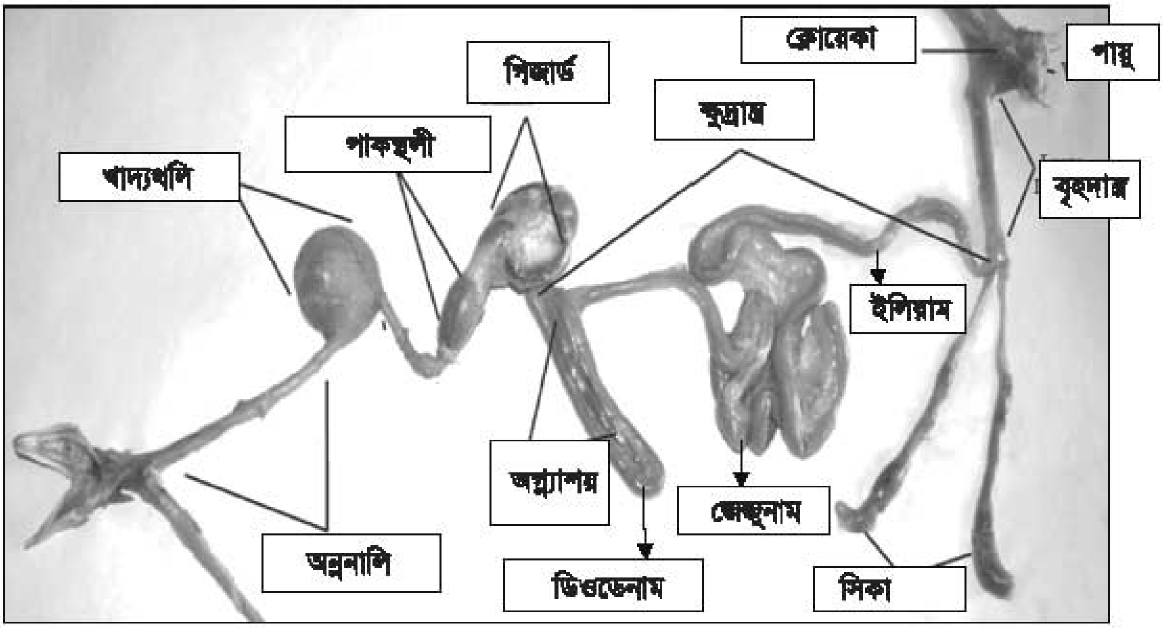

চিত্র : ২.৩ মুরগির পারিপাকতন্ত্র

পরিপাকতন্ত্র :

মুরগির শরীরের সে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমষ্টি খাদ্য গ্রহণ পরিপাক, পরিশোষন সহ শরীরে পুষ্টি সাধন করে তাকে পরিপাকতন্ত্র বলে।

পরিপাক তন্ত্রের বিবরন নিম্নরূপ :

১. মুখবিবর : গরু–মহিষের মতো মোরগ-মুরগির দাঁত নেই। এর পরিবর্তে দুটি চঞ্চু আছে। জিহ্বার অগ্রভাগ সরু ও পশ্চাতের দিকটা কিছুটা খসখসে। চঞ্চুর সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ করার পর জিহ্বা খাদ্য গলাধঃকরনে সাহায্য করে। এ সময় মুখ থেকে খুব কম লালা নিঃসরণ হয়।

২. খাদ্যনালি : মুখগহ্বর থেকে খাদ্যথলি পর্যন্ত অংশ খাদ্যনালি। গলাধঃকরণের পর খাদ্য এ নালী দিয়ে খাদ্যথলিতে এসে জমা হয়।

৩. খাদ্যথলি : এ থলিতে প্রথমতঃ খাদ্য জমা হয়। পরে অল্প পরিমান করে খাদ্য এ থলি থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছে। খাদ্যথলিতে থাকাকালে খাদ্য কিছুটা নরম হয়। কিন্তু কোনো পরিপাক ক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় না।

৪. পাকস্থলী: খাদ্য থলির দুই বা তিন ইঞ্চি পরেই পাকস্থলীর অবস্থান। প্রকৃতপক্ষে এটি খাদ্য নালীরই একটি বর্ধিত অংশ। এর ভেতরের দেয়ালে অসংখ্য গ্রন্থি রয়েছে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী পৌঁছালে এ গ্রন্থি হতে এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়। এ রসে পেপসিন নামক একপ্রকার জারক রস ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। এই জারকরস আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সহায়তা করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্য অবস্থিত রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এবং খাদ্য নরম কাদার মতো করে ফেলে।

৫. গিজার্ড : পাকস্থলীর নিকটেই শক্ত মাংসপেশি দিয়ে প্রস্তুত গোলাকার কালচে লাল আকৃতির অংশটির নামই গিলা বা গিজার্ড। এর দুটি মুখ। একটি উপরের দিকে পাকস্থলীর সাথে ও অপরটি নিচের ডিওডেনামের সাথে সংযুক্ত। এর প্রধান কাজ হলো শক্ত দানাদার খাদ্যকে গুঁড়া করে নরম করে দেওয়া, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে পরিপাকে সুবিধা হয়। এটি ঝিনুক, শামুক, পাথরের কণা পর্যন্ত গুঁড়া করতে সক্ষম।

৬. ক্ষুদ্রান্ত্র : এটি গিলা হতে সিকা পর্যন্ত বিস্তৃত তিন-চার ফুট লম্বা। এর তিনটি অংশ রয়েছে। ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। পুষ্টিনালীর এ অংশেই হজম ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র আন্ত্রিকরস নাম বেশ কয়েক প্রকার জারকরস ক্ষরণ করে। এ স্থানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের শেষ পরিণতি অ্যামাইনো এসিড, শর্করাজাতীয় খাদ্য ভেঙে গ্লুকোজ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোষক যন্ত্রের সাহায্যে রক্ততে প্রবেশ করে। হজম ও বিশোষণ প্রক্রিয়া মোরগ-মুরগির ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক দ্রুতসম্পন্ন হয়। প্রক্রিয়া দুটি সম্পন্ন হতে মাত্র তিন ঘণ্টার কম সময় লাগে। সমস্ত শোষণযোগ্য খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়ে অবশিষ্ট অসার অংশ পানির সাথে মিশে বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে।

৭. সিকা : ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের সংযোগস্থলের দু'দিকে থলির মতো বর্ধিত অংশ আছে– এ দুটিকে সিকা বলে সিকা লম্বায় প্রায় ১০-১৫ সেন্টিমিটার। এখানে কোনো পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না বললেই চলে, তবে আঁশজাতীয় খাদ্যদ্রব্য ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে কিঞ্চিত পরিমাণ হজম হতে পারে।

৮. বৃহদান্ত্র : এটির দৈর্ঘ্য খুব ছোট, মাত্র ১০-১২ সেন্টিমিটার লম্বা। এখানে খাদ্যের অসার অংশ হতে পানি শোষিত হয়।

৯. ক্লোয়েকা : বৃহদান্ত্র হতে মল, বৃক্ক হতে মূত্র এবং প্রজননতন্ত্র থেকে ডিম বা বীর্য এই একই সাধারণ নির্গমন পথ দিয়ে বের হয়। এটি বৃহদান্ত্রের এক বর্ধিত অংশ। সাধারণত মোরগ-মুরগির মল ও প্রস্রাব একত্রে বের হয়। মলের সাথে যে সাদা অংশ দেখতে পাওয়া যায় তা প্রধানত ইউরিক এসিড যা প্রস্রাবেরই একটি অংশ। ক্লোয়েকার বহিরাংশকে মলমূত্রদ্বার বলা হয়। মলমূত্র দ্বারের উপরিভাগে বারসা অব ফেব্রিসিয়ার অবস্থান। এটি মোরগ-মুরগির দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উৎস।

এছাড়া পরিপাকতন্ত্রে নিম্নলিখিত সাহায্যকারী গ্রন্থি রয়েছে:

ক) যকৃৎ

খ) অগ্ন্যাশয়

গ) প্লীহা

২০২০

ক) যকৃৎ: এটি গিজার্ড ও ডিওডেনামের ভাঁজের পাশেই অবস্থিত। এর দুটি বাদামি রঙের বড় অংশ রয়েছে। যকৃৎ দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। এটি পিত্তরস নামক একপ্রকার জারকরস সৃষ্টি করে। যকৃতের দুটি অংশ হতে পিত্তরস প্রস্তুত হয়ে দুটি পিত্তনালী দিয়ে ডিওডেনামের নিচের অংশে এসে খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হয়। ডানপাশের পিত্তনালীটি কিছুটা মোটা হয়ে একটি থলি সৃষ্টি করে এবং এতে পিত্তরস প্রয়োজন মিটানোর জন্য জমা থাকে। বামদিকের পিত্তনালীটি পিত্তরস সরাসরি ডিওডেনামে সরবরাহ করে। পিত্তরস দেখতে সবুজ রঙের খাদ্যে এসিডীয় ভাব দূর করে পাচক রসের কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করে।

খ) অগ্ন্যাশয় : ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম নামক যে অংশ রয়েছে এর ভাঁজে এটি অবস্থিত। মোরগের অগ্ন্যাশয় আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। গিজার্ড হতে এখানে খাদ্য প্রবেশ করলে অগ্ন্যাশয়ের সাধারণ গ্রন্থি হতে একপ্রকার পাচকরস নিঃসৃত হয় এবং অগ্ন্যাশয় নালীর মাধ্যমে ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়- একে ক্লোমরস বলে। এই রসে তিন প্রকার জারকরস রয়েছে। যথা -এমাইলেজ, ট্রিপসিন ও লাইপেজ। এ রসসমূহ যথাক্রমে শর্করা, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সহায়তা করে। উপরে বর্ণিত ক্লোমরস ছাড়াও অগ্ন্যাশয় হতে ইনস্যুলিন নামক আর একপ্রকার প্রাণরস নিঃসৃত হয়। এ রস অগ্ন্যাশয়ের মধ্যস্থিত বিটা সেল হতে ক্ষরিত হয় ও সরাসরি রক্তের সাথে মিশ্রিত হয় । অতঃপর গ্লুকোজ যথাযথ দহন করতে সাহায্য করে দেহে কর্মশক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া উদ্বৃত্ত শর্করা গ্লাইকোজেন ও চর্বি রূপে দেহে জমা থাকে।

গ) প্লীহা : যকৃৎ, গিলা ও পাকস্থলীর সাহায্যে সৃষ্ট ত্রিভুজাকৃতি স্থানে এ লালচে বাদামি রঙের ছোট গোলাকার প্লীহা অবস্থিত। এটি ক্ষয়প্রাপ্ত লোহিত কণিকা দেহ হতে দূরীভূত করে এবং কিছু পরিমাণ রক্ত ও লোহাজাতীয় খনিজ পদার্থ জমা করে রাখতে পারে।

মুরগির প্রজননতন্ত্র

প্রজনন:

যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় মোরগ মুরগি বিপরীত লিঙ্গের সহযোগিতায় যৌন পদ্ধতিতে নিজেদের মতো বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট এবং প্রজনন সক্ষম এক বা একাধিক বাচ্চা উৎপন্ন করে বংশবৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রজাতির ধারা বিলুপ্তি রোধ করে তাকে মোরগ মুরগির প্রজনন বলে।

প্রজননতন্ত্র:

প্রজনন যে তন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তাকে প্রজননতন্ত্র বলে।

মোরগ মুরগি এক লৈঙ্গিক প্রাণী। অর্থাৎ এদের পুরুষ প্রজনন ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র পৃথকভাবে মোরগ মুরগিতে বিদ্যমান থাকে।

মুরগির প্রজননতন্ত্র দুটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত যথা :

১. ডিম্বাশয় (Ovary) এবং।

২. ডিম্বনালী (Oviduct)।

ডিম্বাশয় (Ovary) :

ডিমের প্রাথমিক ও মূল উৎপত্তিস্থল। এখানেই ডিম্বাণু উৎপত্তি হয়। অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাণু (যা খালি চোখে দেখা যায় না) পুষ্ট অবস্থায় কম-বেশি ঝিল্লি আবরিত হয়ে এখান থেকে নিঃসরিত হয়ে ডিম্বাবাহী নলের চুঙ্গীতে পতিত হয়।

ডিম্বনালী নালি (Oviduct) :

ডিম্ববাহী নালী পাঁচটি অংশে বিভক্ত-

১. চুঙ্গি (ইনফান্ডিবুলাম)।
২. ম্যাগনাম বা ডিমের সাদা অংশ নিঃসরন কারী নালীর অংশ।
৩. ইসথমাস বা ডিমের খোলার অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি উৎপাদনকারী অংশ ।
৪. জরায়ু বা ডিমের খোসা উৎপাদনকারী অংশ ।
৫. যোনি ।

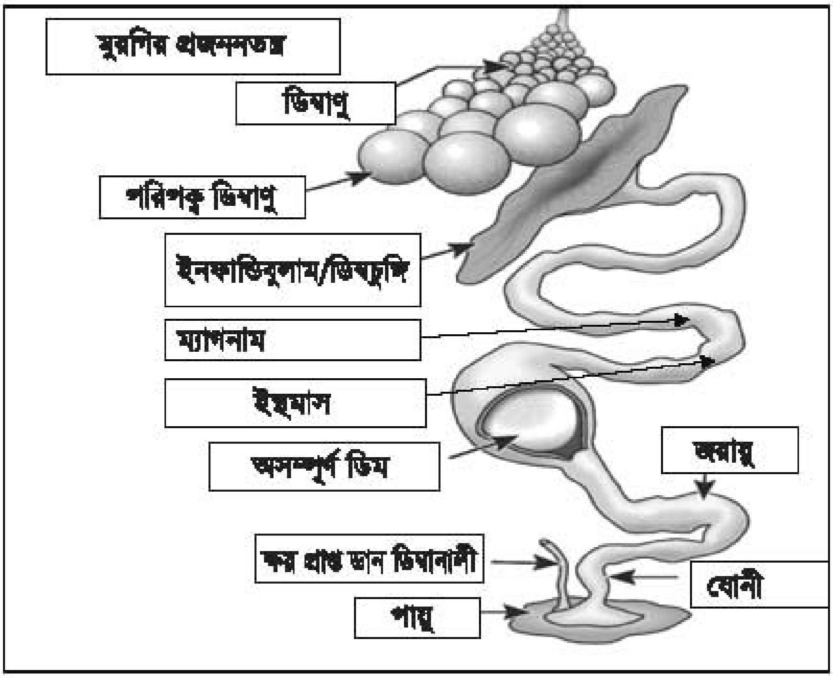

চিত্র ২.৪ মুরগির প্রজননতন্ত্র

চুঙ্গি (Funnel) :

এটি হচ্ছে ডিম্ববাহী নলের প্রবর্ধিত অংশ। পুষ্ট ডিম্বাণু চুঙ্গি দ্বারা আকর্ষিত হয়। সচরাচর এখানেই শুক্রাণু সহযোগে ডিম্বাণু উর্বর হয়ে থাকে। ডিম্বাণু ডিম্ববাহী নলের প্রাথমিক অংশে ১৫ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করে। এরপর হতে ডিমের আকার বড় হতে থাকে।

ম্যাগনাম (Magnum) :

এখান থেকেই ডিমে সাদা অংশ নিঃসরিত হয়ে থাকে। এখানে ডিম্বাণু ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করার ফলে ডিম্বাণুর চারপাশে একটি সাদা ঘন আবরণ পড়ে। তারপরে পেশির নানারকম সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সাদা পদার্থ দ্বারা আবরিত ডিম্বাণুটি প্রায় দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে। এখানে অবস্থান করার সময় ডিম্বাণুটি পুনরায় দুই প্রকার খোসার পর্দা দ্বারা আবরিত হওয়ার ফলে ডিমের অভ্যন্তরে বায়ুকোষ তৈরি হয়।

জরায়ু (Uterus) :

এখানে প্রবর্ধিত ডিম্বাণুটি প্রায় ২১ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে এবং এর চারপাশে খোসা উৎপাদনকারী অংশ এখান থেকেই সংযোজিত হয়ে থাকে। তাছাড়া ডিম্বাণুর চারপাশে অতিরিক্ত আর একপ্রকার পাতলা তরল

সাদা রসের আবরণ পড়ে যা ম্যাগনাম কর্তৃক নিঃসরিত শ্বেতাংশকে কিছুটা গলিয়ে দেয়। এখান থেকেই ডিমটি Oval আকার ধারণ করে।

যোনি (Vagina) :

ডিম্ববাহী নলের এটিই শেষাংশ। এখান থেকেই ডিম বাইরে নির্গত হয়। কিন্তু এখানে ৩০ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করার সময় ডিমের খোসার চারপাশে একটি মোম জাতীয় আবরণ পড়ে। ঐ আবরণটি ডিমের খোসাকে শক্ত করে এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে ডিমের অভ্যন্তরকে রক্ষা করে। ডিমটি বহিরাগত হওয়ার পরে পানি দ্বারা ধুয়ে নিলে ঐ মোমজাতীয় আবরণটি পানিতে গলে যায়।

নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে মোরগের প্রজননতন্ত্র গঠিত যথা :

১। এক জোড়া শুক্রাশয়
২। ভাসা ইফারেন্সিয়া
৩। ভাসা ডিফারেন্সিয়া বা শুক্রনালি

মোরগের প্রজননতন্ত্র :

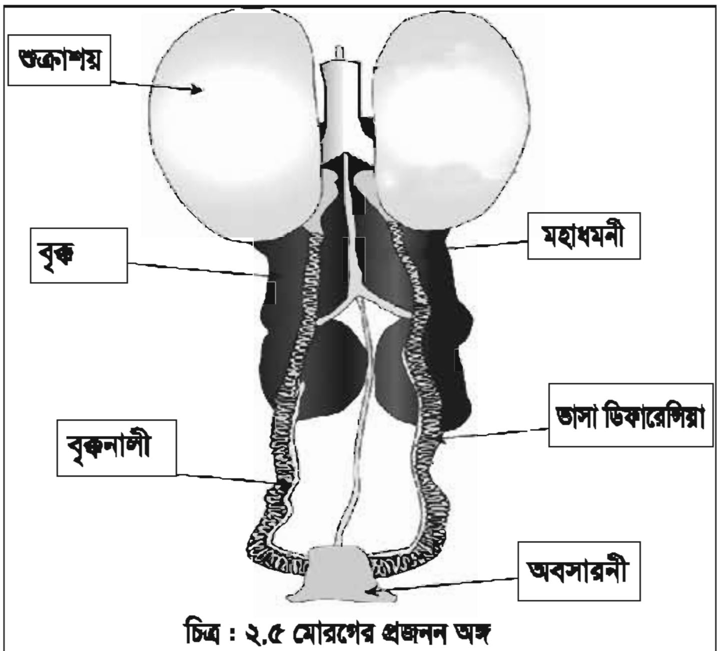

চিত্র : ২.৫ মোরগের প্রজনন অঙ্গ

১। শুক্রাশয় :

মোরগে দুটি শুক্রাশয় উদর গহ্বরের ভেতরে উপরিভাগে বৃক্কের সামনে অবস্থিত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মোরগের শুক্রাশয় অনেকটা ডিম্বাকৃতি যা লম্বালম্বিভাবে দু'ভাগ করলে অর্ধ চন্দ্রাকৃতির মতো দেখায়। এ গুলোর উপরিভাগে অসংখ্য রক্তবাহী নল, ধমনি ও শিরার শাখা-প্রশাখা থাকে। দুটো শুক্রাশয়ের আকার সমান থাকে না। প্রজননকালে এগুলোর আকার অন্যান্য সময়ের চেয়ে একটু স্ফীত থাকে।

২। ভাসা ইফারেনসিয়া

শুক্রাশয় অসংখ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউল দ্বারা গঠিত। এ টিউবগুলোর অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত জার্মিনাল এপিথেলিয়াম থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।

২০২০

ভাসাইফারেনসিয়ায় স্পারমেটোজোয়া বা অপরিণত শুক্রাণু পুষ্টি লাভ করে। অপরিণত শুক্রাণুকে পুষ্টি সরবরাহকারী এ সকল কোষকে সাটোলিয়া কোষ বলে। শুক্রাশয় যে সূক্ষ্ম নালিদ্বারা আবৃত থাকে তাকে ভাসা ইফারেনসিয়া বলে।

৩। ভাসা ডিফারেনস বা শুক্রবাহী নল :

প্রতিটি শুক্রাশয়ের মধ্যে চ্যাপ্টা ও অবতল অংশ থেকে একটি নলাকৃতির অংশ নিচের দিকে নেমে গেছে তাকে শুক্রবাহীনল বা ভাসডিফারেন্স বলে। এ শুক্রবাহী নল শুক্রাশয় থেকে বের হয়ে মূত্রনালির সমান্তরালে অগ্রসর হয়ে কিছু সরু হয়ে ক্লোয়েকাতে এসে উন্মুক্ত হয়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) পরিপাকতন্ত্র কাকে বলে?
২) প্রজননতন্ত্র কাকে বলে?
৩) হক কাকে বলে?
৪) ওয়াটল কী?
৫) স্পার কী?
৬) ক্ষুদ্রান্ত্রে কয়টি অংশ ও কী কী?
৭) গিজার্ডের কাজ কী?
৮) পাচক রসের কাজ কী?
৯) ডিম্বাহী নালির কয়টি অংশ ও কী কী?
১০) মুরগির প্রজননতন্ত্র কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
১১) বৃহদান্ত্রের দৈর্ঘ্য কত?
১২) মোরগের প্রজননতন্ত্রের অংশ গুলি কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) মুরগির বাহ্যিক অঙ্গসমূহের নাম লেখ।
২) মোরগ মুরগির বাহ্যিক অঙ্গ দেখে কী ভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় ?
৩) মুরগির প্রজনন অঙ্গসমূহের নাম লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১) চিত্রসহ মোরগের প্রজননতন্ত্র বর্ণনা কর ।
২) চিত্রসহ মুরগির প্রজননতন্ত্র বর্ণনা কর ।
৩) মুরগির পরিপাকতন্ত্র বর্ণনা কর ।

২০২০

তৃতীয় অধ্যায়
মুরগির বিভিন্ন জাত পরিচিতি

বহু প্রাচীনকাল অর্থাৎ (প্রায় ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব) থেকে মোরগ-মুরগিকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পাখি হিসেবে পালনের ইতিহাস জানা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জঙ্গলের বন্য মুরগি থেকে আধুনিক গৃহপালিত মোরগ-মুরগির উৎপত্তি হয়েছে বলে জানা যায়। ইউরোপীয় বণিকেরা এশিয়া থেকে মুরগি সংগ্রহ করে সেগুলোকে নিজের দেশে নিয়ে যেত। ধারণা করা হয় যে, নিম্নলিখিত চারটি বন্য প্রজাতির থেকে আধুনিক মোরগ-মুরগির উৎপত্তি হয়েছে–

	নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১	রেড জঙ্গল ফাউল	Red jungle fowl	Gallus gallus
২	সিলোন জঙ্গল ফাউল	Ceylon Jungle fowl	Gallus lafayetti
৩	গ্রে জঙ্গল ফাউল	Grey Jungle fowl Gallus	Sonnerratti
৪	জাভা জঙ্গল ফাউল	Java Jungle fowl	Gallus varius

উল্লিখিত Gallus gallus প্রজাতিটি মোরগ-মুরগির প্রধান পূর্বপুরুষ বলে ধরা হয়। তবে চারটি প্রজাতিই অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলো ইন্টারব্রিড হিসেবে পরিচিত।

জীবজগতে মোরগ-মুরগির অবস্থান

জীবজগৎ (Kingdom) : প্রাণিজগৎ (Animalia)

পর্ব (Phylum) : Chordata

শ্রেণি (Class) : Aves

বর্গ (Order) : Gallformes

গোত্র (Family) : Fhasianidae

গণ (Genus) : Gallus

প্রজাতি (Species) : Gallus domesticus

বৈজ্ঞানিক নাম : *Gallus Gallus domesticus*

৩.১ জাতের সংজ্ঞা

শ্রেণি (Class) :

যে সমস্ত মোরগ-মুরগির জাত কোনো এক বিশেষ জায়গা থেকে উদ্ভূত বা উৎপন্ন হয়েছে, সে সমস্ত জাতকে সমষ্টিগতভাবে একটি শ্রেণি বলা হয়। যেমন : এশিয়াটিক শ্রেণি, আমেরিকান শ্রেণি ইত্যাদি।

জাত (Breed) :

একই শ্রেণির অন্তর্গত একটি জাতের মোরগ-মুরগির নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেমন– দেহের আকার, আকৃতি, চামড়ার রং, আঙ্গুলের সংখ্যা, পায়ের নালা পালকবিহীন না পালকাবৃত, ডিমের রং ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী বংশধরে সমভাবে প্রকাশ পাবে। যেমন - লেগহর্ন, অস্ট্রালর্প ইত্যাদি জাত।

উপজাত (Variety):
পালকের রং এবং মাথার ঝুঁটির ধরনের উপর ভিত্তি করে একটি জাতের উপবিভাগকে উপজাত বলা হয়। যেমন- লেগ হর্ন জাতের মধ্যে আবার একক ঝুঁটি বিশিষ্ট হোয়াইট লেগহর্ন, গোলাপ সদৃশ ঝুঁটি বিশিষ্ট হোয়াইট লেগহর্ন ইত্যাদি উপজাত রয়েছে।

স্ট্রেইন (Strain):
কোনো একক প্রজননকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমপক্ষে ৫ বংশ পরম্পরায় প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মুরগির উপজাতকে স্ট্রেইন বলে। যেমনঃ স্টার ক্রস, স্টার ব্রো। এটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বংশ পরম্পরায় ইনব্রিডিং-এর মাধ্যমে তৈরি হয়।

৩.২ উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে মুরগির শ্রেণি বিভাগ :
উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে মুরগির জাতকে বিভিন্নভাবে শ্রেণি বিন্যাস করা যায়। যেমন-

১. উৎপাদন অনুসারে : উৎপাদন অনুসারে মুরগির জাতকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(ক) ডিম উৎপাদনকারী জাত : এই শ্রেণির মুরগি সাধারণত আকারে ছোট হয়। এরা খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ২০ সপ্তাহ বয়সের মধ্যেই ডিম পাড়া শুরু করে। এরা ডিম উৎপাদন করে বেশি কিন্তু ডিমের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। ডিম উৎপাদনের পর কুঁচে হয় না। যেমন- লেগহর্ন, মিনার্কা, ফাউমি, এনকোনা।

(খ) মাংস উৎপাদনকারী জাত : এই শ্রেণির মুরগি আকারে বড় হয় এবং ওজন বেশি হয়। এরা চলাফেরায় ধীরগতিসম্পন্ন এবং শান্ত প্রকৃতির হয়। যেমন- ব্রাহ্মা, কোচিন, ল্যাংশেন, আসিল এবং মালয়ী।

(গ) ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী জাত : এই শ্রেণির মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনে ভালো। এদের ওজন মাঝারি ধরনের এবং ডিমের ওজন বেশি। যেমন- রোড আইল্যান্ড রেড, কর্নিশ, জার্সি জায়ান্ট, অস্ট্রালর্প-নিউহ্যাম্পশায়ার, প্রাইমাউথ রক ইত্যাদি।

(ঘ) শোভা দর্শনকারী শ্রেণি : এই শ্রেণির মুরগি শোভা বর্ধন – খেলাধুলা এবং মোরগ লড়াই দেওয়ার জন্য পালন করা হয়। যেমন- ইয়োকোহামা, জাপানি বেন্টাম, আসিল ইত্যাদি।

২. উৎপত্তি অনুসারে জাতের শ্রেণি বিন্যাস : উৎপত্তি অনুসারে মুরগির শ্রেণি চারটি।

(ক) আমেরিকান শ্রেণি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আশপাশের দেশসমূহে এই শ্রেণির মুরগির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন-নিউহ্যাম্পশায়ার, ল্যামোনাস, প্লাইমাউথ রক, আর. আই. আর, জার্সি জায়ান্ট।

(খ) ইংলিশ শ্রেণি : এই শ্রেণির মুরগিসমূহের উৎপত্তি হয়েছে মূলত ইংল্যান্ডে। তবে অস্ট্রালর্প মুরগির উৎপত্তি হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে। যেমন- সাসেক্স, অরপিংটন, ডর্কিং, কর্নিশ, রেডক্যাপ, হাউড্যান্স ইত্যাদি।

(গ) এশিয়াটিক শ্রেণি : এই শ্রেণির মুরগিসমূহ উৎপত্তি লাভ করেছে এশিয়া মহাদেশে। যেমন- অসিল, মালয়ী, ল্যাংশেন, কোচিন, ইয়োকোহামা, ব্রাহ্মা, বেন্টাম।

(ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণি : ভূমধ্যসাগরের আশপাশের দেশ যেমন– ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, মিসর ইত্যাদি দেশে এই শ্রেণির মুরগি উৎপত্তি লাভ করেছে। যেমন– লেগহর্ন, ফাউমি, মিনার্কা, এনকোনা, বাটারক্যাপ, স্প্যানিশ, ব্লু-আন্দালুসিয়ান।

৩. ওজন অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস : ওজন অনুযায়ী মুরগির শ্রেণি চারটি।

(ক) হালকা জাত : এই শ্রেণির মুরগির গড় ওজন ১.৮-২.৪ কেজি। যেমন-লেগহর্ন, ফাউমি, মিনার্কা।

(খ) মাঝারি জাত : এই শ্রেণির মুরগির গড় ওজন ২.৫-৩.০ কেজি। যেমন-ডর্কিং, নিউহ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাউথ রক।

(গ) ভারী জাত : এই শ্রেণির মুরগির গড় ওজন ৩ কেজির বেশি। যেমন- আসিল, জার্সি জায়ন্ট, কর্নিশ।

৪. কুঁচে হওয়ার প্রবণতা অনুযায়ী মুরগির শ্রেণিবিন্যাস :

কুঁচে হওয়ার প্রবণতা অনুযায়ী মুরগিরকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

(ক) সিটার (Sitter) : এই শ্রেণির মুরগি ডিম পাড়ার পর ডিমে তা দেয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে। বাচ্চার ভালো যত্ন নেয়। যেমন- ব্রাহ্মা, আসিল, কোচিন, ল্যাংশেন।

(খ) নন সিটার (Non sitter) : এই শ্রেণির মুরগি ডিম পাড়ার পর ডিমে তা দেয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে না বা কুঁচে হয় না। এরা বাচ্চার যত্ন নেয় না। যেমন- লেগহর্ন, মিনার্কা, এনকোনা।

৩.৩ উৎপত্তি স্থান অনুযায়ী মুরগির শ্রেণিবিন্যাস:

উৎপত্তি স্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

আমেরিকান শ্রেণি (জাত)	ইংলিশ শ্রেণি (জাত)	ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণি (জাত)	এশিয়াটিক শ্রেণি (জাত)
১. রোড আইল্যান্ড রেড ২. নিউ হ্যাম্পশায়ার ৩. প্লাইমাউথ রক ৪. ওয়েইন্ডোট ৫. জ্যাভাস ৬. জার্সি জায়ান্টস ৭. ল্যামোন্যাস ৮. ডোমনিকুইস	১. সাসেক্স ২. অস্ট্রালর্প ৩. করনিস্ ৪. রেড ক্যাপস ৫. ডরকিংস	১. লেগহর্ন ২. মিনরকাস ৩. এনকোনাস ৪. স্প্যানিশ ৫. ব্লু আন্দালুসিয়ান ৬. বাটার কাপস ৭. ফাওমি	১. ব্রাহমা ২. কোচিন ৩. ল্যাংশ্যান ৪. আসিল ৫. ফোনিক্স

৩.৪ আমেরিকান শ্রেণি :

আমেরিকান শ্রেণির অধীনে মোট **১৩**টি জাত রয়েছে। এ জাতগুলো যুক্তরাষ্ট্র উৎপন্ন হয়েছিল বলে এদেরকে আমেরিকান শ্রেণির জাত বলা হয়ে থাকে। সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আনা ছোট জাতের কর্মঠ মুরগির সাথে এশিয়া থেকে আমদানি করা বড় আকারের মোরগের সংকর প্রজনন করে আমেরিকান শ্রেণির মুরগি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখানে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন।
- কানের লতি লাল রঙের।

২০২০

- এরা ডিম ও মাংস উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী।
- গায়ের চামড়া হলুদ রঙের।
- ডিমের খোসার রঙ বাদামি।
- এরা আকারে মাঝারি।

আমেরিকান শ্রেণির জাতসমূহ।-

১. প্লাইমাউথ রক (Plymouth Rock): এটি আমেরিকান সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত। কারণ, এরা একদিকে যেমন ভালো মাংস উৎপাদন করতে পারে অন্যদিকে তেমনি বেশি ডিমও উৎপাদন করতে পারে। এদের কুঁচে হওয়ার প্রবণতা আছে।

উৎপত্তিস্থল : ১৮৬৫ সালে আমেরিকার প্লাইমাউথ শহরে এদের উৎপত্তি
উপজাত : ৭টি

চিত্র : ৩.১ প্লাইমাউথ রক (মোরগ-মুরগি)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দেহ	: লম্বা ও প্রশস্ত
মাথার ঝুঁটি	:একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	: লাল রঙের
গায়ের চামড়া	: হলুদ রঙের
ডিমের খোসা	: বাদামি রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.৩ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৪ কেজি
ডিম উৎপাদন	: বছরে ১০০-১৫০ টি

২. রোড আইল্যান্ড রেড (Road Island Red) : এ জাতের মুরগিগুলো খুব কর্মঠ হয়। যারা অল্পসংখ্যক মুরগি পালন করে থাকেন তাদের কাছে এ জাতের মুরগিগুলো খুবই পছন্দের। এরা ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলেও এদের ডিম উৎপাদনের হার বেশি।

উৎপত্তিস্থল : আমেরিকার রোড আইল্যান্ড প্রদেশ
উপজাত : ২টি

চিত্র ৩.২: রোড আইল্যান্ড রেড জাতের (মোরগ-মুরগি)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দেহ	: আয়তাকার
বুক	: চওড়া, গভীর এবং সামনের দিকে উঁচু
পৃষ্ঠদেশ	: চওড়া, লম্বা ও সমতল
কানের লতি	: ছোট ও লাল রঙের
পায়ের নলা	: পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	: হলুদ রঙের
পালক	: লাল রঙের
ডিমের খোসা	: বাদামি রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৩.৯ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.৯ কেজি
ডিম উৎপাদন	: বছরে ১৫০-২০০টি

৩. নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire) : রোড আইল্যান্ড রেড জাতের সাথে অন্য জাতের মিলন ঘটিয়ে এ জাতটিকে তৈরি করা হয়েছে। এদেরকে ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্য পালন করা যায়। এরা বেশ কষ্টসহিষ্ণু।

উৎপত্তিস্থল	: আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার
উপজাত	: কোনো উপজাত নেই

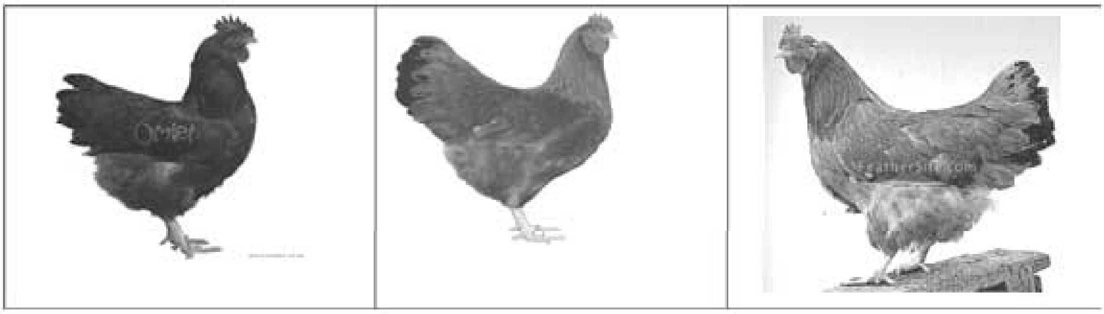

চিত্র ৩.৩: নিউ হ্যাম্পশায়ার জাতের (মোরগ-মুরগি)

২০২০

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দেহ	: রোড আইল্যান্ড রেডের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম আয়তাকার
মাথার ঝুঁটি	: একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	: লাল রঙের
পায়ের নালা	: পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	: হলুদ রঙের
পালক	: তামাটে লাল, তবে লেজের পালকগুলো কালো
ডিমের খোসা	: বাদামি রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৩.৯ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.৯ কেজি
ডিম উৎপাদন	: বছরে ১৪০-১৬০টি

৩.৫ ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণি (Mediteranean Class) :

এ শ্রেণির অধীনে মোট ৬টি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে লেগহর্ণ সবচেয়ে জনপ্রিয়। ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণির জাতগুলোর উৎপত্তিস্থল ইটালি ও আশপাশের অঞ্চলে। মিনর্কা ছাড়া অন্য সবগুলো জাত ছোট আকারের। এখানে এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেয়া হল।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন।
- পালক আঁটসাঁট ও দেহের সাথে সুবিন্যস্ত।
- এরা আকারে ছোট।
- কুঁচে হওয়ার অভ্যাস একেবারেই নেই।
- অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে।
- ডিম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- এদের গায়ের চামড়ার রঙ সাদা অথবা হলুদ।
- কানের লতি সাদা রঙের।
- ডিমের খোসার রঙ সাদা।

ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ

১. লেগহর্ণ (Leghorn) : ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণির জাতগুলোর মধ্যে লেগহর্ণ সবচেয়ে জনপ্রিয়। ডিম উৎপাদনের জন্য এরা বিখ্যাত। লেগহর্ন জাত মুরগির জাত উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল	: ইটালি
উপজাত	: ১৩টি

চিত্র : ৩.৪ লেগহর্ণ জাতের মোরগ-মুরগি

২০২০

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার : ছোট

দেহ : ত্রিভুজাকার অর্থাৎ কাঁধের দিকে চওড়া ও লেজের দিকে ক্রমশ সরু এবং দেহ আঁটসাঁট।

কানের লতি	: সাদা রঙের
পায়ের নালা	: পালকবিহীন
পায়ের চামড়া	: হলুদ রঙের
ডিমের খোসা	: সাদা রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ২.৭ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	: বছরে ২০০-২৫০টি

২. মিনর্কা (Minorca) : ভূমধ্যসাগরীয় জাতগুলোর মধ্যে মিনর্কা বেশ বড় ও ভারী। এরা তেমন ভালো ডিম উৎপাদন করে না বলে জনপ্রিয়তাও কম। এরা রোদ সহ্য করতে পারে না।

উৎপত্তিস্থল	: স্পেনের মিনর্কা দ্বীপ
উপজাত	: ৫টি

চিত্র : ৩.৫ মিনর্কা জাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি :

দেহ	: লম্বা ও শক্তিশালী
কানের লতি	: সাদা রঙের
পায়ের নালা	: পালকবিহীন
পায়ের চামড়া	: সাদা রঙের; তবে পিঠ, পায়ের নালা ও আঙুল কালো রঙের
ডিমের খোসা	: সাদা রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.১ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৪ কেজি
ডিম উৎপাদন	: বছরে ১৮০-২০০ টি

৩. অ্যানকোনা (Ancona) : এরা আকার-আকৃতিতে লেগহর্নের মতোই। এদের ডিম উৎপাদন মোটামুটি। এরা কোলাহল প্রিয়। বর্তমানে এদের শোভাবর্ধক জাত হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল	: ইটালির অ্যানকোনা অঞ্চল
উপজাত	: ২টি

২০২০

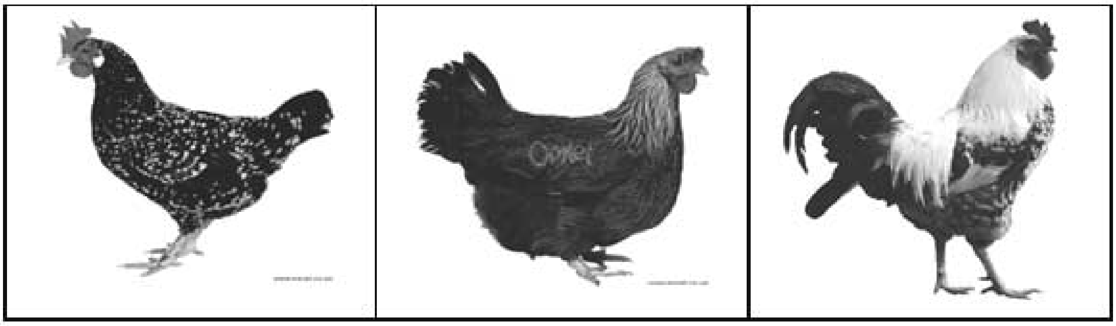

চিত্র : ৩.৬ অ্যানকোনা জাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার	: ছোট
কানের লতি	: সাদা রঙের
পায়ের নালা	: পালকবিহীন
পায়ের চামড়া	: হলুদ রঙের
পালক	: কালো রঙের উপর সাদা ফোঁটা
ডিমের খোসা	: সাদা রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ২.৭ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.০ কেজি
ডিম উৎপাদন	: বছরে ১৫০-২০০টি

৪ ফাইওমি (Fayoumi) : এরা আকার-আকৃতিতে লেগহর্নের মতোই। দেখতে খুবই সুন্দর। শরীরের বর্ণের জন্য এদেরকে সকলেই বেশ পছন্দ করে। এদের দেহের পালকের রঙ ছাই ও সাদা ফোঁটাবিশিষ্ট; ঘাড়ের পালক সাদা, লেজের পালকের শেষাংশে কালো। এদের ডিম উৎপাদন মোটামুটি। ডিমের আকার ছোট। এরা খুব চঞ্চল ও চালাক। এদেরকে দেশি মুরগির মতো ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এদের পালন করা হচ্ছে।

উৎপত্তিস্থল : মিশর

উপজাত : নেই

চিত্র : ৩.৭ ফাইওমি জাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার	: ছোট
মাথার ঝুঁটি	: ছোট, বেজোড় ও লাল
কানের লতি	: সাদা রঙের
পায়ের নলা	: পালকবিহীন ও কালো রঙের
গায়ের চামড়া	: সাদা রঙের
পালক	: কালো-সাদা ফোঁটা ফোঁটা
ডিমের খোসা	: সাদা রঙের
ডিম উৎপাদন	: বছরে ১৫০-২০০টি

৩.৬ ইংলিশ শ্রেণি (English Class) :
এ শ্রেণির অধীনে মোট ৬টি জাত রয়েছে। এদের মধ্যে সাসেক্স, অস্ট্রালর্প এবং অরপিংটন সবচেয়ে জনপ্রিয়। এদের মাংস সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন।
- এরা আকারে মাঝারি।
- মাংস ও ডিম উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী।
- কর্নিশ ছাড়া সবগুলো জাতের গায়ের চামড়ার রঙ সাদা এবং কানের লতি লাল।
- ডরকিং এবং রেড ক্যাপ ছাড়া সবগুলো জাতের ডিমের খোসার রঙ বাদামি।

ইংলিশ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত জাতসমূহ

১. অস্ট্রালর্প (Anstralorp) : অস্ট্রালর্প শব্দটির অর্থ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্ল্যাক অরপিংটন। এরা ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্যই উপযোগী। তাই এ জাতটি বিশ্বব্যাপী বেশ জনপ্রিয়। আর্দ্র ও অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেও এরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে।
উৎপত্তিস্থল : গ্রেট ব্রিটেন
উপজাত : নাই

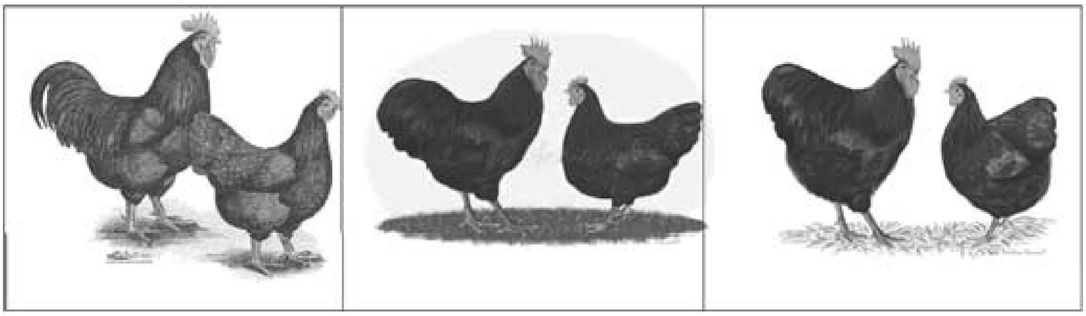

চিত্র : ৩.৮: অস্ট্রালর্প জাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার :মাঝারি
দেহ : খাড়া ও লেজের দিকে ক্রমশ ঢালু, গভীর এবং মজবুত
মাথার ঝুঁটি : একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি : লাল রঙের
পায়ের নালা : পালকবিহীন
গায়ের চামড়া : সাদা রঙের
পালক : উজ্জ্বল ও সবুজের আভাযুক্ত কালো রঙের
ডিমের খোসা : বাদামি রঙের
ওজন : প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৩.৯ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ২.৯ কেজি
ডিম উৎপাদন : বছরে ১৫০-২০০টি

২. কর্নিশ (Cornish): কর্নিশ জাতের আসল নাম হলো 'ইন্ডিয়ান গেম'। এরা মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ব্রয়লার স্ট্রেইন তৈরির জন্য কর্নিশ মোরগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল : ইংল্যান্ড
উপজাত : ৪টি; এদের মধ্যে সাদা উপজাত সবচেয়ে জনপ্রিয়

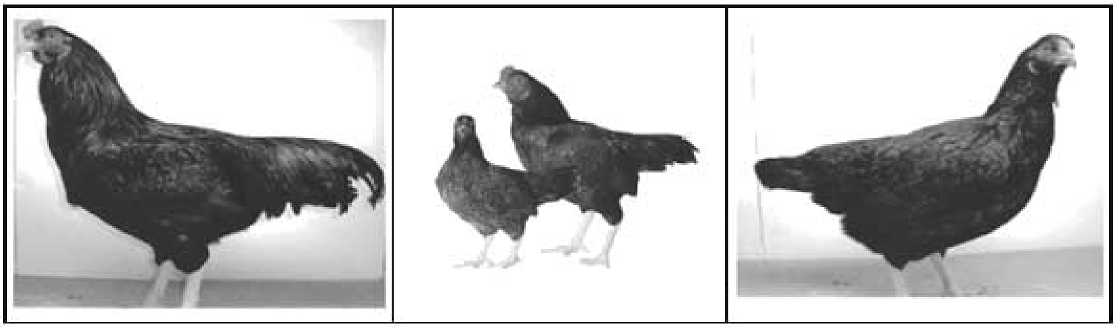

চিত্র : ৩.৯ কার্নিশ বা ইন্ডিয়ান গেম জাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দেহ : মাংসল ও মজবুত
মাথার ঝুঁটি : মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি : লাল রঙের
পা : লম্বা ও চওড়া
পায়ের নালা : পালকবিহীন
গায়ের চামড়া : হলুদ রঙের
পালক : এদের পালক খুবই ছোট এবং দেহের সাথে লেগে থাকে।
ডিমের খোসা : বাদামি রঙের
ওজন : প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.৮ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৮ কেজি

২০২০

৩. সাসেক্স (Sussex) : সাসেক্স হলো সবচেয়ে পুরনো জাত। এরা ডিম ও মাংস উভয় উৎপাদনের জন্যই পালন করা হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল : ইংল্যান্ড
উপজাত : ৩টি

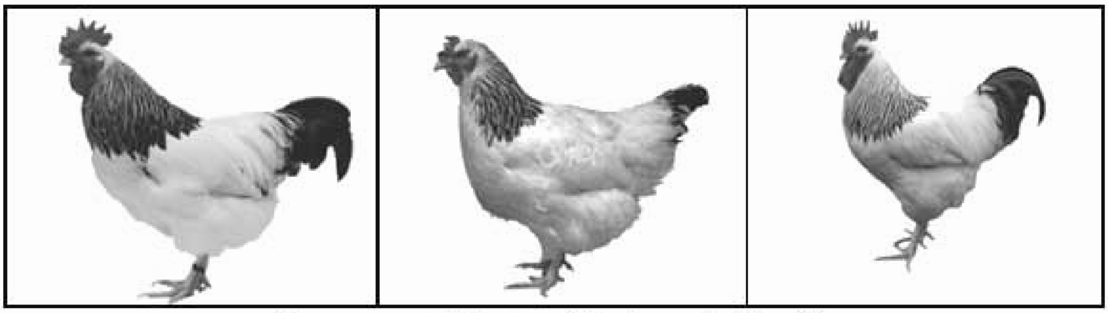

চিত্রঃ ৩.১০ঃ লাইট সাসেক্স উপজাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দেহ	: আয়তাকার
কাঁধ	: চওড়া
মাথার ঝুঁটি	: একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি	: লাল রঙের
পায়ের নালা	: পালকবিহীন
গায়ের চামড়া	: সাদা রঙের
ডিমের খোসা	: বাদামি রঙের
ওজন	: প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৪.১ কেজি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.২ কেজি

৩.৭ এশিয়াটিক শ্রেণি (Asiatic Class) :

এ শ্রেণির অধীনে মোট ৩টি জাত রয়েছে। এরা আকারে বড় এবং মাংস উৎপাদনের জন্য ভালো। তবে এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ বাণিজ্যিকভিত্তিতে ডিম বা মাংস উৎপাদনে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। ল্যাংশ্যান জাতের অন্তর্ভুক্ত ব্ল্যাক ল্যাংশ্যান উপজাতের মুরগি ছাড়া বাকিদের চামড়ার রঙ হলুদ। এখানে এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- এদের পায়ের নালায় পালক থাকে।
- কানের লতি লাল রঙের।
- ডিমের খোসার রঙ বাদামি।
- গায়ের চামড়ার রঙ হলুদ।
- এরা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে।
- এদের কুঁচে হওয়ার প্রবণতা বেশি।
- এদেরকে মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- এদের ডিম উৎপাদনের হার কম।

এশিয়াটিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহ

১. ব্রাহ্‌মা (Brahma) : ব্রাহ্‌মা জাতের আসল নাম ছিল 'গ্রে চিটাগাং'। এরা প্রধানত মাংস উৎপাদনকারী জাত। এদের ঝুঁচে হওয়ার প্রবণতা আছে।

উৎপত্তিস্থল : ভারতের ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল

উপজাত : ৩টি

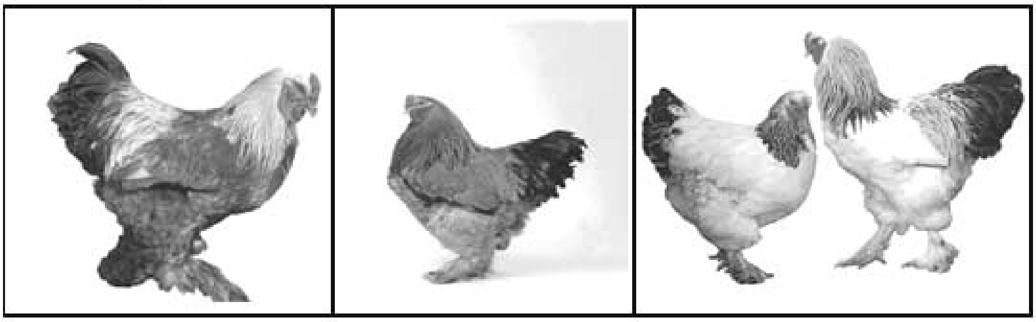

চিত্রঃ ৩.১১: ব্রাহ্‌মা উপজাতের মোরগ-মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার : বড়

দেহ : ভারি ও ঘন পালকে ঢাকা

মাথার ঝুঁটি : মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট

কানের লতি : লাল রঙের

পায়ের নালা : পালকযুক্ত, মাংসল ও হলুদ রঙের

গায়ের চামড়া : হলুদ রঙের

ডিমের খোসা : বাদামি রঙের

ওজন : প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৫.৪ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৪.৩ কেজি

২. কোচিন (Cochin) : কোচিন জাত 'সাংহাই ফাউল' নামেও পরিচিত। এদের মাংস ও পালক উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। এদের পালক বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

উৎপত্তিস্থল : চীনের সাংহাই অঞ্চল

উপজাত : ৪টি

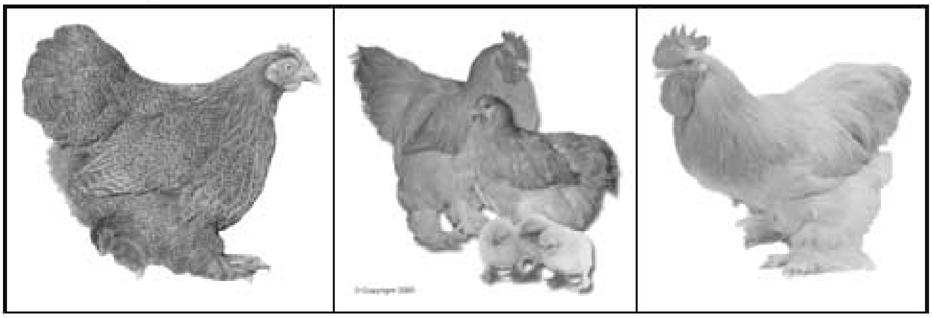

চিত্রঃ ৩.১২ কোচিন জাতের মোরগ-মুরগি

১০২০

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার : বড়
ঝুঁটি : একক ঝুঁটিবিশিষ্ট
কানের লতি : লাল রঙের
পায়ের নালা : মাংসল ও পালকযুক্ত
পায়ের চামড়া : হলুদ রঙের
ডিমের খোসা : বাদামি রঙের
ওজন : প্রাপ্তবয়স্ক মোরগ- ৫.০ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মুরগি- ৩.৯ কেজি

এক নজরে মুরগির চারটি শ্রেণির পরিচিতি

শ্রেণির নাম	জাত	চামড়ার রঙ	কানের লতির রঙ	ডিমের খোসার রঙ	পায়ের নালায় পালক	আকৃতি	উপযোগিতা
আমেরিকান	প্লাইমাউথ রক, রোড আইল্যান্ড রেড, নিউ হ্যাম্পশায়ার, উইনডোট	হলুদ	লাল	বাদামি	নেই	মাঝারি	ডিম ও মাংস
	লেগহর্ন, মিনর্কা, অ্যানকোনা,কাইওমি অ্যান্দালোসিয়ান	হলুদ বা সাদা	সাদা	সাদা	নেই	ছোট	ডিম
ইংলিশ	অস্ট্রালর্প, সাসেক্স, কর্নিশ, অরপিংটন	সাদা	সাদা	বাদামি	নেই	মাঝারি	ডিম ও মাংস
এশিয়াটিক	ব্রাহমা, কোচিন ল্যাংশান	হলুদ	লাল	বাদামি	আছে	বড়	মাংস

৩.৮ বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেশি মুরগির বৈশিষ্ট্য

(ক) আসিল (Asil)

কুমিল্লা জেলার সরাইল এবং চট্টগ্রাম জেলায় এদের উৎপত্তি। লড়াইয়ে দক্ষ বলে এই জাতটির নামকরণ করা হয়েছে আসিল। এরা ফাইটিং কক হিসেবে পরিচিত বিধায় চড়া দামে বিক্রি হয়।

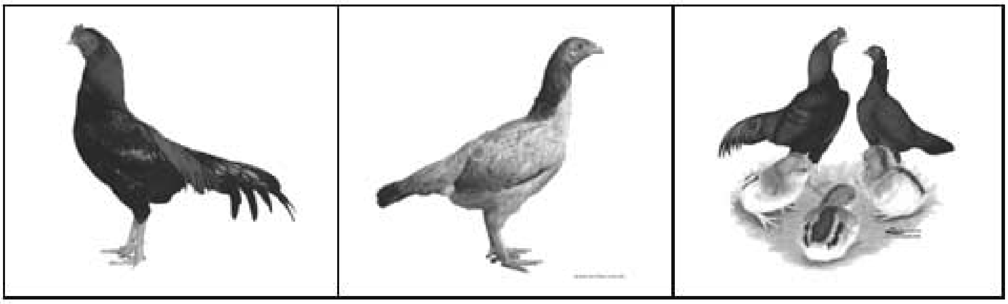

চিত্র ৩.১৩ আসিল জাতের মোরগ-মুরগি

বৈশিষ্ট্য :

- এদের শরীর অত্যন্ত সুঠাম ও সবল
- গলা ও পা লম্বা
- বুক ও উরুতে পালক থাকে
- ডিম কম দেয় এবং ডিম আকারে ছোট ও বাদামি রঙের
- পালকের রং কালো, লাল বা মিশ্র রঙের
- মাথার ঝুঁটি ছোট ও মটর ঝুঁটি
- মোরগের ওজন ৩-৪ কেজি ও মুরগির ওজন ৩ কেজি
- এরা খুব পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু

(খ) চাটগাঁয়ে বা মালয় (Malay)

এটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় এবং মালয়েশিয়া উপদ্বীপে পাওয়া যায় বলে এ জাতটির যথাক্রমে নাম দেওয়া হয়েছে চাটগাঁয়ে এবং মালয়।

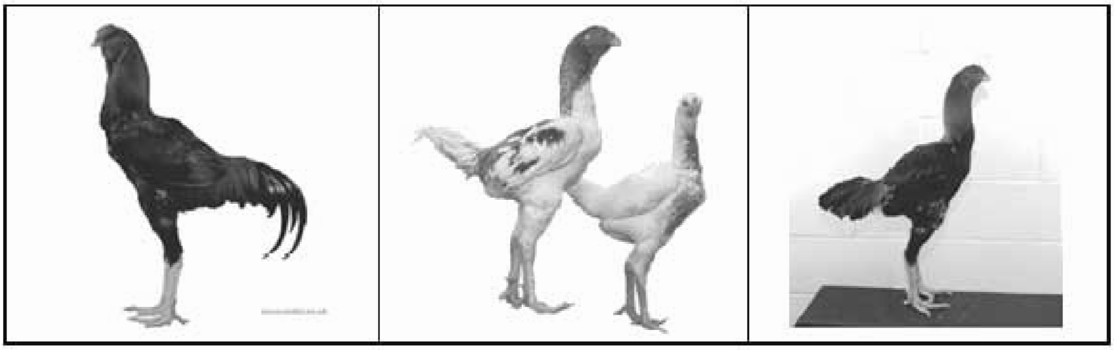

চিত্র : ৩.১৪ চাটগাঁয়ে বা মালয় মোরগ-মুরগি

বৈশিষ্ট্যাবলী:

- চামড়া হলুদ ও ডিমের খোসা বাদামি
- মাথায় ছোট মটর ঝুঁটি আছে
- গলা ও ঠোঁট লম্বা এবং মাথা ছোট
- পালকের রং লাল
- লেজের পালক লাল কালোর মিশ্রণ বা সোনালি এবং হালকা হলুদ প্রকৃতির পা লম্বা, মোটা ও ভারী
- এরা দেখতে খুব লম্বা ও মাংসের জন্য ভালো
- লম্বা পায়ের জন্য এদের ডিমের 'তা' দিতে বসতে কষ্ট হয়
- মোরগের ওজন ৪-৪.৫ কেজি ও মুরগির ওজন ৩-৪ কেজি
- মুরগিগুলো মা হিসেবে ভালো নয়, ফলে ছানার ভালো যত্ন নেয় না

(গ) গলা ছোলা মুরগি (Naked Neck) :

বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়।

২০২০

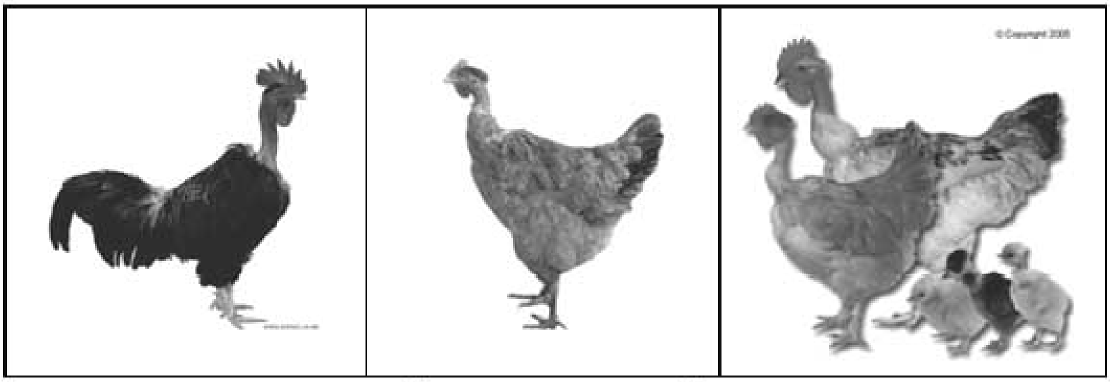

চিত্রঃ ৩.১৫ গলা ছোলা মুরগি

বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

- এদের গলায় কোনো পালক থাকে না
- চামড়া হলুদ বা লাল রঙের হয়
- পালকের রং সাদা কালোর মিশ্রণ বা লাল
- এদের দেখতে ছোট আকারে টার্কি মোরগ মনে হয়
- ওয়াটল বেশ বড় ও লাল রঙের
- পা মোটা ও শক্ত
- ডিমের খোলা সাদা
- ডিমে 'তা' দেয় এবং বাচ্চার ভালো যত্ন নেয়
- অন্য দেশি মুরগির তুলনায় আগে (১৮০ দিনে) ডিম আসে
- বছরে ৯০-১২০টি ডিম দেয় এবং ডিমের ওজন ৪২ গ্রাম
- মোরগের ওজন ১.৫-২.২৫ কেজি এবং মুরগির ওজন ১.২-১.৫ কেজি

(ঘ) হিলি মুরগি (Hilly Chicken):

চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হিলি মুরগির জাত উন্নয়নে কার্যক্রম চলছে।

বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

- ডিমের রং হালকা বাদামি
- মোরগের ওজন ২-৩.৫ কেজি ও মুরগির ওজন ১.৫-২ কেজি
- বছরে ৮০-১০০টি ডিম দেয়
- ডিমের ওজন ৪২ গ্রাম
- দেশি মুরগির মতো একই সময় ডিম পাড়া শুরু করে

(ঙ) ইয়াছিন মুরগি (Yasine Chicken) :

বান্দরবান ও টেকনাফ এলাকায় পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইয়াছিন মুরগির জাত উন্নয়নে কার্যক্রম চলছে।

বৈশিষ্ট্য :

- ডিমের রং হালকা বাদামি
- মোরগের ওজন ২-৩.৫ কেজি ও মুরগির ওজন ১.৫-২.৫ কেজি
- বছরে ৬০-৭০টি ডিম দেয়
- ডিমের ওজন ৪৪ গ্রাম
- ২১০ দিন বয়সে প্রথম ডিম দেয়

(চ) দেশি মুরগি (Non-Descriptive) :

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুরগি এ পর্যায়ে পড়ে। কারণ এদের ওজন, গঠন, পালকের রং ও ডিম উৎপাদনে এত বেশি তারতম্য দেখা যায় যে, এদের কোনো বিশেষ জাতের মধ্যে ফেলা যায় না বা এদের কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই।

বৈশিষ্ট্যঃ

চিত্রঃ ৩.১৬ দেশি মুরগি

- ডিমের রং চক সাদা
- মোরগ ওজনে ১.৫-২ কেজি ও মুরগির ওজন ১-১.৫ কেজি
- ডিমের ওজন ৪০ গ্রাম
- বছরে গড়ে ৫০-৬০টি ডিম পাড়ে
- কুচে হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান
- ছানার খুব যত্ন করে এবং বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে
- এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদেশি জাত অপেক্ষা অনেক বেশি
- এরা বাড়িতে বা বাড়ির আশপাশে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে
- ওজনে হালকা, দেহ সুগঠিত ও পেশি মজবুত
- এদের মাংস ও ডিম উভয়ই সুস্বাদু
- চতুর ও চঞ্চল হওয়ার শত্রুরা সহজে ধরতে পারে না

(ছ) সোনালি (Sonali) :

রোড আইল্যান্ড রেড মোরগ ও ফাউমি মুরগির মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে সোনালি জাতের মুরগির সৃষ্টি হয়েছে। বৈশিষ্ট্যঃ

চিত্র : ৩.১৭ সোনালি মোরগ

- এদের রোগ বালাই কম হয়
- আমাদের দেশি আবহাওয়ায় সহজে খাপ খাওয়াতে পারে
- দৈহিক ওজন ২-২.৫ কেজি
- এরা খুবই চালাক এবং চরে খেতে অভ্যস্ত
- বছরে ২০০-২৫০টি ডিম দেয়
- ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুরগির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
২. কোন বন্য প্রজাতিগুলো থেকে আধুনিক মোরগ-মুরগির উৎপত্তি হয়েছে।
৩. সংজ্ঞা লেখ : জাত,উপজাত, স্ট্রেইন ও শ্রেণি।
৪. মাংস উৎপাদনকারী তিনটি মুরগির জাতের নাম লিখ।
৫. ডিম উৎপাদনকারী তিনটি মুরগির জাতের নাম লিখ।
৬. শোভা বর্ধনকারী উৎপাদনকারী তিনটি মুরগির জাতের নাম লিখ।
৭. সিটার ও নন সিটার কী ?
৮. উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে মুরগিকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
৯. বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার দেশি মুরগির জাতের নাম কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে মুরগিকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
২. আমেরিকান শ্রেণিভুক্ত মুরগির জাতগুলো নাম লিখ।
৩. ইংলিশ শ্রেণিভূক্ত মুরগির জাতগুলো নাম লিখ।
৪. ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন জাতগুলো নাম লিখ।
৫. এশিয়াটিক শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন জাতগুলোর নাম লিখ।
৬. বিভিন্ন প্রকার দেশি মুরগির নাম ও এদের বৈশিষ্ট্য লিখ।।
৭. রোড আইল্যান্ড রেড মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
৮. লেগহর্ন মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
৯. ফাইওমি মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
১০. অষ্ট্রার্লপ মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
১১. কর্ণিশ মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
১২. সাসেক্স মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
১৩. ব্রাহমা মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
১৪. আসিল মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
১৫. গলা ছোলা মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীব জগতে মোরগ-মুরগির শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।
২. উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে মুরগির শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৩. ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন জাতের মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ক্ষমতা বর্ণনা কর।
৪. ইংলিশ শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন জাতের মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ক্ষমতা বর্ণনা কর।
৫. আমেরিকান শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন জাতের মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ক্ষমতা বর্ণনা কর।
৬. এশিয়াটিক শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন জাতের মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ক্ষমতা বর্ণনা কর। ২০২০

চতুর্থ অধ্যায়
মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

৪.১ মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি :

বাংলাদেশে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়ে থাকে-

১. ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন
২. আধাছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন
৩. আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন
 (ক) লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন
 (খ) মাঁচায় মুরগি পালন
 (গ) খাঁচায় মুরগি পালন

৪.২ মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা :

১. ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন

এ পদ্ধতিতে মোরগ-মুরগি ছেড়ে পালন করা হয়ে থাকে। সারাদিন বাড়ির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধান, গম, খেসারি, সরিষা, শাকসবজি ইত্যাদি এবং বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাদ্য কুড়িয়ে খায়। রাতের বেলা বসত ঘর সংলগ্ন মাটির বা বাঁশের তৈরি অস্থায়ী ঘরে থাকে। এই পদ্ধতিতে পালনকারী নিজেদের পালন করা মোরগ-মুরগি হতে মাংস ও ডিমের চাহিদা মেটায়।

চিত্র : ৩.১ ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন

এই পদ্ধতির সুবিধা :

- উৎপাদন খরচ কম হয়।
- সুষম খাদ্য সরবরাহ করা হয় না বলে খাদ্য খরচ কম।
- বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাদ্য এবং বাড়ির আঙ্গিনার আশপাশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন শস্যদানা, ধান, ঝিনুক, ঘাস ও পোকামাকড় ইত্যাদি কুড়িয়ে খায়। ফলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল ও ভিটামিন পেয়ে থাকে।
- ঘর নির্মাণ ব্যয় কম।

এই পদ্ধতির অসুবিধা :

- অনেক বেশি জায়গা প্রয়োজন।
- রোগব্যাধির প্রকোপ বেশি এবং মানুষের মাঝে রোগ ছড়াতে পারে।
- পারিবারিক কলহের কারণ হতে পারে।

২. আধাছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন

এ পদ্ধতিতে মোরগ-মুরগি বাড়ির একটি নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গার সীমানার মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। রাতে থাকার জন্য একটি নিরাপদ ঘর থাকে। দিনের বেলা ঘর সংলগ্ন ৫-৬ ফুট উঁচু তারের জাল বা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এলাকায় চরে বেড়ায় যাকে রান বলে। রানে সূর্যের আলো পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। ফলে মুরগির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রানের মধ্যে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হয়। খাবার পাত্র ঘরের ভেতর দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে রানের উপরিভাগের মাটি উল্টিয়ে দিলে রোগজীবাণু মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। ডিমপাড়া মুরগির জন্য ঘরের মধ্যে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হয়।

চিত্র : ৩.২ আধা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন

এ পদ্ধতির সুবিধা :

- ছোটাছুটি করার ফলে ব্যায়াম ভালো হয়।
- দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় না এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- মুরগির সারাদিন রানে অবস্থান করে ফলে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ পায়।
- নোংরা স্থানে চরার সুযোগ নেই, ফলে রোগাক্রান্ত হওয়া বা অন্যকে আক্রান্ত করার সুযোগ কম।
- রানে খাদ্য ও পানি দিতে সুবিধা।
- এ পদ্ধতিতে প্রজনন করানো মোরগ-মুরগি পালন করা যায়।

এ পদ্ধতির অসুবিধা :

- রানের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়। ফলে বড় বাণিজ্যিক খামারের জন্য এ পদ্ধতি লাভজনক নয়।
- তারের বা বাঁশের জাল তৈরিতে বাড়তি খরচ হয়।
- রানে বন্য পাখি, কাক, চিল, মরা পশুপাখির মাংস ফেলে বা বিষ্ঠা ত্যাগ করে সংক্রামক রোগ ছড়ায়।
- খাদ্য বৃষ্টির পানি বা পাখি দ্বারা নষ্ট হতে পারে।

৩. আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন

এ পদ্ধতিতে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ অস্থায় মুরগি পালন করা যায়। ঘর স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি হয়। ঘর দক্ষিণ বা পূর্বমুখী হওয়া উচিত যাতে সূর্যকিরণ সহজে ঘরে ঢুকতে পারে। মুরগির চলাফেরার জন্য পর্যাপ্ত স্থান থাকে। মুরগিকে সুষম খাদ্য, কাঁচা ঘাস ও শাকসবজি দেওয়া হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাড়ির ছাদে, বারান্দায় বা ছোট আঙিনাতে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালা যায়।

এ পদ্ধতিকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যথা-

(ক) লিটার পদ্ধতি :

এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি ঘরের মেঝেতে বিছানা বা লিটার বিছিয়ে মুরগি পালা হয়। লিটার হিসাব কাঠের গুঁড়া, ধানের তুষ, খড়ের কুচি ইত্যাদি যে কোনো একটি বা এদের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। ২-৩ ইঞ্চি পুরু করে বা ৪-৮ ইঞ্চি পুরু লিটার বিছিয়ে মুরগি পালন করা হয়। ফলে মুরগির মলমূত্র থেকে কম দুর্গন্ধ বের হয় এবং মেঝে শুকনা থাকে। লিটার বেশি ভিজে গেলে চুনের গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে হয় বা লিটার পাল্টে ফেলতে হয়। এ পদ্ধতিতে ডিম পাড়া মুরগির জন্য ২ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন হয়।

চিত্র :৩.৩ লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন

এ পদ্ধতির সুবিধা :

- নির্মাণ ব্যয় কম।
- ডিম কম ভাঙে।
- অসহ্য দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় না।
- মুরগি লিটার পা দিয়ে আঁচড়ায়, এর মধ্যে গোসল করে ও লিটারে জমানো খাদ্য কুড়িয়ে খায়।
- লিটার মুরগিকে শীত থেকে রক্ষা করে। মুরগি আরামে থাকে।
- ব্যবহৃত লিটার মাছের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য এবং জমির জন্য উৎকৃষ্টমানের জৈব সার।

এ পদ্ধতির অসুবিধা :

- ডিম ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- খাঁচার তুলনায় বেশি জায়গার প্রয়োজন।
- মেঝেতে ডিম পাড়ার প্রবণতা হতে পারে।
- পুরোনো লিটার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

২০২০

- লিটার ভিজে গেলে অ্যামোনিয়া গ্যাস হয় যা মুরগির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- শ্রমিক খরচ বেশি।

(খ) খাঁচায় মুরগি পালন :

এ পদ্ধতিতে তারের জালের তৈরি খাঁচায় মুরগি পালন করা হয়। মেঝের দিকে তারের জাল থাকাতে পায়খানা করলে নিচে পড়ে। নিচে টিনের বা কাঠের ট্রে দেওয়া থাকলে ময়লা তার মধ্যে জমা হয়। খাঁচার তলা একটু সামনের দিকে ঢালু থাকে, ফলে ডিম গড়িয়ে সামনের দিকে চলে আসতে পারে। এ খাঁচা কয়েক তলা পর্যন্ত করা যেতে পারে । বর্তমানে শহরাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালন বেশি জনপ্রিয়। কারণ এতে অল্প জায়গায় বেশি মুরগি পালন করা যায়। প্রতি খোপে পরিমাপের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে ১-৪টি মুরগি রাখা যায়।

চিত্র : ৩.৪ খাঁচায় মুরগি পালন

এ পদ্ধতির সুবিধা :

- অনেক বেশি মুরগি রাখা যায়।
- রোগব্যাধি কম হয়।
- খাদ্যের সঠিক ব্যবহার হয়।
- ডিম ময়লা হয় না ও ডিম ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে না।
- অসুস্থ মুরগিকে সহজে ছাঁটাই করা যায়।
- শ্রমিক খরচ কম।

এ পদ্ধতির অসুবিধা :

- প্রাথমিক ব্যয় বেশি।
- দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।
- বায়ু চলাচল বেশি দরকার হয়।
- বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ও পোকা বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(গ) মাচায় মুরগি পালন:

এই পদ্ধতিতে মাটি থেকে ২-৩ ফুট উঁচুতে মাচা তৈরি করে মুরগি পালন করা হয়। মাচা তৈরিতে বাঁশ, কাঠ, লোহার তারের জাল ব্যবহৃত হয়। মুরগির বিষ্ঠা মাচার ফাঁকা ফাঁকা স্থান দিয়ে বের হয়ে নিচে পড়ে যায়। ফলে ঘর নোংরা হতে পারে না। ২০২৩

এ পদ্ধতির সুবিধা :

- রোগব্যাধি কম হয়।
- লিটার পদ্ধতি থেকে বেশি মুরগি রাখা যায়।
- লিটারের প্রয়োজন হয় না।
- বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসাবে বেশি উপযোগী।
- অধিক আলো বাতাস পায়।

এ পদ্ধতির অসুবিধা :

- ডিম ভাঙার সম্ভাবনা বেশি।
- লিটার পদ্ধতি থেকে নির্মাণ ব্যয় বেশি।
- প্রজননের জন্য অসুবিধা।
- বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে অসুবিধা এবং বিষ্ঠার জন্য মাছির উপদ্রব বেশি।
- খাদ্য ও পানি প্রদানে অধিক সময় লাগে।
- মাচা মজবুত না হলে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটাচলা করা যায় না।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পোল্ট্রি পালনের পদ্ধতি কয়টি?
২. আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন কয় ধরনের?
৩. খাঁচায় মুরগি পালনের ক্ষেত্রে মাটি হতে কত ফুট উঁচুতে মাচা তৈরি করতে হবে?
৪. লিটার পদ্ধতিতে প্রতিটি মুরগির জন্য কী পরিমান জায়গার প্রয়োজন?
৫. রান কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের সুবিধা?
২. ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের অসুবিধা কী কী?
৩. আধা-ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের সুবিধা কী কী?
৪. আধা-ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের অসুবিধা কী কী?
৫. লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালনের সুবিধা কী কী?
৬. লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালনের অসুবিধা কী কী?
৭. খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের সুবিধা কী কী?
৮. খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের অসুবিধা কী কী?
৯. মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের সুবিধা কী কী?
১০. মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের অসুবিধা কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. আধা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩.আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২০

পঞ্চম অধ্যায়
মুরগির বিভিন্ন ধরনের খামার স্থাপন

৫.১. মুরগির খামারের নাম ও প্রকারভেদ :

সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় যথাযথ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে একই স্থানে কিছু সংখ্যক মোরগ-মুরগি পালন করাকে মুরগির খামার বলে।

মুরগির খামারকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

১. অনিয়ন্ত্রিত খামার
২. পারিবারিক খামার
৩. অনিবিড় খামার
৪. নিবিড় খামার
৫. আধা নিবিড় খামার

(ক) অনিয়ন্ত্রিত খামার :

গ্রামাঞ্চলে মুরগি সারাদিন চরে বেড়ায় ও খাদ্য সংগ্রহ করে এবং রাতে ছোট খোপে বা খোয়াড়ে আবদ্ধ থাকে। পালনকারী কোনো খাদ্য সরবরাহ করে না। এগুলো অনিয়ন্ত্রিত খামারের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) পারিবারিক খামার :

এ ধরনের খামারে পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য ১০-১৫টি মোরগ-মুরগি পালন করা হয়। সকাল ও বিকেলে কিছু শস্যদানা খাদ্য হিসেবে মুরগিকে সরবরাহ করা হয় এবং বাকি খাদ্য এরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে থাকে। মুরগিগুলোকে নিয়মিত রানীক্ষেত রোগের টিকা দেওয়া হয় এবং কোনো অসুখ হলে পরিবারের শিক্ষিত সদস্য সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগের মাধ্যমে ঔষুধ খাওয়ায়। পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটানোর পরও ডিম বা মুরগি বিক্রি করে বাড়তি কিছু আয় হয়। তবে আজকাল বড় শহরগুলোর পারিবারিক খামারগুলোতে ৫০টি পর্যন্ত মুরগি পালা হয়ে থাকে।

(গ) অনিবিড় মুরগির খামার :

এ জাতীয় খামারে বিভিন্ন বয়সের ৩০-৫০টি মুরগি পালন করা হয়ে থাকে। শিক্ষিত বেকার যুবকরা কিছু উপার্জনের আশায় এবং পরবর্তীতে আধুনিক খামার স্থাপন করবে এই পরিকল্পনায় এ জাতীয় খামার পরিচালনা করে থাকে।

এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

- খামার পরিচালনায় পরিশ্রম কম ও কম পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়।
- মুরগিকে খাবার হিসাবে খুদ, গমের ভুসি, কুঁড়া, ভাতের মাড়, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট সরবরাহ করা হয় এবং পাশাপাশি বাড়ির আশপাশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাদ্য ও পোকামাকড় বাকি খাদ্যের চাহিদা মেটায়।
- নিয়মিত রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা দেওয়া হয়।
- বাড়ির গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা তাদের কাজ ও পড়াশুনার অবসরে এ জাতীয় খামার পরিচালনা করতে পারে।
- এ জাতীয় খামারে লোকসানের ঝুঁকি কম এবং অল্প জায়গা ও কম মূলধন লাগে।
- লিটার বা খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়। ২০২০

(ঘ) নিবিড় খামার :
এ ধরনের খামার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। মুরগির প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সবকিছুর দায়িত্ব নিতে হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্থাপিত সব খামার নিবিড় খামার।

(ঙ) আধা নিবিড় খামার :
এ ধরনের খামারে আধাছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। মুরগির থাকার জন্য ঘর থাকবে, যেখানে ডিপ লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালা হয়। ঘরের সামনের জায়গায় ৪-৫ ফুট উঁচু তারের জাল দিয়ে বেড়া দিয়ে রান তৈরি করতে হবে। রানের উপরে তারের জালের ছাউনি থাকবে। রানের মধ্যে সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। রানে বালি মাটি দিতে হবে এবং পানি সরে যাওয়ার জন্য ড্রেন তৈরি করতে হবে। এ জাতীয় খামারে ১০০-১৫০টি ডিম পাড়া মুরগি পালন করা হয়।

৫.২ পারিবারিক মুরগি খামার স্থাপনের গুরুত্ব :

১. পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ।
২. আত্মকর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. পরিবারের প্রতিদিনের খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ ও উপজাত দ্রব্যাদি মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার।
৪. বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা।
৫. পরিবারের সদস্যদের অবসর সময়ে খামার পরিচালনা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা।
৬. বাণিজ্যিক খামার পরিচালনার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

৫.৩ পারিবারিক খামার নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা :

পারিবারিক খামার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে :
১. ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা
২. মূলধন সংগ্রহ
৩. মুরগির খামারটির ধরন কী হবে
    (ক) ডিম পাড়া মুরগি
    (খ) ব্রয়লার মুরগি
৪. খামারে কত সংখ্যক মুরগি থাকবে
৫. উপকরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
৬. খামারের জন্য স্থান নির্ধারণ
৭. উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে চাহিদা নিরূপণ
    (ক) স্থানীয় বাজারে চাহিদা
    (খ) পার্শ্ববর্তী বাজারগুলোতে চাহিদা
৮. উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ
৯. খামারের অবকাঠামো নির্মাণ
১০. উন্নত জাতের মুরগি নির্বাচন

১১. সুষম খাদ্য সংগ্রহের উৎস
১২. প্রয়োজনীয় টিকাদান কর্মসূচি
১৩. খামারের ব্যবস্থাপনা
১৪. রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা
১৫. বিষ্ঠা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ
১৬. খামারে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা
১৭. স্যানিটেশন ও বিদ্যুৎ

পারিবারিক খামার স্থাপনের স্থান নির্বাচন :
বসতবাড়ির বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে পারিবারিক খামার স্থাপন করা যায়, যথা–
১. বাড়ির বারান্দায়;
২. বাড়ির কোনো বাড়তি ঘরে;
৩. সিঁড়ির ঘরে;
৪. বাড়ির ছাদে;
৫. বাড়ির পিছনে অল্প খালি জায়গায়;
৬. বাড়িতে বাগান থাকলে সেখানে ছাড়া অবস্থায় উঁচু বেড়া দিয়ে মুরগি পালা যায়;
৭. ছোট পুকুরপাড়ে মাচায় মুরগি পালন করা যায়;

পারিবারিক খামারের অবকাঠামো তৈরি :
সার্বিক ব্যবস্থাপনা স্থায়ীখরচ এবং স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে মাচা ও খাঁচা পদ্ধতিতে ডিম পাড়া মুরগি পালন অধিক লাভজনক। মুরগি পালনের ৩টি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ঘর তৈরি করতে হবে।

১. লিটার পদ্ধতি :
লিটার পদ্ধতিতে বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, বাড়তি খালি ঘর বা ছোট আঙিনাতেও মুরগি পালা যায়। এ পদ্ধতিতে ৫০টি ডিম পাড়া বা ১০০টি ব্রয়লার মুরগির জন্য ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ৮ ফুট প্রস্থ মাপের দোচালা টিনশেড বা ছনের ঘর তৈরি করা হয়। এ ধরনের শেডে মেঝে থেকে ১-১.৫ ফুট উঁচু টের দেয়াল তৈরি করে উপরের ৫ ফুট পরিমাণ তারের জাল দ্বারা নেটিং করে দেওয়া হয়। দুই চালের মধ্যবর্তী উচ্চতা হয় ১০ ফুট।

ঘরের মেঝে পাকা হওয়া উত্তম। ঘরের মেঝে জমি থেকে ১.৫-২ ফুট উঁচু করতে পারলে ড্যাম্প ওঠার সম্ভাবনা কমে যাবে। ডিমপাড়া মুরগির জন্য ১.৭৫-২ বর্গফুট এবং ব্রয়লার ও ককরেল মুরগির জন্য ১ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি হবে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির ঝাঁপটা থেকে মুরগিকে রক্ষা করার জন্য শেডের নেটিং করা স্থানে পুরু চট বা চটের বস্তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের সাথে মালপত্র রাখার জায়গার জন্য ঘরের দৈর্ঘ্য আরও ৩ ফুট বাড়াতে হবে।

মেঝেতে লিটার হিসেবে কাঠের গুঁড়া, ধানের তুস, ধান বা গমের খড়ের কুচি, আখের ছোবড়া, বালি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ব্রয়লারের জন্য ২-৩ ইঞ্চি এবং ডিমপাড়া মুরগির ঘরে ৪-৬ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছাতে হয়। ৫টি মুরগির জন্য ১টি ডিম পাড়া বাক্স স্থাপন করতে হবে।

২০২০

২. মাচা পদ্ধতি :
মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের জন্য মেঝের উপর ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সুপারি গাছের ফালি, বাঁশ, কাঠ বা লোহা দিয়ে তৈরি মাচা নির্মাণ করতে হবে। বাঁশ বা কাঠ ১-২ সে.মি. ফাঁক করে দিতে হবে যাতে বিষ্ঠা সহজে নিচে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে মুরগি প্রতি জায়গা ১.৫-১.৬ বর্গফুট দেওয়া হয়।

প্রতিটি ঘরে ২০ বর্গফুটের একটি সার্ভিস এরিয়া থাকবে যেখানে খাদ্য, ঔষুধ ও অন্যান্য উপকরণ রাখা যাবে। ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা থাকবে এবং সার্ভিস কক্ষ ঘরের পশ্চিম প্রান্তে থাকবে। মাচা থেকে চালা ৬ ফুট উঁচুতে থাকবে। ঘর দোচালা হবে। ছন,খড় বা টিন দিয়ে চালা তৈরি করা যায়। ঘরের তিন পাশের বেড়ার খোপ কোনো মতেই ১ বর্গ ইঞ্চির বেশি হবে না। এটা তারের জালি বা বাঁশের তৈরি হতে পারে। সার্ভিস রুমের বেড়ায় কোনো ফাঁক থাকবে না। সার্ভিস রুমের বেড়া বরাবর ডিম পাড়ার বাক্স স্থাপন করতে হবে, যাতে সার্ভিস রুম থেকে ডিম সংগ্রহ করা যায়।

৩. খাঁচা পদ্ধতি:
ঘরে বা বারান্দায় খাঁচা স্থাপন করেও মুরগি পালন করা যায়। বর্তমানে পারিবারিক মুরগি পালনের জন্য এই পদ্ধতি জনপ্রিয়। ১৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১২ ইঞ্চি প্রস্থ ও উচ্চতা ১৯ ইঞ্চি পরিমাপের একটি খাঁচায় ৩টি মুরগি পালন করা যায়। এক সারিতে ৪টি খাঁচায় ১২টি মুরগি পালা যায়। এভাবে ৩-৪ সারি বিশিষ্ট খাঁচা কিনতে পাওয়া যায়। প্রতি সারি খাঁচার বিষ্ঠা নিতে স্থাপিত ট্রেতে জমা হয়, যা ৩-৪ দিন পর পর পরিষ্কার করতে হয়। বিষ্ঠা থেকে বেশি দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে বিষ্ঠায় চুনের পাউডার ছিটিয়ে দিতে হয়।

পারিবারিক খামারের সেনিটেশন :

- মুরগির খাবার ও পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।
- লিটার সবসময় শুকনো ও ঝরঝরে রাখার জন্য সপ্তাহে ২-৩ বার ওলট-পালট করে দিতে হবে।
- লিটার ভিজে গেলে প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ১-২ কেজি চুন ছড়িয়ে লিটার ওলট-পালট করে দিতে হবে।
- নিয়মিত যথাসময়ে টিকা প্রদান ও ৩ মাস পর পর কৃমির ঔষুধ প্রদান করতে হবে।
- খামারের যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ঔষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- অসুস্থ মুরগি আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মুরগির ঘরে ঢোকার দরজায় জীবাণুনাশক মেশানো পানিতে ভেজানো বস্তা রাখতে হবে। যে কেউ ঘরে ঢোকার আগে ঐ ভেজা বস্তায় ১ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে।

৫.৪ বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের স্থান নির্বাচন :
বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

১. উঁচু ও বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না এমন অকৃষি জমি।
২. লোকালয় বা আবাসিক ঘনবসতি এলাকা হতে দূরে ও পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন স্থান হতে হবে।
৩. অন্য মুরগির খামার থেকে নিরাপদ দূরত্বে হতে হবে।
৪. যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে, সড়ক থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে খামার স্থাপন করতে হবে।
৫. ভবিষ্যতে খামারটি সম্প্রসারণ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জমি নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে।
৬. বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২০২০

৭. যেখানে খামারের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা আছে সেসব এলাকায় মুরগির খামার স্থাপন অধিক লাভজনক।
৮. পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৯. মুরগি পালনের কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।
১০. রোগের প্রাদুর্ভাব হলে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা যায় তেমন স্থান নির্বাচন করা।
১১. বন্য জন্তু বা অবাঞ্ছিত লোকজন দ্বারা খামার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন স্থান নির্বাচন।
১২. আশপাশে পচা ডোবা ও নর্দমা থাকবে না।
১৩. বিষ্ঠা এবং লিটার সরিয়ে ফেলার ভালো সুযোগ থাকতে হবে।

বাণিজ্যিক খামারের অবকাঠামো তৈরি :

১. লিটার পদ্ধতি :
লিটার পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে ৫০০ ডিমপাড়া মুরগি বা ১০০০ ব্রয়লার মুরগির জন্য ৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ২০ ফুট প্রস্থ মাপের দোচালা ঘর নির্মাণ করতে হয়। চালা হিসাবে টিন দিলে নিচে অবশ্যই চাটাই দিতে হবে তা না হলে ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। এছাড়া বাঁশের চাটাই, মাটির টালি বা ছন দিয়েও চালা তৈরি করা যায়। এ ধরনের ঘরে মেঝে হতে ১-১.৫ ফুট উঁচু করে দেয়াল তৈরি করে উপরের অংশ তারের জাল দ্বারা ঘেরা থাকে। ঘরের মেঝে পাকা হবে। মেঝে জমি থেকে ১.৫-২ ফুট উঁচু করতে পারলে ড্যাম্প ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। ডিম পাড়া মুরগির জন্য ১.৭৫-২ বর্গফুট এবং ব্রয়লারের জন্য ১ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির ঝাঁপটা হতে মুরগিকে রক্ষার জন্য শেডের নেটিং করা স্থানে পুরু চট বা চটের বস্তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মুরগির ঘরের সাথে খাদ্য, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকদের জন্য ঘর তৈরি করা হয়। ঘরের মধ্যে খাদ্য পাত্র ৮৪টি এবং পানি পাত্র ৪২টি ঝুলিয়ে স্থাপন করতে হবে। ৭/৮ ফুট উঁচুতে বাল্ব এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন খাবার বা পানি পাত্রের উপর আলো পড়ে এবং খাবার বা পানি খাওয়ার সময় আলোক রশ্মি যাতে চোখে প্রতিফলিত হয়।

লিটার হিসাবে তুষ, কাঠের গুঁড়া, খড়ের ছোট টুকরা, আখের ছোবড়া, বালি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। ব্রয়লারের জন্য ২-৩ ইঞ্চি এবং লেয়ারের জন্য ৪-৬ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছাতে হয়। ৫টি মুরগির জন্য ১টি ডিম পাড়া বাক্স রাখতে হয়। দেয়াল ঘেষে ডিম পাড়া বাক্স রাখতে হয়। বাসার নিচে লিটারের উপর ২/৩ ইঞ্চি ফাঁকা রাখা নিয়ম ফলে বাতাস ঢুকে লিটার শুকাতে পারে।

২. মাচা পদ্ধতি :
মাচা পদ্ধতিতে মেঝে থেকে ৩ ফুট উঁচুতে সুপারি গাছের ফালি, বাঁশ বা কাঠ বা লোহার তৈরি মাচা দেওয়া হয় মাচার ফাঁক বা বাঁশের ফালি ফাঁক হবে ১-২ সে.মি যাতে বিষ্ঠা সহজে নিচে পড়তে পারে। লেয়ার মুরগি প্রতি জায়গা দেওয়া হয় ১.৫-১.৬ বর্গফুট। মাচা থেকে চালার দূরত্ব ৬ ফুট। মাচা দেওয়ার কারণে মাচার নিচ দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে মুরগির বিষ্ঠা শুকাতে পারে।
৫০০ লেয়ার বা ১০০০ ব্রয়লার পালনের ৪০′ দৈর্ঘ্য × ২০′ প্রস্থ বিশিষ্ট একটি ঘর যথেষ্ট। ঘরের চালা নেটিং, বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদি লিটার পদ্ধতির মতই।

২০২০

৩. খাঁচা পদ্ধতি :
বর্তমানে খাঁচা পদ্ধতিতে দক্ষভাবে লেয়ার মুরগি পালন করা হচ্ছে। ১৮ ইঞ্চি ×১২ ইঞ্চি ×১৬ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) বিশিষ্ট লোহার তার দিয়ে তৈরি একটি খোপে ৩টি মুরগি রাখা যায়। খাঁচা একতলা বা দোতলা বা বহুতল বিশিষ্ট হয়। ৫০০টি লেয়ার মুরগি পালার জন্য এক সারিতে ২৮টি খোপ দিলে মোট ৮৪টি লেয়ার পালন করা যাবে।
অতএব প্রতি তলায় ২৮টি খোপ হিসেবে ৩ তলার পিরামিড আকৃতির খাঁচায় ৩ × ২৮ × ৩ × ২ = ৫০৪টি লেয়ার পালন করা যাবে।

লোহার অ্যাঙ্গেলে তৈরি পিরামিড আকৃতির অবকাঠামোর উপর প্রতি সারিতে ২৮টি খাঁচা বসানো যাবে। এক্ষেত্রে প্রতি তলার খাঁচার মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি নিচে ঘরের মেঝেতে পড়ে যায়। নিয়মিত বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে হয়। দোচালা বিশিষ্ট খোলামেলা নেট দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে খাঁচা বসানো হয়।

বাণিজ্যিক খামারের স্যানিটেশন:

বাণিজ্যিক খামারের স্যানিটেশন বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন :

১) মুরগির খাবার পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে। সপ্তাহে ১ বার জীবাণুনাশক ঔষুধ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২) লিটার সবসময় শুকনা ও ঝরঝরে রাখার জন্য সপ্তাহে ২-৩ বার ওলট-পালট করে দিতে হবে।

৩) খামারে যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

৪) প্রতি ব্যাচ লেয়ার বা ব্রয়লার বাজারজাতকরণের পর সাথে সাথে ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

৫) ঘরের জিনিসপত্র, যেমন : খাবার ও পানির পাত্র, চিকগার্ড, ব্রুডার, বালতি, জগ, মগ সবকিছু ভালোভাবে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে।

৬) ব্যবহৃত লিটার নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে।

৭) ঘর শুকানোর পর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ঘরের মেঝে ও দেয়ালের নিচের অংশ স্প্রে করতে হবে বা মুছে দিতে হবে।

৮) ঘর পরিষ্কার করার পর ৭ দিন খালি থাকবে। এ সময় ইঁদুর, আরশোলা, বন্য পাখি, কুকুর, শেয়াল যাতে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯) ঘরে কোনো দর্শনার্থীকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

১০) খামারে ও মুরগির ঘরের প্রবেশ পথের দরজায় জীবণুনাশক ঔষুধ মিশ্রিত পানি একটি বালতিতে রাখতে হবে। প্রবেশপথে পাটের বস্তা বিছিয়ে রাখতে হবে। ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঐ বস্তা উক্ত জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে তাতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

১১) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খামার কী?
২. পারিবারিক খামার কাকে বলে?
৩. অনিবিড় খামার কাকে বলে?
৪. মুরগির খামারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় এবং কী কী?
৫. নিবিড় ও অনিবিড় মুরগির খামার কাকে বলে?
৬. পারিবারিক খামারে মুরগি কোন কোন পদ্ধতিতে পালন করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পারিবারিক মুরগি খামারের উদ্দেশ্য কী?
২. পারিবারিক মুরগি খামারের স্থান নির্বাচন পদ্ধতি লিখ।
৩. পারিবারিক মুরগি খামারের স্যানিটেশন ব্যবস্থা লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পারিবারিক খামার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়নে কী কী বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে?
২. বাণিজ্যিক খামারের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
৩. বাণিজ্যিক খামারের সেনিটেশন বজায় রাখার উপায় সমূহ লিখ।
৪. পারিবারিক খামারের স্থান নির্বাচন ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
৫. বাণিজ্যিক খামারের স্থান নির্বাচন ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

২০২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্রয়লার হাইব্রিড পরিচিতি

৬.১ ব্রয়লারের সংজ্ঞা

মাংসল ভারী জাতের মোরগ-মুরগির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ব্রয়লার হাইব্রিড সৃষ্টি করা হয়, যাদের মাংস সুস্বাদু এবং অধিক খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ও দৈহিক বৃদ্ধির হার এর কারণে ৬-৭ সপ্তাহে প্রায় ৪-৫ কেজি খাদ্য খেয়ে ২-২.৫ কেজি ওজন হয়। তবে বর্তমানে ৫-৬ সপ্তাহ বয়সে ব্রয়লার বাজারজাত করা হয়।

৬.২ ব্রয়লার উৎপাদন কৌশল

বাণিজ্যিক ব্রয়লার উৎপাদন কৌশল

কৌলিতাত্ত্বিকভাবে ব্রয়লারকে এক ধরনের সংকর জাতের মোরগ/মুরগি যা কোনো বিশুদ্ধ ভারী জাতের মোরগ/মুরগি যেমন : কর্নিশ, সাসেক্স, প্লাইমাউথ রক, নিউ হ্যাম্পাশায়ার ইত্যাদির মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নত জাত তৈরি করা হয়েছে।

ব্রয়লার উৎপাদনের জন্য সাধারনত ব্রিটিশ ও আমেরিকান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ভারী বিশুদ্ধ জাত ব্যবহার করা হয়। যেগুলোর স্ত্রী জাতীয় মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বেশি, ডিমের উবরর্তা বেশি, দ্রুত বৃদ্ধি, পালক গজানো দ্রুততর হয়; পক্ষান্তরে পুরুষ জাতীয় অর্থাৎ মোরগগুলো আকারে বড় হয় অর্থাৎ পেশিসমৃদ্ধ, দ্রুত বৃদ্ধির হার , দ্রুত পালক গজানো এবং উপযুক্ত খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ব্রয়লার উৎপাদনের জন্য ভারী জাতের উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন মোরগ/মুরগি মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বাছাই ও প্রজননের মাধ্যমে মেললাইন ও ফিমেললাইন তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ব্রয়লার প্যারেন্ট লাইন তৈরি করা হয়। এ সব উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন মেললাইন ও ফিমেললাইনের মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্রয়লার উৎপাদন করা হয়। পরবর্তীতে স্ট্রেইন ক্রসিং-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্রয়লার উৎপাদন করা হয়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ব্রয়লার উৎপাদনের কৌশল দেখানো হলো।

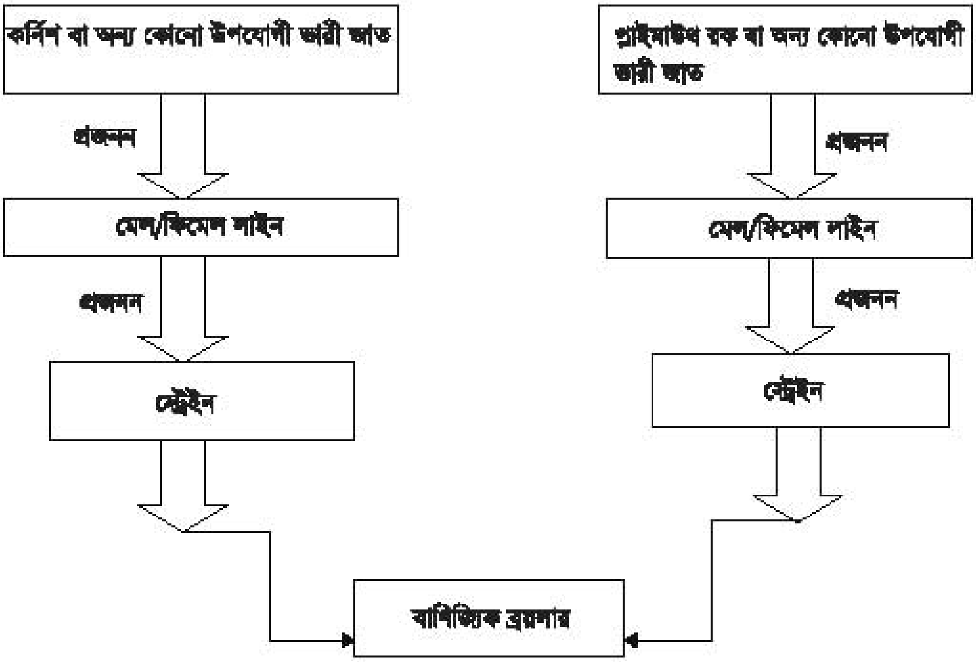

৬.৩ ব্রয়লার হাইব্রিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- দৈহিক বৃদ্ধির হার অধিক
- খাদ্যকে মাংসে রূপান্তরের দক্ষতা অধিক (১.৮-২ :১)
- এদের শরীর দ্রুত পালকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে
- এদের মাংসে নরম ও সুস্বাদু
- চামড়া নরম ও মোলায়েম
- এরা ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ২-২.৫ কেজি ওজনের হয়
- বক্ষাস্থি নরম ও মোলায়েম হয়
- বাচ্চা উৎপাদনের জন্য প্যারেন্ট ব্রিডার মোরগ মুরগির প্রয়োজন
- অল্প সময়ে রান্না করা যায়।

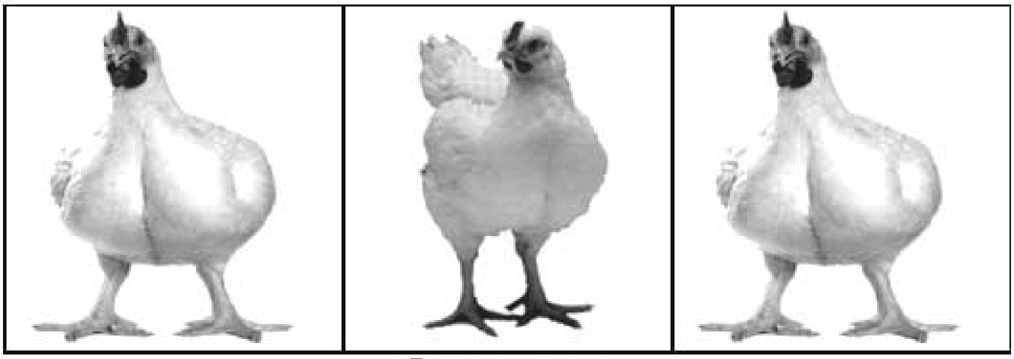

চিত্র : ৬.১ ব্রয়লার

৬.৪ বাংলাদেশে ব্রয়লারের বিভিন্ন স্ট্রেইন/হাইব্রিড পাওয়া যায় এমন হ্যাচারীর নাম-

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	স্ট্রেইনের নাম
কাজী হ্যাচারি	কব-৫০০, রস
সি.পি বাংলাদেশ কোং লিঃ	রস
বাংলাদেশ হ্যাচারি লিঃ, রাজবাড়ী	স্টার ব্রো
ঢাকা হ্যাচারি লিঃ, গাজীপুর	রস, ভ্যানকব
রাফিদ পোল্ট্রি	লোহম্যান
আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ, কিশোরগঞ্জ	হাবার্ড ক্লাসিক, আরবার একর্স
গোয়ালন্দ হ্যাচারিজ লিঃ, গোয়ালন্দ	এমপিকে ৩, আরবার এক্রস্, হাই ব্রো
প্যারাগন পোল্ট্রি লিঃ, গাজীপুর স্টার ব্রো,	হাবার্ড ক্লাসিক
সানোয়ারা পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারিজ লিঃ	কব-৫০০
নারিশ পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি লিঃ, গাজীপুর/সানফ্লাওয়ার হ্যাচারিজ/ বেলী চিকেন হ্যাচারিজ/ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হ্যাচারিজ	স্টার ব্রো
উষা পোল্ট্রি লিঃ, সাভার, ঢাকা	হাবার্ড ক্লাসিক, হাব চিকস, হাই ব্রো
এগস্ এন্ড হেনস্ লিঃ, কড্ডা, গাজীপুর	হাই ব্রো
বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স, গাজীপুর	স্টার ব্রো
ফিনিক্স হ্যাচারি লিঃ গাজীপুর	আরবার একর্স, রস
কাজলী হ্যাচারি	হাই ব্রো, হাবার্ড
হাসনা হেনা ক্যাটল অ্যান্ড পোল্ট্রি লিঃ	স্টার ব্রো
ভি আই পি হ্যাচারি/ রেনেটা	কব ৫০০
এস এম পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম	এভিয়ান কে-২৪
ইউনাইটেড ফুড কমপ্লেক্স	হাব চিকস
সিলভার কার্প	ইসা ভেডেট
এম এম আগা লিঃ	হাই ব্রো, হাব চিক
প্রাই হ্যাচারিজ	হাব চিকস
রোজ হ্যাচারি	হাই সেক্স, স্টার ব্রো
এ্যাকুয়া ব্রিডার	হাই ব্রো
ইনডেক্স হ্যাচারি	হাবার্ড ক্লাসিক

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার কাকে বলে?

২. পাঁচটি ব্রয়লার হাইব্রীডের নাম লিখ।

৩. বর্তমানে সাধারণত কত সপ্তাহ বয়সে ব্রয়লার বাজারজাত করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার হাইব্রিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

২. বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের ব্রয়লার হাইব্রিডের নাম উল্লেখ কর।

৩. বাংলাদেশে ব্রয়লার হাইব্রিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্রয়লার উৎপাদন কৌশল আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়
ব্রয়লার পালন পদ্ধতি

৭.১ ব্রয়লার খামার স্থাপনের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় :

- খামারের জন্য নির্বাচিত স্থান লোকালয় বা আবসিক ঘনবসতি এলাকা হতে দূরে, শুষ্ক, উঁচু ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন হতে হবে।
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অন্য মুরগির খামার বা প্রাণীর ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে হতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আশপাশ পচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত হতে হবে।
- বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ব্রয়লার উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।
- বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে।
- ভবিষ্যতে খামারটি সম্প্রসারণ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জমি নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে। বন্য জন্তু বা অবাঞ্ছিত লোকজন দ্বারা খামার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন স্থান হবে।
- দক্ষ লোকবল ও বিশেষজ্ঞ সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

৭.২ ব্রয়লার খামারে বাসস্থান

ব্রয়লারের বাসস্থান ত্রুটিপূর্ণভাবে তৈরি হলে ব্রয়লার পালন করে আশানুরূপ লাভজনক হওয়া যায় না। তাই ব্রয়লারের জন্য ঘর তৈরির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে :

(ক) ঘরের অবস্থান :

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সনাতন পদ্ধতিতে খোলামেলা ঘরে ব্রয়লার মুরগি পালন করা হয়।
- অবাধ বাতাস চলাচল ও ভেন্টিলেশন সুবিধার জন্য এই প্রকৃতির ঘর উত্তর-দক্ষিণে খোলা থাকে।
- এই ঘরের মধ্যে মুরগি আবদ্ধ রাখা এবং বন্যপ্রাণি, অনাহূত পশুপাখি ও দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঘরের খোলা স্থান তারের জাল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার ঘরের খোলামেলা স্থানে পর্দা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
- লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন করার সুবিধার্থে খোলা স্থানে নিচের অংশ ১ থেকে ১.৫ ফুট উচুঁ দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।
- মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন করার জন্য ঘরের সিলিং থেকে মাচার উপর পর্যন্ত তারের জাল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়।
- মাচার নিচে মুরগির পায়খানা জমার জন্য সম্পূর্ণ খালি থাকে।
- মেঝে থেকে মাচার উচ্চতা ৩ ফুট থাকে। প্রতি ব্যাচে ব্রয়লার পালন শেষে মাচার নিচে জমাকৃত পায়খানা পরিষ্কার করার সুবিধার্থে মাচা উঁচু রাখতে হয়।
- মাচার নিচে বর্ষার সময় যাতে পানি প্রবেশ না করে সেজন্য মেঝে জমি থেকে ১ ফুট উঁচু রাখতে হয়।
- শীতের সময় মাচার নিচ দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকা বন্ধ করার জন্য পলিথিন দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

২০২০

(খ) ঘরের প্রশস্ততা :
লিটার পদ্ধতিতে ঘরের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ১০ ফুট এবং সর্বাধিক ২৫ ফুট করা হয়।

- বাণিজ্যিক বৃহদাকার খামারে সর্বাধিক প্রশস্ততা ৪০ ফুট পর্যন্ত করা যায়। ৪০ ফুটের অধিক প্রশস্ত হলে ঘরে ভেন্টিলেশন সমস্যা হয়।
- মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করার জন্য বেশি প্রশস্ত ঘরে মাচার উচ্চতা ৭ ফুট করা প্রয়োজন। অন্যথায় মাচার নিচে জমাকৃত ময়লা পরিষ্কার করতে সমস্যা হয়।

(গ) ঘরের দৈর্ঘ্য :

- যে কোনো পরিমাপের সুবিধামত ঘরের দৈর্ঘ্য বড় করা যায়।
- ঘরে স্বয়ংক্রিয় পাত্র স্থাপন করতে হলে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে ও নির্দেশক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে হয়।

(ঘ) ঘরের উচ্চতা :

- ছোট ঘরের উচ্চতা : দোচালা ঘরের (গ্যাবল টাইপ) ছাদ ঘরের মেঝে থেকে ৬ ফুট এবং উভয় চালের শীর্ষদেশে ১০ ফুট হলেই যথেষ্ট।
- বাণিজ্যিক খামারে দোচালা ঘরের ছাদ মেঝে থেকে ৮ ফুট এবং উভয় চালের শীর্ষদেশে ১৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়।
- ঘর বেশি চওড়া হলে চালের উচ্চতা বেশি করা প্রয়োজন। অন্যথায় ভেন্টিলেশন সমস্যা দেখা দেয়।
- মাচাযুক্ত ঘরের উচ্চতা : মাচার উপর থেকে চালের ছাদ ৬ ফুট (১.৮ মিটার) এবং দুই চালের শীর্ষদেশে মাচার উপর থেকে ১০ ফুট (৩.০ মিটার) করা প্রয়োজন।

(ঙ) ঘরের চাল :

- ব্যবহারিক ভাবে বেশির ভাগ মুরগির জন্য দোচালা ঘর তৈরি করা হয়।
- দোচালা ঘরের চাল টিন, অ্যাসবেসটস অথবা খড়ের সাহায্যে তৈরি করা যায়।
- টিন বা অ্যাসবেসটস চালের নিচে গরম প্রতিরোধ জন্য কাঠ, হার্ডবোর্ড অথবা বাঁশের তরজা দিয়ে সিলিং করতে হয়।
- চালের ছাচ থেকে শীর্ষদেশের উচ্চতা এক চতুর্থাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ বেশি হয়।
- চালের ছাচ ২.৫ ফুট রাখতে হয়। না হলে বৃষ্টির ছাঁট ঘরে প্রবেশ করে।
- ঘরে চালার পরিবর্তে ৮ থেকে ১০ ফুট উঁচুতে কংক্রিট ছাদ তৈরি করা যায়।
- কংক্রিটযুক্ত ছাদের উপর বহুতল ঘর নির্মাণ করতে সুবিধা হয়।
- বহুতল ঘর তৈরি করলে যেমন স্থানের সাশ্রয় হয় তেমনি রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম থাকে।

(চ) ঘরের মেঝে :

- বাণিজ্যিক খামারে অবশ্যই ইঁদুর প্রতিরোধক কংক্রিটের মেঝে তৈরি করা উচিত।
- পারিবারিক ছোট খামারে কাঁচা কাঁকর বালিযুক্ত মেঝে তৈরি করা যায় তবে রোগ-বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে।
- কাঁচা মেঝে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে সমস্যা হয়।
- মাচাযুক্ত ব্রয়লার ঘরে মাচার নিচে কাঁকর ও বালুযুক্ত মেঝে তৈরি করা যায়। তবে মেঝেতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ বন্ধ করার জন্য মেঝে উঁচু রাখতে হয়।

২০২০

(ছ) ঘরের দরজা ঃ

বাণিজ্যিক মুরগির ঘরে প্রস্থের দিকে দরজা থাকে।

ছোট ঘরে দৈর্ঘ্যের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে দরজা থাকে।

বাণিজ্যিক ঘরের দরজা ৪ ফুট (১.১০ মিটার) প্রস্থ ও ৮ ফুট (২.৪ মিটার) উঁচু হয়।

ছোট ঘরে ট্রলির সাহায্যে লিটার ও ময়লা অপসারণ করতে হয়। এজন্য দরজার আকার ছোট থাকে।

(জ) ব্রুডারের জন্য জায়গা, খাবার ও পানির পাত্রের পরিমাণ ও যন্ত্রপাতির হিসাব নিচে দেওয়া হলো ঃ

জায়গা/ যন্ত্রপাতি	বিবরণ	বয়স	
		০-২ সপ্তাহ	৩-৮ সপ্তাহ
জায়গার পরিমাণ		১ বর্গফুট/ব্রয়লার	১ বর্গফুট/ব্রয়লার
চিক গার্ড	ব্যাস= ১২ ফুট উচ্চতা= ১.৫ ফুট	০.২২ বর্গফুট/ব্রয়লার	-
হোভার	ব্যাস= ৫ ফুট	১ টি/৫০০ বাচ্চা	-
চিক ফিডার	দৈর্ঘ্য=২ ফুট, প্রস্থ=১-৩ ইঞ্চি	৭-৮ টি/৫০০ বাচ্চা	-
চিক ড্রিংকার	ব্যাস=১.৪ ইঞ্চি, পরিধি=৩ ফুট ২ ইঞ্চি	-	-
ব্রুডার	১০০ ওয়াটের বাল্ব	৫ টি/ ৫০০ বাচ্চা	-
পানির পাত্র	৫ লিটার ধারণ ক্ষমতার গোলাকার প্লাস্টিকের পাত্র	৩০টি/৫০০ বাচ্চা	-
খাবার পাত্র	গোলাকার	২০ টি/৫০০ বাচ্চা	-

(ঝ) খাবার ও পানির পাত্রের মধ্যে যাতে বাচ্চা প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঞ) বাচ্চা ওঠানোর ১৫ দিন আগে ঘরটি রোগজীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

(ট) বাচ্চা ছাড়ার ১২-২৪ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার জ্বেলে ঘর গরম করতে হবে।

(ঠ) বাচ্চা যখন ঘরে ছাড়া হয় তখন পানি ও খাবার পাত্রগুলো সমদূরে সঠিক ভাবে স্থাপন করতে হবে।

চিত্র : ৭.১ চিক গার্ডের ভেতর খাবার ও পানি পাত্রের অবস্থান

২০২০

৭.৩ ব্রয়লার লালন-পালন পদ্ধতি

ব্রয়লার আবদ্ধ অবস্থায় তিন পদ্ধতিতে পালন করা যায়। যথা :

ক) লিটার পদ্ধতি

খ) মাচা পদ্ধতি

গ) খাঁচা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে খামারি ব্রয়লার পালন করতে ইচ্ছুক তার উপর নির্ভর করে ঘর তৈরি করা উচিত।

(ক) লিটারে পালন পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে ব্রয়লারের ঘরের মেঝেতে লিটার বিছিয়ে পালন করা হয়। লিটারের দ্রব্য হিসেবে ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। লিটারের পুরুত্ব ২.০-৩.০ ইঞ্চি হতে হবে। লিটার প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে উল্টিয়ে দিতে পারলে ভালো এবং কেকের মতো আকার ধারণ করলে তা ভেঙে দিতে হবে। এতে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং প্যারাসাইট-এর প্রকোপ কমে যাবে। প্রয়োজনে পুরাতন লিটারের উপর নতুন লিটার যোগ করতে হবে।

চিত্র : ৭.২ লিটারে পালন পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

(খ) মাচায় পালন পদ্ধতি :

যে সব এলাকায় বৃষ্টির পানি জমে বা মাটি অধিক আর্দ্র থাকে সেই সব এলাকাতে মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন করা প্রয়োজন। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে সহজেই মাচা তৈরি করা যায়। মাচার বাঁশ বা বাঁশের বাতা ১/২ ইঞ্চি করে ফাঁকা রাখা হয় যাতে ব্রয়লারের বিষ্ঠা সহজেই নিচে পড়ে যেতে পারে। মাচায় উচ্চতা মাটি থেকে ২.৫-৩.০ ফুট হতে হবে যাতে করে মাচায় নিচ দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে মুরগির বিষ্ঠা শুকাতে পারে। মাচা পদ্ধতিতে উলম্ব এবং আড়াআড়ি বাতাস প্রবাহের কারণে ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে এবং ব্রয়লার আরামবোধ করে। এই পদ্ধতিতে লিটার দ্রব্যের দরকার হয় না এবং রোগব্যাধিও কম হয়। মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালনের ক্ষেত্রে মাচার নিচের বর্জ্য পদার্থ নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং চুন ছিটিয়ে দিয়ে মাটি জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ৫০০ ব্রয়লার পালনের জন্য উপযোগী ঘরের মাচার নিচে ৩০-৩৫ কেজি চুন ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২০২০

চিত্র : ৭.৩ মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

(গ) খাঁচায় পালন পদ্ধতি :

অনেকের ধারণা আছে যে, খাঁচায় ব্রয়লার পালন করা যায় না, কারণ এতে বুকের মাংসে এবং পায়ের অসুবিধা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাঁচাতে ব্রয়লার পালন করা সম্ভব এবং ব্রয়লার খাঁচাতে পালন করলে খাদ্য গ্রহণ অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কিছুটা কম হয় কিন্তু অধিক দৈহিক ওজন লাভ করে এবং ব্রয়লারের বুকের মাংসে এবং পায়ের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। খাঁচায় লালন-পালনের ফলে রোগ-ব্যাধি কম হয়। ব্রয়লারের পালক পরিষ্কার থাকে যা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে এবং তুলনামূলক কম জায়গা দরকার হয়। তবে খাঁচা পদ্ধতিতে অন্য স্থানে ২ সপ্তাহ ব্রুডিং (ব্যাটারি ব্রুডার পদ্ধতির মতো) করার পর খাঁচাতে তুলতে হবে।

চিত্র: ৭.৪ ব্যাটারিখাঁচা ও খাঁচায় ব্রয়লার পালন

২০২০

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ৫০০ ব্রয়লার পালনের জন্য উপযোগী ঘরের মাচার নিচে কত কেজি চুন ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
২. লিটার পদ্ধতিতে মেঝে থেকে কত উঁচু পর্যন্ত দেয়াল থাকে?
৩. বাণিজ্যিক খামারে দোচালা ঘরের ছাদ থেকে মেঝের দূরত্ব কত ফুট?
৪. মাচা পদ্ধতিতে মাচা থেকে চালের ছাদের উচ্চতা কত ফুট?
৫. ঘরের চালের নিচে গরম প্রতিরোধের জন্য কী দ্রব্য দিয়ে সিলিং তৈরি করা যায়?
৬. পাঁচ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট হোভারে কতটি বাচ্চা পালন করা যায়?
৭. ৫০০ বাচ্চা পালার জন্য ব্রুডার এ কতটি ১০০ ওয়াটের বাল্ব লাগানো প্রয়োজন?
৮. ব্রুডারে বাচ্চা ছাড়ার কত ঘণ্টা আগে থেকে ব্রুডার জ্বালিয়ে গরম করতে হয়?
৯. লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালনের ক্ষেত্রে লিটার এর পুরুত্ব কত ইঞ্চি?
১০. মাচা পদ্ধতিতে মাচার বাঁশের বাতা কতটুকু ফাঁক রাখতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার খামার স্থাপনের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় লেখ।
২. লিটার পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ।
৩. মাচা পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন সংক্ষেপে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রয়লারের বাসস্থান তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
২. চিক গার্ডের অভ্যন্তরে খাবার ও পানির পাত্র কী ভাবে স্থাপন করতে হবে।
৩. ব্রয়লার কয়টি পদ্ধতিতে পালন করা যায়? পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

২০২০

অষ্টম অধ্যায়

ব্রয়লার পালনের বাসস্থান প্রস্তুতি

৮.১ ব্রয়লার খামার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবণুমুক্তকরণ

নতুন বা পুরাতন যে ঘর হোক না কেন, 'অল ইন অল আউট' পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ঘরে এক ব্যাচ ব্রয়লার পালন করে বিক্রয় করার কমপক্ষে ১৪ দিন পর অন্য ব্যাচ ওঠাতে হবে। এ পদ্ধতি শুধু রোগ প্রতিরোধই করে না রোগের জীবাণুকেও ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. ব্রয়লার বিক্রির পর সমস্ত সরঞ্জাম, লিটার, খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হবে।

২. পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩. ঘরের দেয়াল, পর্দা ভেন্টিলেটর, দরজা, জানালা, নেট, ফ্যান, বাল্ব ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

৪. ঘরে কোনো মেরামত, সংস্কার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. পরিষ্কার পানি দিয়ে দেয়াল মেঝে খাদ্য ও পানি পাত্র ধুতে হবে। পাইপ দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার উত্তম।

চিত্র ৭.১ : উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার

৬. জীবাণুনাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, আয়োসান) দিয়ে খাবার ও পানির পাত্র দেয়াল মেঝে, ছাদ পর্দা ও খামারের আশপাশ জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৭. ভিজা মেঝের উপর ১০০ বর্গফুট ১ কেজি হারে শুকনা কস্টিক সোডা ছড়াতে হবে এবং ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর মেঝে শুকিয়ে গেলে কস্টিক সোডার উপর হালকা করে পানি স্প্রে করে ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।

৮. ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুরাতন মুরগির ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বাচ্চা উঠানোর ৬ দিন পূর্বে সমস্ত জিনিসপত্র আবার জীবাণুমুক্ত করে শুষ্ক করে ভিতরে রাখতে হবে।

১০. বাচ্চা ব্রুডিং-এর ১ দিন পূর্বে লিটার বিছাতে হবে। ঘরে সমস্ত সরঞ্জাম স্থাপন করে বাচ্চা গ্রহণের ১২

২০২০

ঘণ্টা পূর্বে সম্পূর্ণ ঘর চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ফিউমিগেশন উপকরণ ব্যবহার করে ঘর ফিউমিগেশন করতে হবে।

১১. ফিউমিগেশনের জন্য প্রতি ১০০ ঘনফুট স্থানের জন্য ৬০ গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ১২০মি: লি: ফরমালডিহাইড ব্যবহার করতে হয়।

১২. ফিউমিগেশন করার ২০-৩০ মিনিট পর পর্দা সরিয়ে সম্পূর্ণ গ্যাস বেরিয়ে যেতে দিতে হবে।

১৩. ফিউমিগেশনের পর বাচ্চা প্রদানের ২/৩ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত ঘর তালাবদ্ধ রাখতে হয়।

১৪. বাচ্চা উঠানোর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই ঘরের ফুটবাথে জীবাণুনাশক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন ১ বার করে ঘরের বাইরের চতুর্পার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

১৬. নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরের আশপাশে কোনো প্রাণী বা লোক চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

৮.২ বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বাজায় রাখার কৌশল :

বাসস্থান এবং এর আশেপাশের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- খামারে পানি জমে স্যাঁতসেঁতে না হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মুরগির জাত ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাপের ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে তৈরি করতে হবে, যাতে মুরগি পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পায়।
- মুরগির খামারের উপরিভাগের তারের জাল দিয়ে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘরে যাতে বৃষ্টির ছাঁট পড়ে লিটার ভিজে না যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য ঘরের চালে পানি ছিটাতে হবে।
- ঘরের চারিদিকে পানি ছড়াতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ফগিং মেশিন দিয়ে পানি স্প্রে করে কুয়াশা তৈরি করতে হবে।
- ঘরের ভিতরে ও বাইরে ফ্যান চালাতে হবে।
- খামারে নতুন বাচ্চা উঠানোর আগে খামার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রথমে পানি দ্বারা পরিষ্কার করে পরে পানির সাথে জীবাণুনাশক মিশিয়ে খামার জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- হ্যাচারি থেকে সুস্থ সবল বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে সালমোনেলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি রোগ হ্যাচারি থেকে খামারে আসতে পারে।
- খামারে ভালো খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।
- খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে যাতে বন্য প্রাণী ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, লিটার নিয়মিত পরিষ্কারসহ মুরগির ঘরের ভিতরের পরিবেশ অবশ্যই

স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

- খামারে কোনো মুরগি অসুস্থ হলে যত দ্রুত সম্ভব পৃথক করে ফেলতে হবে। মারা গেলে তা সাথে সরিয়ে নিয়ে অবশ্যই মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- খামারে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার পালনে 'অল ইন অল আউট' পদ্ধতিতে কতদিন পর নতুন ব্যাচ উঠাতে হবে?
২. কয়েকটি জীবাণুনাশকের নাম লিখ।
৩. ঘরের মেঝে পরিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ বর্গফুট স্থানে কতটুকু শুকনা কস্টিক সোডা ছিটাতে হয়?
৪. ঘর ফিউমিগেশনের ক্ষেত্রে ১০০ ঘনফুট স্থানের জন্য কতটুকু পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ও ফরমালডিহাইড প্রয়োজন?
৫ . গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য একটি পদক্ষেপ লেখ।
৬. কী কী রোগ হ্যাচারি থেকে খামারে আসতে পারে?
৭. অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাদ্য খাওয়ালে কী রোগ দেখা দিতে পারে?
৮. মুরগি মারা গেলে মরা মুরগিকে কী করা উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে ব্রয়লার খামার ফিউমিগেশন করবে।
২. অল ইন অল আউট পদ্ধতি লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রয়লারের ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার ধাপগুলো আলোচনা কর।
২. বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বাজায় রাখার কৌশল লেখ।

নবম অধ্যায়

লিটার

পোল্ট্রি পালনে লিটারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপর্ণ। আবদ্ধ অবস্থায় পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে লিটার পদ্ধতিতে মুরগির বিছানা হিসাবে লিটার ব্যবহার করা হয়। পোল্ট্রি লিটার অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। লিটার একদিকে যেমন পোল্ট্রি উৎপাদনে সহায়তা করে, ঠিক তেমনি সঠিকভাবে লিটারের যত্ন না নিলে এ থেকে বিভিন্ন রোগেরও সৃষ্টি হতে পারে।

৯.১ লিটারের সংজ্ঞা :

পশুপাখির বিছানাকেই ইংরেজিতে লিটার (Litter) বলে অর্থাৎ লিটার বলতে পোল্ট্রির ঘরে শয্যা হিসেবে ব্যবহৃত নানাবিধ বস্তুকেই বোঝায়। এক কথায় বাসস্থান আরামদায়ক করার জন্য পোল্ট্রির ঘরে যে বিছানা ব্যবহার করা হয় তাকে লিটার বলে।

৯.২ আদর্শ লিটারের বৈশিষ্ট্য :

- লিটার দ্রব্য অবশ্যই নরম ও আরামদায়ক হবে।
- অধিক পানি শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।
- ওজন হালকা হবে ও দ্রুত শুকানোর ক্ষমতা থাকবে।
- শুষ্ক, ঝরঝরে ও ধূলিমুক্ত হবে।
- তাপ পরিবহন ক্ষমতা কম হবে।
- আবহাওয়ার আর্দ্রতা কম শোষণ করবে।
- সহজলভ্য ও সস্তা হবে।
- ছত্রাক ও পরজীবীমুক্ত হবে।
- ভেজা হওয়া চলবে না।
- মুরগি পালন শেষে উন্নত মানের সার হিসাবে ব্যবহারপযোগী হবে।

৯.৩ লিটার হিসাবে ব্যবহৃত উপকরণ গুলোর নাম :

১) ধানের তুষ
২) কাঠের গুঁড়া
৩) খড়ের ছোট ছোট টুকরা
৪) আখের ছোবড়া
৫) বালি
৬) ভুট্টা মোচার ছোবড়া ইত্যাদি।

লিটারের প্রয়োজনীয়তা :–

নিম্নলিখিত কারণে পোল্ট্রির ঘরে লিটার বিছানোর প্রয়োজন পড়ে। যথা–

- পোল্ট্রিকে আরামে রাখার জন্য।
- পোল্ট্রির বিষ্ঠার জলীয় অংশ শোষণ করে ঘরকে ময়লা ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য।
- পোল্ট্রির শরীরকে পরিষ্কার রাখার জন্য।

- ময়লামুক্ত খোসার ডিম পাওয়ার জন্য।
- শীতের দিনে ঘর গরম রাখা ও গরমের দিনে ঠাণ্ডা রাখার জন্য।

লিটারের শ্রেণিবিন্যাস:-
সাধারণত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লিটারের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যথা-

ক. কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।
খ. লিটারের পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে।
গ. লিটারের স্থায়ীত্বকালের ওপর ভিত্তি করে।

ক. কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে লিটার দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা-
১. জৈবিক লিটার (Organic litter) : যখন জৈব পদার্থ, যেমন- কাঠের গুঁড়া, আঁখের ছোবড়া ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
২. অজৈবিক লিটার (Inorganic litter) : যখন অজৈব পদার্থ, যেমন– ছাই, বালি ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

খ. পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে লিটার দু-ধরনের হয়ে থাকে। যথা-
১. সাধারণ লিটার (Normal litter): এ ধরনের লিটার সাধারণত: ৫-৭ সে.মি. পুরু হয়ে থাকে। ব্রয়লার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
২. ডিপ লিটার (Deep litter): এ ধরনের লিটার সাধারণত ১৫-২৩ সে.মি. (৬-৯ ইঞ্চি) পুরু হয়ে থাকে। ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ. স্থায়ীকালের ওপর ভিত্তি করে লিটার দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা-

১. তাজা লিটার (Fresh litter) : সাধারণত ২ মাস সময়কাল পর্যন্ত লিটার প্রায় পরিষ্কার থাকে। তাই একে তাজা লিটার বলে।
২. বিল্ট আপ লিটার (Built up litter) : সাধারণত ৬ মাসের পুরনো লিটারকে বিল্ট আপ লিটার বলে।

৯.৪ মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা :
১। মুরগি ঘরে রাখার এক সপ্তাহ পূর্বে লিটার বিছাতে হবে।
২। লিটার বিছানোর পূর্বে ভালোভাবে ঘরের মেঝে শুকাতে হবে।
৩। লিটার ভেজা থাকলে রোদে শুকাতে হবে, তবে লিটার সামগ্রীতে ২০-২৫% আর্দ্রতা না থাকলে মুরগির দেহের জলীয় বাষ্প শুষে নেয়।
৪। লিটার বেশি আর্দ্র হলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় যা মুরগির সমস্যার সৃষ্টি করে।
৫। ব্যবহারের পূর্বে লিটার জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা উচিত।
৬। হাতের মুঠোয় লিটার নিয়ে খুব জোরে মুষ্টিবদ্ধ করলে যদি লিটার জমাট না বাঁধে বা ঝরঝর করে ঝরে না যায় তাহলে লিটারের অবস্থা ভালো বুঝতে হবে। ২০২০

চিত্রঃ-৯.১ লিটার পরীক্ষা

৭। ব্রুডারে বাচ্চা গ্রহণের ২/৩ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করতে হয়, বেশি পূর্বে চালু করলে গরমে লিটার শুকিয়ে যায়।

৮। শুকনা লিটারে বাচ্চা দিলে বাচ্চার শরীর থেকে লিটার আর্দ্রতা শুষে নেয় এবং বাচ্চার ডি-হাইড্রেশন হয়।

৯। লিটারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার পায়খানা থেকে পানীয় অংশ লিটারে শোষিত হয় এবং লিটার ভিজে যায়।

১০। লিটার বেশি ভিজলে আর্দ্রতা কমানোর জন্য ঘরের মধ্যে বাতাসের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হয়। এতেও আর্দ্রতা না কমলে পুরাতন লিটারের সাথে নতুন লিটার মেশাতে হয়।

১১। লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে ছত্রাক বা মোল্ড যাতে জন্মাতে না পারে সেজন্য লিটার ভালোভাবে ওলট পালট করতে হয়।

১২। ২ মাস পর্যন্ত লিটার প্রতি সপ্তাহে আচড়া দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

১৩। লিটার কেক হলে কেক ভেঙে দিতে হবে।

১৪। ঘরের পরিবেশ বেশি শুকনা হলে বাচ্চার বৃদ্ধি কমে ও সুষ্ঠুভাবে পালক গজায় না, তাই লিটারে সঠিক আর্দ্রতা বজায় থাকলে এই অবস্থার অবসান ঘটে।

১৫। ব্রুডারে বাচ্চার লিটারে চুন ব্যবহার করা ঠিক নয়, প্রয়োজন হলে সুপার ফসফেট ব্যবহার করা যায়।

১৬। ব্রুডিং-এর প্রথমদিকে লিটারের উপর পাটের চট বা নিউজ পেপার বিছিয়ে দিতে হবে।

১৭। গরমের সময় ২ ইঞ্চি এবং শীতের সময় ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছাতে হবে।

১৮। লিটারের উপকরণ হতে ধুলা যাতে বাতাসের সাথে মিশে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য লিটারের পরিচর্যা করতে হবে।

১৯। লিটার যদি ভিজে যায়, তবে সেগুলো উপর থেকে ফেলে দিয়ে নতুন লিটার দিতে হবে।

২০। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বাতাসে জলীয়ভাগ বেশি সেখানে পুরু বিছানা বয়লারের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই উত্তম।

২১। প্রতি ব্যাচ ব্রয়লারের জন্য নতুন বিছানা ব্যবহার করা উচিত, তবে লিটার ব্যয়বহুল হলে বা সহজে পাওয়া না গেলে পুরোনো বিছানা জীবাণুমুক্ত ও কীটনাশক দ্বারা বিশোধন করে ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লিটার কাকে বলে?
২. বেশি শুকনা লিটারে বাচ্চা দিলে বাচ্চার কী সমস্যা হয়?
৩ . লিটার হিসাবে ব্যবহৃত উপকরণগুলোর নাম লেখ।
৪. গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্রয়লারের জন্য কোন ধরনের বিছানা ব্যবহার উত্তম?
৫. ব্রুডারে বাচ্চার লিটারে চুনের পরিবর্তে কী ব্যবহার করা হয়?
৬. গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্রয়লারের জন্য কোন ধরনের বিছানা ব্যবহার উত্তম?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লিটার হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী কী?
২. ব্রয়লারের পালনের ক্ষেত্রে পুরাতন বিছানা ব্যবহার করতে চাইলে কী করতে হবে?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১. লিটারের অবস্থা ভালো না খারাপ পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।
২. ঘরে লিটার স্থাপনের নিয়মাবলিগুলো কী এবং এর পরিচর্যা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২০

দশম অধ্যায়

হ্যাচারি থেকে ব্রয়লার বাচ্চা সংগ্রহ ও পরিবহন

১০.১ হ্যাচারি থেকে বাচ্চা সংগ্রহ :

গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চাই হচ্ছে সাফল্যজনকভাবে ব্রয়লার উৎপাদনের চাবিকাঠি। বর্তমানে অনেক ছোট-বড় হ্যাচারি বাচ্চা উৎপাদন করছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা ফোটানোর সময় বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। যে সকল খামারিগণ পূর্বঅভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ না নিয়েই খামার শুরু করেন, তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে প্রায়শই সুস্থ-সবল বাচ্চার বদলে নিম্নমানের রোগাক্রান্ত বাচ্চা দিয়ে খামার শুরু করেন।

হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয়ের সময় যে বিষয় গুলো প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য তা হলো–

- বাচ্চার দাম
- সহজ প্রাপ্যতা
- বিশ্বস্ত মাধ্যম ও
- বাচ্চার গুণাগুণ

তাই কম দামে নিম্নমানের হ্যাচারি থেকে বাচ্চা না কিনে গুণগতমানসম্পন্ন, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত এবং সুনাম আছে এমন হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয় করা প্রয়োজন।

হ্যাচারি থেকে বাচ্চা কেনার সময় যে বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য তা হলো–

(১) বাচ্চার দাম : বাচ্চার দাম কম হলেই কোনো নিম্নমানের হ্যাচারি থেকে বাচ্চা না কিনে গুণগতমান সম্পন্ন বাচ্চা কিনতে হবে।

(২) সহজ প্রাপ্যতা : গুণগতমানসম্পন্ন বাচ্চা যা খামারির কাছাকাছি সহজ প্রাপ্য সেইসব বাচ্চা ক্রয় করতে হবে এবং নিকটবর্তী এজেন্টদের কাছ থেকে সংগ্রহ করাই উত্তম।

(৩) বিশ্বস্ত মাধ্যম : পরিচিত, বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত, সুনাম আছে এমন হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয় করতে হবে।

(৪) বাচ্চার গুণাগুণ : বাচ্চার সুস্থ্যতা ও আকার নিশ্চিত করতে হবে। কোনো খামারি বাচ্চার রং দেখে অধিক গুণগতমানের বলে মনে করেন। এটা ঠিক নয়। হ্যাচারিতে নিয়মিত ফরমালডিহাইড দ্বারা ফিউমিগেশন করলে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চার রং হলুদাভ দেখা যায় এবং বাচ্চার শ্বাসনালীতে ক্ষত থাকার কারণে বাচ্চার গুণগতমান কমে যায়।

১০.২ আদর্শ বাচ্চার বৈশিষ্ট্য

১) বাচ্চার ওজন ও আকৃতি সমমানের হবে।
২) বাচ্চার গড় ওজন ৪০-৪২ গ্রামের কাছাকাছি।
৩) বাচ্চা পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত, শুষ্ক ও ঝরঝরে দেখা যাবে।
৪) কিচিরমিচির শব্দ করে চঞ্চল ও প্রাণোচ্ছল থাকবে, বাচ্চার নড়াচড়াতে স্বাভাবিক স্বাচ্ছ্যন্দ থাকবে।
৫) বাচ্চা অন্ধ হবে না, বাচ্চার উজ্জ্বল, স্বচ্ছ এবং ক্ষতমুক্ত চোখ থাকবে।
৬) বাচ্চা ল্যাংড়া বা দুর্বল হবে না এবং ঢলে পড়বে না।
৭) বাচ্চা আঠালো হবে না অর্থাৎ বাচ্চা ডিমের ভিতরকার বস্তুর দ্বারা আবৃত থাকবে না।

২০২০

৮) বাচ্চার নাভীদেশ কুসুম থলিমুক্ত, পরিপূর্ণভাবে শুষ্ক এবং অক্ষত থাকবে। বাচ্চার নাভী অমসৃণ বা সংকুচিত হবে না।

৯) পা কোঁকড়ানো হবে না, পায়ের গঠন হবে স্বাভাবিক, হাঁটুদ্বয় স্বাভাবিক আকৃতির এবং চামড়া অক্ষত, মসৃণ ও তুলতুলে থাকবে।

১০) পায়ের আঙুল ও নখ এবং ঠোঁটের অস্বাভাবিক গঠন অর্থাৎ কোঁকড়ানো আঙুল বা বাঁকানো ঠোঁট হবে না।

১১) পা ফ্যাকাশে হবে না। পায়ের অনাবৃত অংশ স্বচ্ছ এবং চকচকে থাকবে।

১২) বাচ্চার গলা বাঁকা থাকবে না।

১৩) পায়ের হক জয়েন্ট ফোলা বা লাল আভা যুক্ত হবে না।

১৪) বাচ্চা যে কোনো সংক্রামক রোগমুক্ত হবে এবং একদিনের বাচ্চাকে প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া থাকতে হবে।

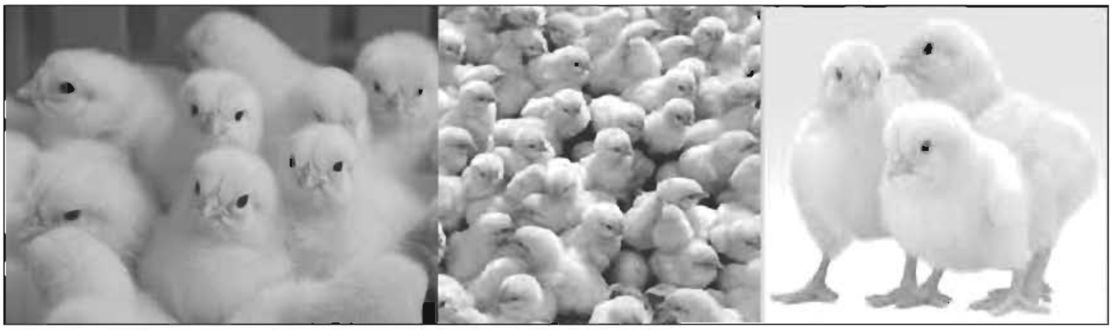

চিত্র ১০.১ : গুণগতমানসম্পন্ন বাচ্চা

চিত্র ১০.২ : নিম্নমান সম্পন্ন বাচ্চা

১৫) শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এবং ধকল থেকে মুক্ত থাকবে।

১৬) পায়ুপথ শুকনো এবং কোমল হবে। পায়ুপথের চারপাশের পালক জট পাকানো কিংবা ভেজা অথবা চুনাযুক্ত হবে না।

১৭) প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার মৃত্যুহার ১% এর কম থাকবে এবং ২য় সপ্তাহে কোনোভাবেই ১.৫% এর বেশি হবে না।

২০২১

১৮) বাচ্চা সবসময় পানি এবং খাবার সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করবে।
১৯) তলপেট নরম এবং কোমল হবে, ফাঁপা বা শক্ত হবে না।
২০) নাভীর চারপাশ ডাউন ফেদার শূন্য হবে না।
২১) দেহ স্পর্শ করলে দৃঢ় মনে হবে।
২২) বাচ্চার আচরণ হবে সতর্ক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল।

১০.৩ বাচ্চা প্যাকেজিং ও পরিবহন

বাচ্চা প্যাকিং করা

বাচ্চা নামানো হয়ে গেলে এগুলোকে ক্রেতার নিকট বিতরণের জন্য প্যাকিং করতে হবে। বাচ্চাগুলোকে বিশেষ ধরনের বাক্সে প্যাকিং করা হয়। বাক্সগুলোর দেয়াল কাগজের তৈরি এবং তা ভেতরের দিকে চাপানো থাকে। প্রতিটি বাক্সে সাধারণত ১০০টি করে বাচ্চা থাকে। প্রতি ১০০টি বাচ্চার সঙ্গে রিপ্লেসার হিসেবে ২-৪টি অতিরিক্ত বাচ্চা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এ ধরনের বাক্সে বাচ্চাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়ার জন্য যথেষ্ট বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকে। বাক্সের ভেতরে বাচ্চারা যাতে আরামে থাকতে পারে সেজন্য বাক্সের মেঝেতে কাগজের টুকরো বা কাঠের গুঁড়ো লিটার হিসেবে দেওয়া হয়। ১০০টি বাচ্চার জন্য চিক বাক্সের মাপ নিম্নরূপ হবে–

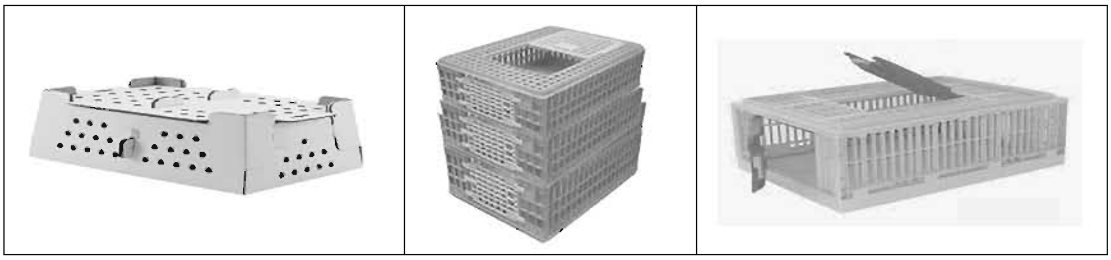

চিত্র : ১০.১ বাচ্চা পরিবহন বক্স

শীতকালীন বক্স- ৫৬ সে.মি. × ৪৬ সে.মি. × ১৫ সে.মি.
গ্রীষ্মকালীন বক্স- ৫৬ সে.মি. × ৪৬ সে.মি. × ১৮ সে.মি.

ব্রয়লার বাচ্চা পরিবহন

বাচ্চা বাছাই ও প্যাকিং-এর পর হতে যত দ্রুত সম্ভব খামারে পৌঁছে দেওয়া যায় ততই ভালো। হ্যাচারি থেকে খামার পর্যন্ত বাচ্চা পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রায়োজন :

ক) সঠিক প্যাকিং।
খ) পরিবহনের বাচ্চার জন্য সহায়ক এবং সুসহনীয় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা।
গ) বাচ্চা বিতরণকারী এজেন্সি পর্যায়ে সঠিক বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা।

একদিনের বাচ্চা অত্যন্ত স্পর্শকাতর থাকে। স্থানান্তরের সময় যদি ধকল সইতে হয় তাহলে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় প্রকার ক্ষতিকর প্রক্রিয়া দেখা যায়। ধকল আক্রান্ত বাচ্চা হয় বাক্সের মধ্যে মারা যাবে বা কিছুক্ষণ পর মারা যাবে। যেসব বাচ্চা জীবিত থাকবে, তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

চিত্র : ১০.২ বাচ্চা পরিবহন

পরিবহনে সতর্কতা

পরিবহনের সময় পীড়নজনিত সমস্যার প্রতিরোধের জন্য বাক্সগুলো ৩ স্তরের বেশি উঁচু করা যাবে না।

বাচ্চার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্মল বাতাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানান্তরের সময় ২ ঘন্টার বেশি হলে বাক্সগুলো পুনরায় সাজাতে হবে। যেমন : নিচের বাক্স উপরে; বামের বাক্স ডানে ইত্যাদি।

পরিবহনের সময় গাড়িতে অতিরিক্ত ঝাঁকুনি এবং সূর্যের প্রখর আলো যেন না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিবহনের সময় যাতে অধিক ঠাণ্ডা বা গরম না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় ৯০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয়ের প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী।
২. হ্যাচারিতে নিয়মিত ফিউমিগেশন করলে বাচ্চার কী রং দেখা যায়?
৩. শীতকালীন বাচ্চা পরিবহন বক্সের মাপ লেখ।
৪. গ্রীষ্মকালীন বাচ্চা পরিবহন বক্সের মাপ লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার বাচ্চা পরিবহন ও পরিবহনের সময় সতর্কতাসমূহ বর্ণনা করুন।
২. বাচ্চা পরিবহনের সময় ২ ঘন্টার বেশি হলে বাক্সগুলো কীভাবে সাজাতে হবে?
৩. হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয়ের প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
৪. বাচ্চা প্যাকেজিং কীভাবে করতে হয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয়ের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হবে বিস্তারিত লেখ ।
২. হ্যাচারি থেকে খামার পর্যন্ত বাচ্চা পৌঁছানোর সময় কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়? বর্ণনা কর।
৩. গুণগতমানসম্পন্ন বাচ্চার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

একাদশ অধ্যায়

ব্রয়লার বাচ্চা ব্রুডিং

১১.১ ব্রুডিং কী?

মুরগির বাচ্চাকে কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে লালন পালন করাকে ব্রুডিং বলে। সাধারণত ১ দিন হতে ৩ বা ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত মুরগির বাচ্চাকে ব্রুডিং করা হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর তারা তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ তার শরীরে পর্যাপ্ত পালক থাকে না ।

উৎপাদিত বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট, যেখানে একটি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগির শরীরের তাপমাত্রা ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বাচ্চার দেহের এই তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিপালন করতে হয়। তাই পীড়নের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্যই ব্রুডিং করা হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাকে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার বলে।

ব্রুডিং এর সুফল :

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে।
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে সুরক্ষিত থাকে।
- সমস্ত বাচ্চা সমানভাবে বেড়ে ওঠে।
- সঠিক শারীরিক গঠন হয়।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।
- ঠাণ্ডা গরম বৃষ্টি, প্রতিকুল আবহাওয়া ইত্যাদি থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করা যায়।

১১.২ ব্রুডিংকালীন সময়ে ব্রুডারে তাপের উৎস

ব্রুডিংকালীন সময়ে ব্রুডারে তাপের উৎস হিসাবে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন-

১. বিদ্যুৎ : বৈদ্যুতিক বাল্ব বা হিটার

২. কেরোসিন : কেরোসিন হিটার

৩. গ্যাস : গ্যাস হিটার

১১.৩ ব্রয়লার বাচ্চার বয়স অনুযায়ী ব্রুডিং-এর তাপমাত্রা

ব্রুডার হাইজে প্রথম সপ্তাহে সাধারণত ৯৫° ফারেনহাইট তাপমাত্রা দিয়ে ব্রুডিং আরম্ভ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমেতা কমিয়ে আনা হয়।

বাচ্চার বয়স (সপ্তাহ)	ব্রুডিং তাপমাত্রা		মন্তব্য
	ডিগ্রি ফারেনহাইট (^{0}F)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (^{0}C)	
১	৯৫	৩৫	শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ ও গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করানো হয়। এর পর বাচ্চা প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।
২	৯০	৩২	
৩	৮৫	২৯	
৪	৮০	২৭	
৫	৭৫	২৪	
৬	৭০	২১	

২০২০

উপরে যে তাপমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্রুডারের তাপমাত্রা। হোভার ও চিক গার্ডের মাঝখানে মেঝে থেকে প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচুতে থার্মোমিটার ঝুলিয়ে এই তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায়।

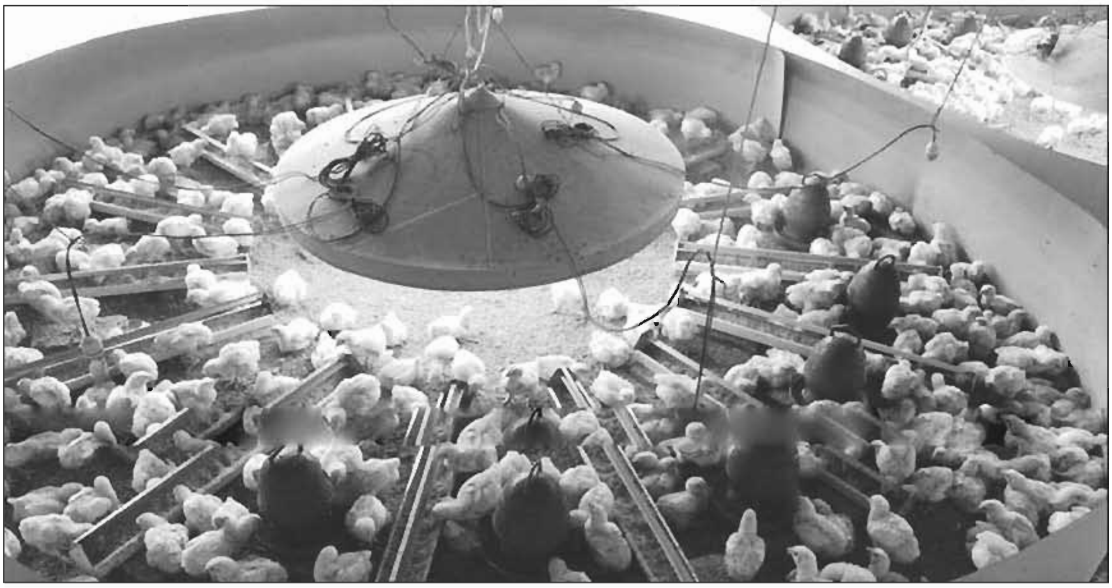

চিত্র:১১.৪ ব্রয়লার বাচ্চা ব্রুডিং

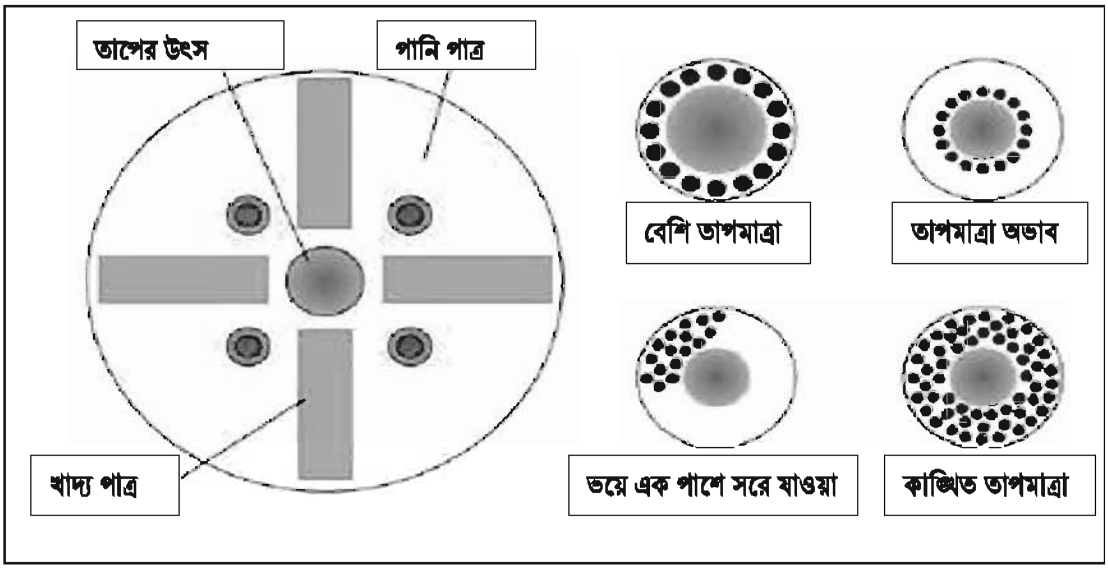

চিত্র :১১.৫ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

থার্মোমিটার ছাড়াও ব্রুডারের তাপ সঠিক হয়েছে কিনা তা ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান এবং চলাফেরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায়।

ক) কাম্য তাপমাত্রা :

যে তাপমাত্রায় বাচ্চাগুলো আরাম বোধ করে ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে তাই কাম্য তাপমাত্রা।

২০২০

কাম্য তাপমাত্রার লক্ষণ : বাচ্চা চিক গার্ডের মধ্যে সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকবে ও চলাফেরা করবে। খাদ্য ও পানি গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যাবে। বাচ্চাগুলোর চলাফেরায় চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হবে।

খ) অতিরিক্ত ঠাণ্ডা : যদি ব্রুডারে তাপমাত্রা কাম্য তাপমাত্রার তুলনায় কম হয় তখন বাচ্চাগুলো ঠাণ্ডা অনুভব করে।

কম তাপমাত্রার লক্ষণ : ব্রুডারের নিচে তাপের উৎসের কাছে সমস্ত বাচ্চা জড়ো হয়ে থাকবে। চিঁ চিঁ শব্দ করে ঘাড় ছোট করে গুটিসুটি মেরে থাকে। একটির উপর আরেকটি বাচ্চা ওঠার প্রবণতা দেখা যায় অর্থাৎ গাদাগাদি করে থাকে। খাদ্য ও পানি খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

প্রতিকার : ব্রুডার পর্যাপ্ত তাপ উৎপাদনে সক্ষম কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ উৎপাদনে সক্ষম ব্রুডার ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত ব্রুডারের তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা এবং ঠাণ্ডা বাতাস যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
গ) অতিরিক্ত গরম : ব্রুডারের কাম্য তাপমাত্রার তুলনায় অধিক তাপমাত্রা থাকলে বাচ্চা গুলো অধিক গরম অনুভব করে।

অতিরিক্ত তাপমাত্রার লক্ষণ: বাচ্চাগুলো তাপের উৎস থেকে দূরে সরে গিয়ে চিকগার্ডের কাছাকাছি অবস্থান করে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকে। খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়।
প্রতিকার : তাপের উৎসের সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। ঘর ঠাণ্ডা করার জন্য বেড়া দেওয়া পর্দা তুলে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ব্রুডার ঘরে অতিরক্তি ঠাণ্ডা যেমন ক্ষতিকর তেমনিই অতিরিক্ত গরমও বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্চার দেহে পীড়ন পড়ে ও বাচ্চা সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কাজেই ব্রুডার ঘরের কাম্য তাপমাত্রা সবসময় বজায় রাখতে হবে।

১১.৫ ব্রুডিংকালীন সময়ে খাদ্য, পানি ও আলোক ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিংকালীন সময়ে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা :
ব্রয়লারের সুস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের জন্য সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি জীবাণুমুক্ত ও রাসায়নিক পদার্থ মুক্ত হতে হবে।

- ব্রয়লার বাচ্চা হ্যাচারি থেকে আনার পর গ্লুকোজ, পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বা ভিটামিন ডব্লিউ এস এবং ভিটামিন সি মিশ্রিত পানি খেতে দিতে হবে। এক্ষেত্রে–
  গ্লুকোজ = ২৫ গ্রাম ১ লিটার পানিতে
  ভিটামিন ডব্লিউ এস = ১ গ্রাম ২ লিটার পানিতে
  ভিটামিন সি = ১ গ্রাম ৩ লিটার পানিতে
- ব্রুডারে পূর্ব থেকে পাত্রে পানি প্রদান করা হয়।
- ভিটামিন মিশ্রিত পানি পানে বাচ্চার ভ্রমণকালীন সময়ে পীড়নহ্রাস পাবে, পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করবে এবং খাদ্য পরিপাক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
- ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার ৩ ঘণ্টা পরে বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্য অল্প পরিমানে ট্রেতে

২০২০

সরবরাহ করতে হবে।

- কোন বাচ্চা পানি পান করতে না পারলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হবে।
- খাদ্য প্রদানের পূর্বে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে প্রতিটি বাচ্চা সুষ্ঠুভাবে পানি পান করেছে।
- প্রথম ১-৪ দিন পর্যন্ত লিটারে ট্রে পাত্রের পাশাপাশি ট্রাফ পাত্রের খাবার দিতে হবে।
- ৪র্থ দিনের পর মেঝেতে বিছানো খাদ্য পাত্র তুলে ফেলতে হয়।
- খাদ্য কখনই ব্রুডারের নিচে ছিটানো উচিত নয়।
- ব্রয়লার বাচ্চার প্রাথমিক খাদ্য বা স্টার্টার রেশন হিসাবে ক্রাম্বল খাদ্য ব্যবহার করা হয়।
- খাদ্য দেওয়ার সময় কখনও পাত্র পরিপূর্ণ করে দেওয়া ঠিক না। পাত্রের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখলে অপচয় কম হয়।
- প্রথম দিন ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত বাচ্চাদের গ্লুকোজ মিশ্রিত পানি দিতে হয়।
- দিনের খাদ্য ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করে সকালে-বিকালে বা সকালে-দুপুরে ও বিকালে দেওয়া যেতে পারে
- প্রতিদিন একই সময় খাবার প্রদান করতে হবে ।
- প্রতিদিন পানির পাত্র পরিষ্কার করতে হয় ও বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করতে হয়।
- সাধারন তাপমাত্রায় বাচ্চা দৈনিক যে পরিমান খাদ্য খায়, তার দ্বিগুণ পানি খায়।
- বাচ্চা যাতে প্রথম ৩ সপ্তাহ সবসময় পেট ভরে খেতে পারে- সেটা খেয়াল রাখতে হবে।
- এরপর দিনে ৪/৫ বার করে খাদ্য দিতে হবে । ২ঘণ্টার বেশি সময় যেন খাদ্য পাত্র খালি না থাকে।
- সরবরাহকৃত পানি বিশুদ্ধকরণে ব্লিচিং পাউডার বা ৩ পিপি এম ক্লোরিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ভ্যাকসিন ও ভিটামিন পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগের সময় ব্লিচিং পাউডার পানিতে মেশানো যাবে না।

ব্রয়লারের দৈহিক ওজন ও খাদ্য গ্রহণ :

বয়স (সপ্তাহ)	দৈহিক ওজন (গ্রাম/প্রতি ব্রয়লার)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/ব্রয়লার/সপ্তাহ)
১	১০০-১১০	৯০-১১০
২	২৪০-২৬০	১৭০-২০০
৩	৪২০-৪৫০	৩১০-৩৪০
৪	৬৫০-৭৫০	৪০০-৪২০
৫	৯০০-১০০০	৫০০-৫৫০
৬	১২০০-১৬০০	৬৫০-৭২৫
৭	১৬০০-২০০০	৭৫০-৯০০

তাপমাত্রা অনুসারে ১০০ ব্রয়লার বাচ্চার দৈনিক পানি গ্রহণের পরিমাণ (লিটার) :

বয়স (সপ্তাহ)	৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট	৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট	১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট
১	১.৩২	১.৪৩	১.৮৯
২	৩.৭২	৪.৫১	৫.০৬
৩	৬.০৭	৮.২৪	১১.৮৬
৪	৮.৯৫	১২.৪৯	১৬.২৩
৫	৯.৫২	১৫.৮৮	১৯.২৮
৬	১০.৭৩	১৭.৮৯	২১.৭৭

২০২০

ব্রয়লারের আলোক ব্যবস্থাপনা :

ব্রয়লার বাচ্চাকে অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সার্বক্ষণিক আলো প্রদান করা প্রয়োজন। একদিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত মুরগির বাচ্চার জন্য আলোক সময় কাল ও আলোর তীব্রতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ । এ সময়ে বাচ্চা আলোর সাহায্যে পানি ও খাদ্য চিনতে পারে । সুনির্দিষ্ট আলোক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্রয়লারের খাদ্য রূপান্তরের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব ।

- ১ম সপ্তাহে ২৪ ঘন্টা এবং ২য় সপ্তাহ থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত ২৩ ঘন্টা আলো ও ১ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন ।
- কৃত্রিম আলোর উৎস প্রধানত বৈদ্যুতিক বাল্ব, তবে বিকল্প হিসেবে কেরোসিন বাতি ব্যবহার করা যায়।
- দিনের আলোর সাথে কৃত্রিম আলো সংযোজন করে মুরগির জন্য নির্ধারিত আলোক দৈর্ঘ্য স্থিতিশীল রাখতে হয় ।
- প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে ।
- তার বা কর্ডের সাহায্যে বাল্ব ঝুলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বাতাসে বাল্ব দুলতে থাকলে ঘরে বা খাঁচায় ভৌতিক ভাব সৃষ্টি হয়।
- প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতি ১০ ফুট দূরত্বে একটি বাল্ব থাকবে।
- প্রথম থেকেই প্রতি রাতে আধা ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচয় করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হলে বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে পাইলিং (চাপাচাপি) করে মারা যেতে পারে। তাই যে এলাকায় বিদ্যুতের সুবিধা নেই সেখানে ব্রয়লার পালন কষ্টকর হবে।
- আবার বিদ্যুৎ চলে গেলে আলো দেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা, যেমন : চার্জার লাইট, হ্যাজাক লাইট, ছোট জেনারেটর, আইপিএস ইত্যাদি রাখতে হবে।
- বাল্বের সাথে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।
- রিফ্লেক্টর ১০" -১২" ব্যাসের হওয়া উচিত।
- ২ সপ্তাহে একবার বাল্ব পরিষ্কার করলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ১১.৬ : একটি আধুনিক ব্রয়লার খামারে আলোক ব্যবস্থাপনা

১০১ **১১.৬ ব্রয়লার মুরগির আলোক কর্মসূচি :**

ব্রয়লারের ক্ষেত্রে যেখানে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সমস্যা আছে সেখানে নিম্নলিখিত কর্মসূচি অনুযায়ী আলোক প্রদান

করা যেতে পারে। তবে ১ম সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা এবং ২য় সপ্তাহ থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত ২৩ ঘণ্টা আলো ও ১ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখা কর্মসূচিই উত্তম। এতে অন্ধকারে থেকে মুরগির গাদাগাদি করে মারা যাওয়া আশঙ্কা থাকে না।

বয়স (দিন)	দৈনিক আলোর সময় (ঘণ্টা)		ওয়াট বাল্ব (বর্গ মিটার প্রতি)
	আবদ্ধ ঘর	খোলামেলা ঘর	
১-৩	২৪	২৪	৫.৫
৪-৭	২৩	২৩	৫.০
৮-১৪	২০	২০	৪.০
১৫-২১	১৬	১৬	৩.০
২২-২৮	১৪	রাতে অন্ধকার	৩.০
২৯-৩৫	১২	রাতে অন্ধকার	২.০
৩৬-৪২	১২	রাতে অন্ধকার	১.০
৪২ এর উপরে	১২	রাতে অন্ধকার	১.০

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রুডিং কাকে বলে?
২. বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা কত?
৩. প্রাপ্তবয়স্ক মুরগির শরীরের তাপমাত্রা কত?
৪. ব্রুডার কাকে বলে?
৫. ব্রুডারে তাপের উৎসগুলো কী কী?
৬. বাচ্চার ১ম সপ্তাহে ব্রুডিং তাপমাত্রা কত?
৭. ব্রুডারের তাপমাত্রা নিরূপণের জন্য থার্মোমিটার কোথায় ঝুলাতে হয়?
৮. বাচ্চার জন্য কাম্য তাপমাত্রা কাকে বলে?
৯. বাচ্চা আনার পর পরই পানিতে কী পরিমাণ গ্লুকোজ মিশিয়ে খাওয়াতে হয়?
১০. ভিটামিন মিশিত্র পানি পান করার কত ঘণ্টা পরে বাচ্চার জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হয়?
১৪. পানি বিশুদ্ধকরণে কত মাত্রায় পানিতে ক্লোরিন মেশাতে হয়?
১৫. ব্রয়লারকে ১ম সপ্তাহে দিনে কত ঘণ্টা আলো দেওয়া হয়?
১৬. ব্রয়লারের ঘরে কত ফুট দূরত্বে বাল্ব ঝুলাতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তাপমাত্রা বেশি হলে প্রতিকারে করণীয় কী?
২. তাপমাত্রা কম হলে প্রতিকারে করণীয় কী?
৩. ভিটামিন মিশ্রিত পানি পানের গুরুত্ব কী?
৪. ব্রয়লার মুরগির আলোক কর্মসূচি লেখ।
৫. ব্রয়লারের দৈহিক ওজন ও খাদ্য গ্রহণ পরিমান লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রুডারে বাচ্চার আচরণ দেখে সঠিক তাপমাত্রা নির্ধারণ করার কৌশল আলোচনা কর।
২. ব্রুডিংকালীন সময়ে বাচ্চার জন্য খাদ্য, পানি ও আলোক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রয়লারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

১২.১ মুরগির খাদ্য :

যে সমস্ত আহার্য দ্রব্য মুরগির শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, উৎপাদন, প্রজনন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে তাকে খাদ্য বলা হয়। একটি মুরগির খামারে মোট খরচের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগই খাদ্য বাবদ খরচ হয়।

সুষম খাদ্য :

মুরগির দেহের নির্বাহী কার্য পরিচালনা, শারীরিক বৃদ্ধি, উৎপাদন, পালক গঠন ও দেহের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

হাঁস-মুরগির খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

১. শর্করা বা কার্বহাইড্রেট
২. আমিষ বা প্রোটিন
৩. চর্বি বা স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
৪. ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
৫. খনিজ পদার্থ বা মিনারাল ও
৬. পানি

শর্করা বা শ্বেতসারের কাজ :

- দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।
- দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও ডিম উৎপাদনের জন্য শক্তি সরবরাহ করে।
- দেহকে কর্মক্ষম রাখে।
- নির্বাহী কার্য পরিচালনা করে।
- চর্বি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

আমিষ বা প্রোটিনের কাজ :

মুরগির দেহ গঠন ও ডিম উৎপাদনে আমিষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুরগির দেহে আমিষ উপাদান ২২টি অ্যামাইনো অ্যাসিডে বিশ্লেষিত হয়। এর মধ্যে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড মুরগির দেহে উৎপন্ন হতে পারে না, এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড হিসেবে বিবেচিত করা হয়। খাদ্যে এদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অতিরিক্তভাবে কৃত্রিমভাবে তৈরি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযোজন করতে হয়।

ক্রমিক নং	অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড
১	লাইসিন
২	মিথিওনাইন
৩	সিসটিন
৪	ট্রিপটোফেন
৫	হিস্টিডিন

৬	লিউসিন
৭	আইসোলিউসিন
৮	ফিনাইল এলানিন
৯	টাইরোসিন
১০	ভ্যালিন
১১	থ্রিওনিন

প্রোটিনের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- দেহের কাঠামো গঠন করে।
- দেহের বৃদ্ধি ও পেশীর ক্ষয়পূরণ করে।
- তাপ ও শক্তি উৎপাদন এবং ডিম গঠন করে।
- পালক ও রক্ত গঠন করে।
- বীর্য উৎপাদন করে।
- গ্রন্থি নিঃসৃত রস উৎপাদন করে।

চর্বি বা স্নেহ পদার্থের কাজ :

চর্বি সরাসরি অথবা শর্করা ও আমিষ হতে রূপান্তরিত হওয়ার পর পাওয়া যায়, যা শক্তির আধার হিসাবে শরীরে জমা থাকে।

- তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে।
- দেহে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- হাড়ের সন্ধিতে মসৃণতা রক্ষা করে।
- দেহের লাবণ্যতার রক্ষা করে।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ব্যবহারে সাহায্য করে।
- চর্বি থেকে আমিষ ও শর্করা অপেক্ষা ২.২৫ গুণ বেশি শক্তি পাওয়া যায়।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের কাজ :

ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা

(ক) চর্বিতে দ্রবণীয় : ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, এবং ভিটামিন কে ।

(খ) পানিতে দ্রবণীয় : ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি ।

ভিটামিন এর কাজগুলো নিম্নরূপ-

- দেহের বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ডিমের উৎপাদন ও উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।
- উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখে।

খনিজ পদার্থ বা মিনারেলের কাজ

প্রায়োজনের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

১. মুখ্য প্রয়োজনীয় : ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। ২০২০

২. গৌণ প্রয়োজনীয় : আয়রন, কপার, কোবাল্ট, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম ইত্যাদি।

খনিজের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- শরীরের কাঠামো গঠন করে।
- হাড় ও ডিমের খোসা তৈরিতে সাহায্য করে।
- পালক ও ব্লাড সেল গঠন করে।
- গ্রন্থি নি:সৃত রস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- হজম কাজে সাহায্য করে।

পানির কাজ :

- খাদ্য পরিপাক, পাচন ও পুষ্টি পরিবহন করে।
- বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ও শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- পানি মূলত দেহাভ্যন্তরে একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

১২.৩ ব্রয়লারে জন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ

ব্রয়লারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। যে উপকরণের মধ্যে যে উপাদান বেশি মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাকে সেই উপাদানযুক্ত খাদ্য বলে।

পুষ্টি উপাদানের অধিক্যের ভিত্তিতে খাদ্য উপকরণকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. শর্করা জাতীয় উপকরণ
২. আমিষ জাতীয় উপকরণ
৩. চর্বি বা তৈল জাতীয় উপকরণ
৪. খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণ
৫. ভিটামিন জাতীয় উপকরণ

র্শকরা জাতীয় উপকরণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যেমন-

(ক) দানা জাতীয় খাদ্য
(খ) আঁশ জাতীয় খাদ্য

দানা জাতীয় খাদ্য	আঁশ জাতীয় খাদ্য
ভুট্টা, গম, চাল, কাউন, চালের খুদ, সরগম ও যব	চালের মিহি কুঁড়া, গমের ভুসি, বিভিন্ন শাকসবজি

আমিষ জাতীয় উপকরণ দুইভাবে বিভক্ত, যেমন–

(ক) প্রাণিজ আমিষ খাদ্য
(খ) উদ্ভিজ্জ আমিষ খাদ্য

প্রাণিজ আমিষ খাদ্য	উদ্ভিজ্জ আমিষ খাদ্য
বিভিন্ন মাছের শুঁটকি, মৎস্য উপজাত, চিংড়ি মাছ ও তার উপজাত-পশুর নাড়িভুঁড়ি ও হাড়ের গুঁড়া-প্রোটিন কনসেনট্রেট, রক্তের গুঁড়া, হাঁস-মুরগির উপজাত, হ্যাচারি উপজাত, ঝিনুক ও শামুকের মাংস, কেঁচো মিল, ননীযুক্ত গুঁড়া দুধ।	সয়াবিন খৈল, তিল খৈল, নারিকেল খৈল, তিসি খৈল, তুলা বীজের খৈল।

চর্বি জাতীয় উপকরণ		খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণ :	
১ সয়াবিন মিল	৫ হাঁস-মুরগির তেল	১ ঝিনুক খোসা চূর্ণ	৬ শামুক খোসার চূর্ণ
২ তিল কেক	৬ গবাদিপশুর চর্বি (তাল্লু)	২ বোন মিল	৭ ডিমের খোসা চূর্ণ
৩ নাকেল মিল	৭ মাছের তেল	৩ ফিশ মিল	৮ ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)
৪ সূর্যমুখী তেল		৪ চুনা পাথর	৯ ক্যালসিয়াম কার্বনেট
		৫ সাধারণ লবণ	১০ ম্যাঙ্গানিজ লবণ

ভিটামিন জাতীয় উপকরণ :

শাকসবজি, মাছের তেল, অংকুরিত গম ও ছোলা, হলুদ ভুট্টা, সবুজ ঘাস, চালের মিহি কুঁড়া ইত্যাদিতে কমবেশি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন থাকে। তারপরও খাদ্যের সাথে কৃত্রিম ভিটামিন প্রিমিক্স হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের পুষ্টি উপাদান মাত্রা :

ক্রঃ নং	খাদ্য উপকরণের নাম	বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালোরি/ কেজি)	আমিষ (ক্রুড ফ্যাট) %	চর্বি বা (ক্রুড ফ্যাট) %	খনিজ পদার্থ %	আঁশ (ক্রুড ফাইবার) %	মিথাইওনিন %	লাইসিন %	সিসটিন %	ক্যালসিয়াম %	ফসফরাস %
১	গম	৩১০০	১০.৫	১.৯	১.৪০	২.৪	০.২	০.৩৮	০.২২	০.০৪	০.৩৯
২	ভুট্টা	৩৪০০	৮.৫	৪.০	১.১	২,০	০.১৯	০.২১	০.১৬	০.০২	০.২৭
৩	চালের খুদা	৩০০০	৮.০	৩.৮	-	০.৭০	০.১৯	০.২০	০.১০	০.০৩	০.৩৩
৪	জোয়ার	৩৩০০	১০.৫	৩,০	১.২	২.৫	০.১৩	০.২	০.১৫	০.০৪	০.৩২
৫	ঝোলাগুড়	১৯৬০	৩.০	০.১	১.৫					০.৯	০.১
৬	গমের ভুসি	১১০০-১৩০০	১৩-১৫	০.১৭	১.৫	১০	০.১৭	০.৫	০.২	০.১১	১,২১
৭	চালের মিহি কুড়া	২৯৫০	১২	১২	০৮	১০	০.৩১	০.৫৯	০.৩৭	০.১৪	১.৪৯
৮	সয়াবিন মিল	২২৪৪	৪৪	০.৫	০৬	৫.২	০.৬৩	২.৮২	০.৬৭	০.৩	০.৬
৯	নারকেল খৈল	১৩৫০	২৫	৮.৫	০৭	১২	০.৩	০.৬	০.৬১	০.২	০২
১০	সরিসা খৈল	২০০০-২২০০	৩৫.৮	১২.৭	১০.৭	০৯	০.৯২	১.৬৭	-	০.৮৩	০.২১
১১	তিলের খৈল	২৪৬৪	৩১	০৭	৫.৫	৬.৫	১.৪	১.৩	০.৫৭	২	০.১৩
১২	শুঁটকি গুঁড়া	২৬৫০	৪০-৫৫	১	৪২	০.৪	২.৭	১.৮	০.৮	৩.৮	২.৫
১৩	প্রোটিন কনসেনট্রেট	২৭০০-২৮০০	৫৫-৬০	০৮	-	০.৫	-	-	-	৩	২.৩
১৪	শুকনা রক্ত	২৭৫০	৭৫-৮৩	১.৬	২৩	-	০.৯	৬.৯	১.৪	০.২৮	০.২২
১৫	পোল্ট্রি নাড়িভুড়ি সিদ্ধ	২৯০০	৫৮	১৩.৫	২০	-	১.১	২.৬	-	৩.৬	২.২
১৬	ফেদার মিল	২৩০০	৮০	২.৫	১০.৫	০১	০.৫	১.৫	০৩	০.২	০.৬
১৭	মাছের তেল	৭৬৭৮	৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	হাড়ের গুঁড়া	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪	১২
১৯	ঝিনুক	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৭	-
২০	চুনাপাথর	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৩	-

১২.৪ সুষম খাদ্য তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

১. খাদ্যসামগ্রী বা উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা :
সুষম খাবার তৈরিতে পরিচিত ও সহজলভ্য উপকরণ নির্বাচন করা উচিত। পরিচিত উপকরণের গুণগতমান সহজে জানা যায়। স্থানীয় মূল্য যাচাই করা যায়। কোনো উপকরণের ঘাটতি পড়লে সহজে সংগ্রহ করা যায়। সহজলভ্য উপকরণের পরিবহন খরচ কম হয়। সহজলভ্য উপকরণের পরিবহন খরচ কম হয়। বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও মজুদ করা যায়।

২. খাদ্যের গুণগতমান :
প্রস্তুত খাদ্য অবশ্যই গুণগতমানের হওয়া উচিত, খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বে প্রতি উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) পরীক্ষা করতে হয়। কোনো প্রকার পচা, ছত্রাকযুক্ত, পোকাযুক্ত অথবা গন্ধযুক্ত খাবার ব্যবহার করা যাবে না। খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহে যেন কোনো অবস্থাতেই চাকা লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

যে সমস্ত কারণে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়, তা হলো–

- সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে
- উপকরণে আর্দ্রতা (১২% এর উপরে হলে) বেশি থাকলে
- বেশি পুরোনো হলে
- সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত না করার ফলে
- পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণে
- ঘরের মেঝে ভিজা ও আর্দ্র থাকলে
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকলে
- খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় কীটনাশক ব্যবহার করলে
- ভেজাল থাকলে
- ছত্রাক ও মোল্ডযুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করলে

৩. উপকরণের মূল্য :

খাদ্য উপকরণ যত সস্তায় সংগ্রহ করা যায়, খাদ্য প্রস্তুতে খরচের তত সাশ্রয় হয়। ফলে মাংস ও ডিম উৎপাদনে খরচ কমে যায়। খামারে মোট খাদ্য খরচের ৬৫-৭৫ ভাগ পর্যন্ত খরচ হয় খাদ্যের জন্য। মানুষের খাদ্য উপকরণের সাথে প্রতিযোগিতা কমাতে যথদূর সম্ভব সস্তায় বিকল্প খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা উচিত।

৪. খাদ্যের পরিপাচ্যতা ও সুস্বাদুতা :
রুচিসম্মত খাদ্য না হলে মুরগি খায় না। দানা জাতীয় খাদ্য বেশি মিহি হলে মুরগি কম খায়। কোনো উপকরণের দানা বড় থাকলে মুরগি বেছে বড় দানা আগে খায়, ফলে অন্যান্য উপাদান তলে পড়ে থাকে। বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। উপকরণের মিশ্রণ সুষম হতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের দানা যতদূর সম্ভব সুষম হতে হবে। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত থাকলে এবং খাদ্য পচা ও ছত্রাকযুক্ত হলে মুরগি খাদ্য পছন্দ করবে না। ক্রাম্বল ও পিলেট খাদ্য মুরগি বেশি পছন্দ করে।

৫. জাত :
হালকা জাতের ব্রয়লারের জন্য ২ প্রকার মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় ২ ধাপে। ভারী জাতের ব্রয়লারের জন্য ৩ ধাপে ৩ প্রকারের খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

৬. বয়স :
বয়স অনুসারে বিভিন্ন পুষ্টিমানের খাদ্য ব্যবহার করা হয়। ব্রয়লারের দেহে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপাকীয় শক্তির হার বৃদ্ধি করা হয়।

৭. লিঙ্গ :
পুরুষ ব্রয়লার স্ত্রী ব্রয়লারের তুলনায় ২০-২৫% বেশি খাদ্য খায়, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত খাদ্যকে মাংসে রূপান্তর করতে পারে।

৮. ওজন :
ব্রয়লারের ওজন বৃদ্ধি সমানুপাতে না হলে খাদ্যে আমিষের হার বৃদ্ধি করতে হয়। দেহে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে চর্বি জাতীয় উপাদানের ব্যবহারের হার পুনঃবিন্যাস করতে হয়।

৯. আবহাওয়া :
পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফলে শরীরের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যে পুষ্টিমান পুনঃবিন্যাস করতে হয়।

১০. বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার পরিমাণ বা মাত্রা :

উপাদান	সর্বোচ্চ ব্যবহার মাত্রা (%)
ভুট্টা	৬০
গম	৫০
চালের কুঁড়া	১৫-২০
গমের ভুসি	১০
সয়াবিন মিল	৪০
তিলের খৈল	১০
সরিষার খৈল	৫
সূর্যমুখী খৈল	২০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১০
রক্তের গুঁড়া	৩
পোল্ট্রির উপজাত	৫
লবণ	০.৩-০.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	১-২
ঝিনুক	১-৩
লাইম স্টোন	১-৩
অ্যান্টিবায়োটিক	০.১-০.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	উৎপাদনকারীর পরামর্শ মতো

১২.৬ ব্রয়লারের বিভিন্ন পর্বের সুষম খাদ্য

ব্রয়লারকে ২ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রদান করা হয়, যথা–

(ক) ২ ধাপে খাদ্য প্রদান : সাধারণত হালকা জাতের ব্রয়লারকে এই পদ্ধতিতে খাদ্য প্রদান করা হয়।

(খ) ৩ ধাপে খাদ্য প্রদান : ভারী জাতের ব্রয়লারকে তর এই পদ্ধতিতে খাদ্য প্রদান করা হয়। ২০২০

ব্রয়লারের প্রচলিত খাদ্য পদ্ধতি :

খাদ্যের নাম	প্রচলিত খাদ্য পরিকল্পনা	
	২য় ধাপ পরিকল্পনা	৩ ধাপ পরিকল্পনা
স্টার্টার রেশন	১ দিন থেকে ২১ দিন	১ দিন থেকে ১৪ দিন
গ্রোয়ার রেশন	-	১৫ দিন থেকে ৩৮ দিন
ফিনিশার রেশন	২২ দিন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত	৩৯ দিন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত

তবে বর্তমানে ২ ধাপে খাদ্য প্রদান পদ্ধতি বেশি প্রচলিত।

ব্রয়লারে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা :

পুষ্টি উপাদান	স্টার্টার (১-৩ সপ্তাহ)	ফিনিশার (৪-৭ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি খাদ্য)	২৯০০	৩০০০
ক্রুড প্রোটিন (%)	২২-২৩	১৯
ক্যালসিয়াম (%)	১.০০	১.০০
ফসফরাস (%)	০.৪৫	০.৪৫
লাইসিন (%)	০.৮৬	০.৮৬
মিথিওনিন (%)	০.৪৩	০.৪৫

ব্রয়লারের নমুনা রেশন :

পুষ্টি উপাদান কেজিতে)	স্টার্টার (০২-৩ সপ্তাহ)	ফিনিশার (৪-৭ সপ্তাহ)
ভুট্টা	৪২	৪৭
গম	১৩	১২
চালের কুঁড়া (অটো)	১৩	১৫
সয়াবিন মিল	২২	১৮
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮	৬
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.২৫	১.২৫
লবণ	০.৩০	০.৩০
লাইসিন	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫
প্রাপ্ত পুষ্টি		
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	২৯১৮	২৯৯৬
ক্রুড প্রোটিন (%)	২১.১৩	১৯.১০
ক্যালসিয়াম (%)	১.২৩	০.৯৭
ফসফরাস(%)	০.৮৩	০.৬৬
লাইসিন(%)	১.০০	০.৮৫
মিথিওনিন(%)	০.৪৪	০.৩৬

২০২০

ব্রয়লার স্টার্টার রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. ভুট্টা ভাঙা	২৬	২৬x৩৩৭০=৮৭৬২০	২৬x৯/১০০=২.৩৪	২৬x০.০২/১০০=০.০০৫২	২৬x০.১০/১০০=০.০২৬০
২. গম ভাঙা	২৬	৮৪৫০০	৩.১২	০.০১০৪	০.০৩৩৮
৩.চালের কুঁড়া	১৭	৪৮৬২০	২.০৪	০.০০৬৮	০.০২৭২
৪.শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৩	৩৪৩২০	৭.১৫	০.৫২	০.৩৬৮
৫.তিলের খৈল	১৩	২৪৮৩০	৪.৫৫	০.২৬	০.০৩৯
৬. ঝিনুক চূর্ণ	০১	-	-	০.৩৭	-
৭. হাড়ের গুঁড়া	০.৫	-	-	-	-
৮. লবণ	০.৫	-	-	-	-
৯. রক্তের গুঁড়া	৩	৮২৫০	২.৪	০.০০৯	০.০০৭৫
মোট	১০০	২৮৮১৪০	২১.৬০	১.১৮১৪	০.৪৯৭৫
এম্ভাভিট	০.২৫				
তৈরিকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৮৮১৪০ কিলোক্যালোরি/কেজি	২১.৬০%	১.১৮১৪%	০.৪৯৭৫%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা		২৯০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	২২%	১%	০.৫%

ব্রয়লার ফিনিসার মোরগ-মুরগির রেশন তৈরি হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. ভুট্টা ভাঙা	২৬	৮৭৬২০	২.৩৪	০.০০৫২	০.০২৬
২. গম ভাঙা	২৬	৮৪৫০০	৩.১২	০.০১০৪	০.০৩৩৮
৩. চালের কুঁড়া	১৭	৪৮৬২০	২.০৪	০.০০৬৮	০.০২৭২
৪. শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৪	৩৬৯৬০	৭.০	০.৫৬০	০.৩৯২০
৫. তিলের খৈল	১৩	২৪৮৩০	৪.৫৫	০.২৬	০.০৩৯০
৬. ঝিনুক চূর্ণ	১	-	-	০.৩৭	-
৭. হাড়ের গুঁড়া	০.৫	-	-	০.১২	০.০৬
৮. লবণ	০,৫	-	-	-	-
৯. রক্তের গুঁড়া	২	১৭৬০০	-	-	-
মোট	১০০	৩০০১৩০	১৯,০৫	১.৩৩২৪	০.৫৭৮
এম্ভাভিট	০.২৫				
তৈরি রেশনের পুষ্টিমান	-	৩০০১.৩ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৯.০৫%	১.৩৩২৪%	০.৫৭৮%
রেশনের পুষ্টিউপাদানের চাহিদা		৩০০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৯%	১%	০.৫%

২০২০

ব্রয়লারের সুষম খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ কৌশল

ব্রয়লারের সুষম খাদ্য তৈরির ধাপ :

- প্রথমে ঘরের মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- যে সকল খাদ্য উপাদান অধিক পরিমাণে লাগে যেমন- ভুট্টা, গম, কুঁড়া, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট সেগুলো ওজন করতে হবে ও মেঝেতে ঢালতে হবে।
- খাদ্য উপাদান প্রতিটি ঢালার পর হাত দিয়ে সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- পরিমাণে কম লাগে এমন উপাদান (ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, লবণ, খনিজ মিশ্রণ) ওজন করে এক সঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- এ মিশ্রণকে পূর্বের খাদ্য উপাদানের স্তূপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- এর পর হাত দিয়ে বা মেশিনের সাহায্যে ৩-৪ বার খাদ্য ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- সমস্ত মিশ্রণেকে বস্তায় ভরে মজুদ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।
- এ ধরনের মিশ্রিত গুঁড়া খাদ্যকে ম্যাশ খাদ্য বলে।

মুরগির জন্য ৩ প্রকৃতির খাদ্য ব্যবহার করা হয়, যথা–

ম্যাশ খাদ্য :

সমস্ত উপকরণ একত্রে মিশানোকে ম্যাশ খাদ্য বলে। হাতে মিশ্রণ করলে প্রথমে পরিমাণে অল্প উপকরণসমূহ একত্রে মিশাতে হয়। ক্রমান্বয়ে বেশি উপকরণের সাথে একত্র করতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে মিশালে সুষম হয়।

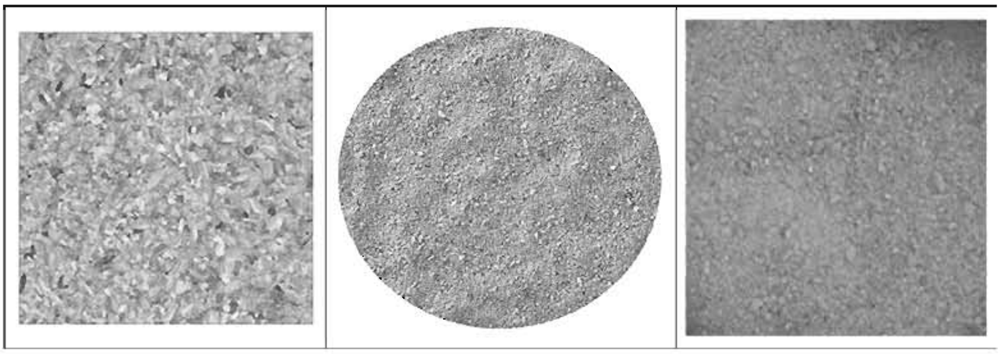

চিত্র : ১২.১ ম্যাশ খাদ্য

পিলেট

খাদ্যকে লোহার জালিযুক্ত ছাকনির মধ্য দিয়ে যন্ত্রের সাহায্য চাপ প্রয়োগ করলে পিলেট তৈরি হয়। পিলেট ব্যহার করলে খাদ্যের অপচয় কমে ও মুরগি বেশি পছন্দ করে। ব্রয়লারের জন্য এ খাদ্য বেশি ব্যবহার হয়।

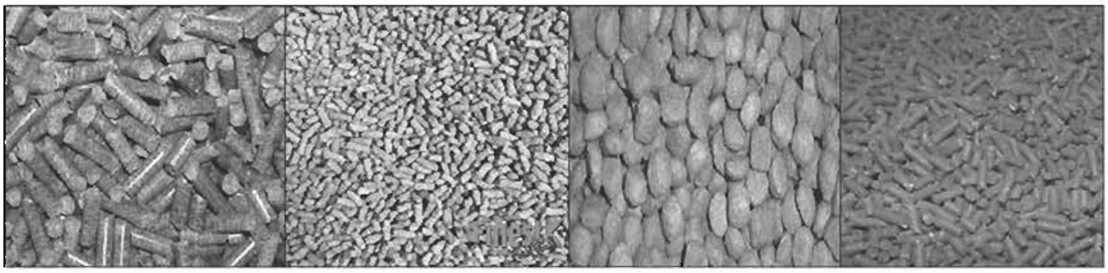

চিত্র :১২.২ মুরগির বিভিন্ন ধরনের পিলেট খাদ্য

ক্রাম্বল খাদ্য :

ম্যাশ খাদ্যের অন্য প্রকৃতি ক্রাম্বল খাদ্য। ক্রাম্বল খাদ্যের দানা পিলেট দানার চেয়ে ছোট। এ খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যের অপচয় কম হয়। পিলেটের মতোই যন্ত্রের সাহায্যে ক্রাম্বল খাদ্য তৈরি করা হয়। ব্রয়লারের স্টার্টার রেশন হিসাবে এই খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

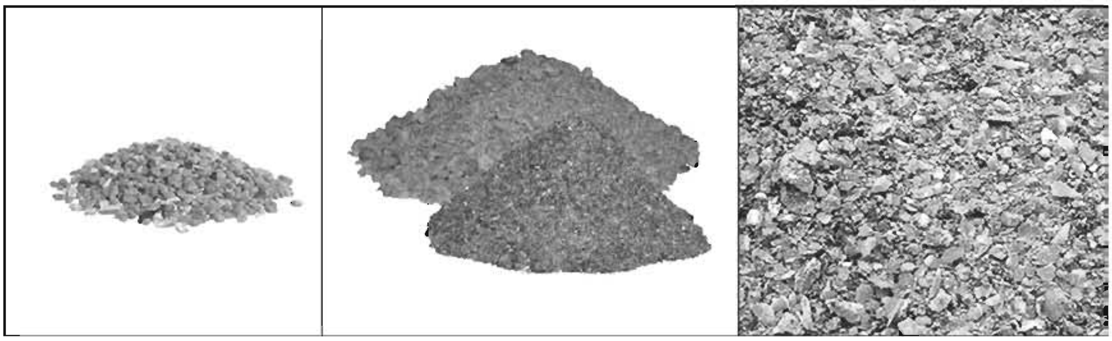

চিত্র : ১২.৩ ক্রাম্বল খাদ্য

খাদ্য সরবরাহ :

- ব্রয়লারের খাবার পাত্রে সবসময় খাদ্য রাখতে হবে।
- ব্রয়লার স্বাধীনভাবে খাদ্য খাবে।
- গরমের দিনে খাদ্যকে ২৫:২৫:৫০ অনুপাতে সকাল, দুপুর ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে।
- শীতের দিনে ২০:৫০:৩০ অনুপাতে সকাল, দুপুর ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে।

১২.৭ ব্রয়লারের খাদ্য পাত্রের ধরন ও সংখ্যা :

খাদ্য পাত্র	বিবরণ	০-২ সপ্তাহ	৩-৮ সপ্তাহ
চিক ফিডার	দৈর্ঘ্য = ২ ফুট প্রস্থ = ১-৩ ইঞ্চি	৭-৮ টি/৫০০ বাচ্চা	-
খাবার পাত্র	গোলাকার ফিডার	১০ টি/৫০০ বাচ্চা	২০ টি/৫০০
	ট্রাফ ফিডার	বাচ্চা ও বাড়ন্ত বাচ্চা প্রতি স্থান ২-২.৫ ইঞ্চি	

২০২০

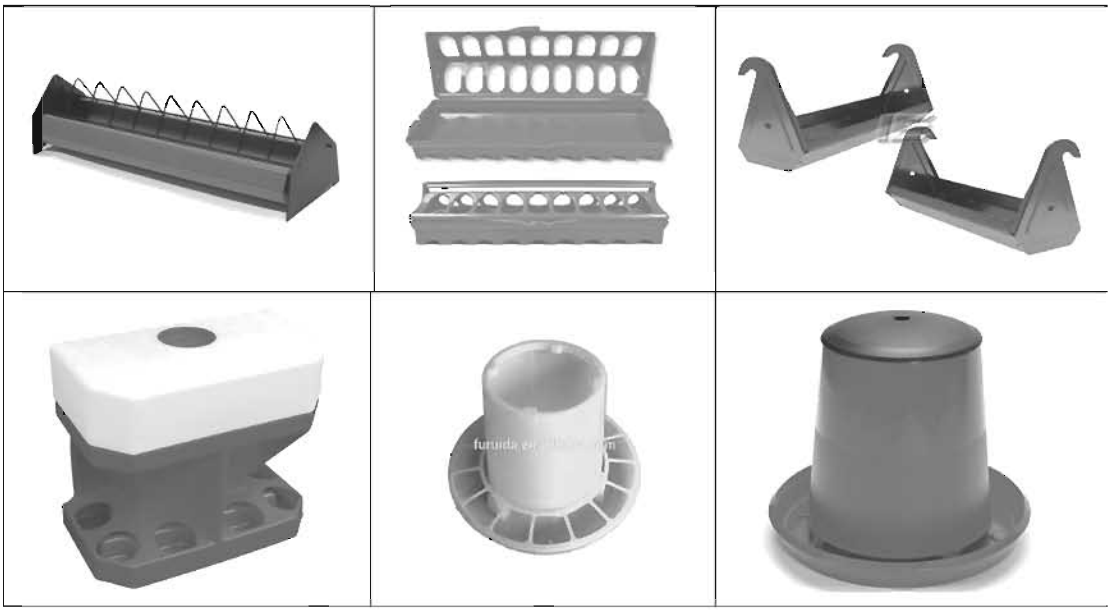

চিত্র :১২.৪ ব্রয়লারের বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পাত্র

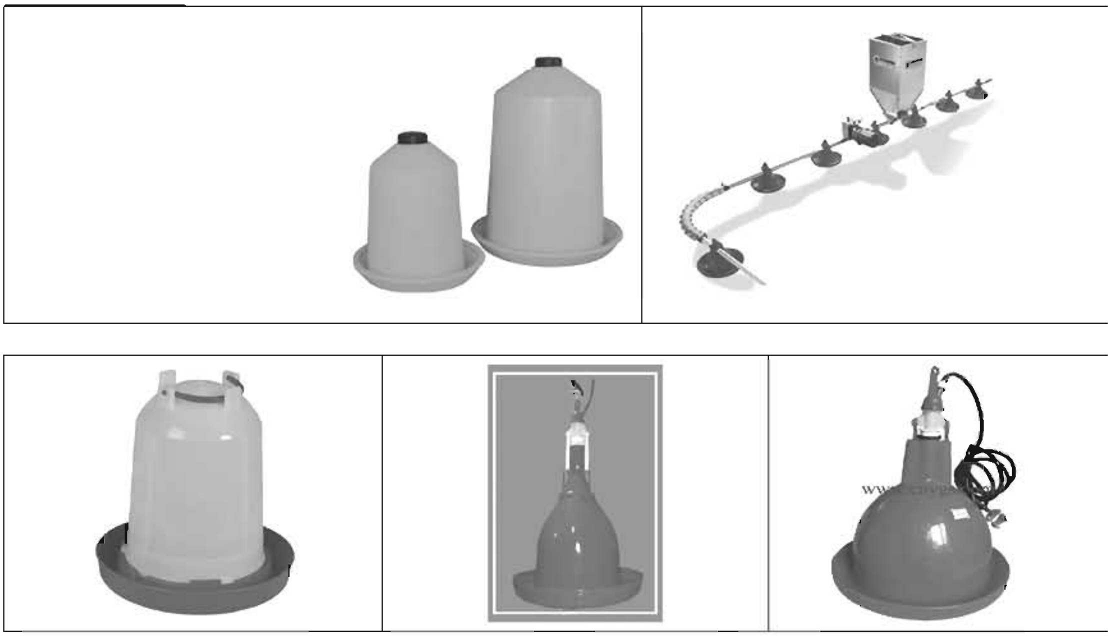

চিত্র :১২.৪ ব্রয়লারের বিভিন্ন ধরনের পানি পাত্র

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাদ্য কী?
২. মুরগির খামারে মোট খরচের শতকরা কত ভাগ খাদ্য খরচ?
৩. মুরগির খাদ্য উপাদান কয়টি ও কী কী?
৪. প্রয়োজনের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থ কত প্রকার ও কী কী?
৫. অতীব প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের নামগুলো বলুন।
৬. ব্রয়লারে খাদ্য উপকরণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
৭. আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণ কয়ভাগে বিভক্ত?
৮. প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণগুলোর নাম কী কী?
৯. উদ্ভিদ আমিষ জাতীয় খাদ্য উপকরণগুলোর নাম কী কী?
১০. ভিটামিন জাতীয় উপকরণগুলি নাম কী কী?
১১. সুষম খাদ্য কাকে বলে?
১২. ব্রয়লার বিক্রির কতদিন পূর্ব থেকে ঔষুধ খাওয়ানো বন্ধ করতে হয়?
১৩. স্টার্স্টার রেশনে শক্তি, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কত?
১৪. ফিনিশ রেশনে শক্তি, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কত?
১৫. ব্রয়লারের সুষম খাদ্য মিশ্রণ তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
১৬. ব্রয়লারকে দৈনিক কয়বার ও কী অনুপাতে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শর্করা-এর কাজ কী?
২. আমিষের কাজ কী?
৩. চর্বির কাজ কী?
৪. ভিটামিনের কাজ কী?
৫. খনিজ পদার্থের কাজ কী?
৬. শর্করা জাতীয় উপাদান কয় ভাগ? উদাহরণ সহ লেখ।
৭. খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার কারণ কী?
৮. ব্রয়ারকে কয়টি পদ্ধতিতে খাদ্য প্রদান করা হয়?
৯. ব্রয়লারের খাদ্য পাত্রে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ কত?
১০. ব্রয়লারের স্টার্টার ও ফিনিশার রেশনের পুষ্টির মাত্রা বর্ণনা কর।
১১. ব্রয়লারের জন্য খাদ্যপাত্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।
১২. আবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোর নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
২. খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার সর্বোচ্চ মাত্রা বর্ণনা কর।
৩. ব্রয়লারের স্টার্টার রেশন ও ফিনিশার রেশন তৈরি কর।

২০২০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রয়লারের বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনা

১৩.১ পানির উৎস ও গুণগতমান

ব্রয়লারের সুস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক পানিবাহিত রোগের ও কৃমির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করলে। তাই খামারি যে পানি নিজে পান করেন ঠিক সে পানি পোল্ট্রিকে সরবরাহ করতে হবে। পানির উৎস ও গুণগতমান সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

- ব্রয়লার খাদ্য ছাড়া কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে।
- ব্রয়লার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পানি পান করতে পছন্দ করে। কিন্তু বাচ্চার প্রথমদিকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করা উচিত।
- সাধারণভাবে পানি গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের দ্বিগুণ হয়। তবে গরমের সময় ৩-৪ গুণ হয়।
- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ৩ ঘণ্টা পূর্বে পানি দিতে হয় ও ব্রুডার চালু করতে হয়। এতে পানি কিছুটা গরম হয়। বাচ্চার জন্য প্রথমপানি ঠাণ্ডা হওয়া উচিত নয়।
- বছরে ১-২ বার পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করানো ভালো।
- পানিতে অতিরিক্ত খনিজ দ্রব্য থাকলে পানির স্বাদ কমে যায়। ফলে ব্রয়লার পানি পান করা কমিয়ে দিতে পারে। তাই পানির খরতা পরীক্ষা করে খাওয়াতে হবে।
- ব্রয়লারের পানীয়জল ঠাণ্ডা, পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও লবণমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- দিনে ৪ বার পানি সরবরাহ করা উচিত।
- পানির পাত্র প্রতিদিন জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। না হলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করলেও তা পরিষ্কার থাকবে না।
- পানির পাত্রের উপর লোহার গ্রিল দিলে বাচ্চা পাত্রের উপর উঠতে পারে না বা মল ত্যাগ করে পানিকে দূষিত করতে পারে না।
- প্রতিদিন পুরাতন পানি বদলিয়ে নতুন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- পানি শোধনের জন্য ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়, যেমন- ব্লিচিং পাউডার, ১০০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে। অথবা যে কোনো পানি বিশোধক বড়ি মেশানো যেতে পারে।
- ভ্যাকসিন বা ঔষধ খাওয়ানোর সময় ক্লোরিন পানি ব্যবহার করা উচিত নয়।
- পানি গরম হলে তা ঘন ঘন পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- ডিপ টিউবয়েলের পানিতেও কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। তাই এই পানির মান পরীক্ষা করতে হবে। তবে টিউবয়েলের পানি সর্বোৎকৃষ্ট।
- পানিতে P^H কন্ট্রোলার ব্যবহার পানির P^H কমিয়ে ৫ এ আনা যায়। এতে পানিতে মেশানো ভিটামিন ও অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে।

১২.২ বয়স অনুযায়ী ব্রয়লারের পানির পাত্রের ধরন ও সংখ্যা :

পানির পাত্রের ধরন	০-২ সপ্তাহ বয়স	৩-৭ সপ্তাহ বয়স
চিক ড্রিংকার (ব্যাস=১.৪", পরিধি=৩' ২")	প্রয়োজনমতো	
ট্রাফ ড্রিংকার	১/২" প্রতি বাচ্চা প্রতি পাত্রে ১০০ বাচ্চা	১" প্রতি বাচ্চা প্রতি পাত্রে ৫০ বাচ্চা
বিল ড্রিংকার	১টি/১০০ বাচ্চা	১ টি/৫০-৭৫ বাচ্চা
নিপল ড্রিংকার	-	প্রতি নিপল/১২-১৫ বাচ্চা

চিত্র :১৩.১ চিক ড্রিংকার বিল ড্রিংকার নিপল ড্রিংকার

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সাধারণত পানি গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের কয় গুণ?
২. বাচ্চার প্রথমদিকের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড?
৩. পানিতে কখন ক্লোরিন মেশানো উচিত নয়?
৪. পানির পি-এইচ কমিয়ে সরবরাহ করলে কী সুবিধা পাওয়া যায়?
৫. সূর্যের ড্রিংকারে বাচ্চা প্রতি কত জায়গা প্রয়োজন?
৬. সরবরাহকৃত পানির উৎসের নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লারের বয়স অনুযায়ী পানি পাত্রের ধরন ও সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

রচনা মূলক প্রশ্ন

১. সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান সম্পর্কে আলোচনা কর।

২০২০

চতুর্দর্শ অধ্যায়

ব্রয়লারের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

মুরগির মৃত্যুর হার খুব বেশি এটা মুরগি পালনকারীর কাছে একটা বিরাট সমস্যা। মৃত্যুহার দেখে যে কোনো পালনকারীর নিরুৎসাহ বোধ করাই স্বাভাবিক। তবে সতর্ক দৃষ্টিও ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুহার কমানো যায়। মাত্র কয়েকটি রোগ ছাড়া অনেক রোগকে ভালো করা যায় না। তাই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা দরকার। রোগাক্রান্ত মুরগিকে সরিয়ে ফেলাই ভালো। কঠিন রোগ ভোগের পর মুরগি ভালো হয়ে গেলেও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কোনোদিনই ফিরে পায় না এবং ডিমপাড়ার হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। এছাড়া এদের মাধ্যমে ঝাঁকের অন্যান্য মুরগির মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

১৪.১ ব্রয়লারের রোগের শ্রেণি বিভাগ

রোগ : পর্যাপ্ত খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার পরও যদি শরীরের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তবে তাকে রোগ বলে।

ব্রয়লার মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণিবিভাগ করা যায় :

- সংক্রামক রোগ (Contagious Disease) ।
- পরজীবীঘটিত রোগ (Parasitic Disease)।
- অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutritious Disease)।

১. সংক্রামক রোগ (Contagious Disease)

যে সমস্ত রোগ জীবণুর মাধ্যমে অসুস্থ পাখি থেকে সুস্থ পাখিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে। এদেরকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যথা-

সংক্রামক রোগ

⇩

ভাইরাস জনিত	ব্যাকটেরিয়া জনিত	মাইকোপ্লাজমা জনিত	ছত্রাক জনিত	প্রটোজোয়া জনিত	অন্যান্য
রানীক্ষেত	সালমোনেলোসিস	মাইকোপ্লাজমোসিস	ব্রুডারনিউমোনিয়া	ককসিডিওসিস	অ্যাসাইটিস
গামবোরা	কলিবেসিলোসিস		আফলাটক্সিকোসিস		
এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা	ইনফেকশাস করাইজা				
	নেক্রেটিকএন্টারাইটি				
	ওম্ফ্যালাইটিস				

পরজীবীজনিত রোগ :

পরজীবী এক ধরনের জীব যা অন্য জীব দেহে বসবাস করে জীবন ধারণ করে। যে জীবের দেহের উপর এরা জীবন ধারণ করে তাদের হোস্ট বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বলে। আবার কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাহিরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতি সাধন করে। এদেরকে বহিঃদেহের পরজীবী বলে। উভয় পরজীবী আক্রমণের ফলে পোল্ট্রি শিল্প ব্যপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরা পাখির দেহে বসবাস করে পাখি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পাখি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী পাখির দেহে বসবাস করে রক্ত শুষে নেয়, ফলে আক্রান্ত পাখির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

পরজীবী দুই প্রকার :

১.অন্ত ঃ পরজীবী : কৃমি

২.বহি ঃ পরজীবী : উকুন, আটালী, মাইট

অপুষ্টিজনিত রোগ :

গৃহপালিত পাখি পালনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো পাখিকে সুষম খাদ্য প্রদান করা। পাখির মাংস ও ডিম উৎপাদন এবং দৈনিক বৃদ্ধিসাধনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে যে কোনো খাদ্য উপকরণের অভাব হলে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এমনকি পাখির মৃত্যুও হতে পারে।

অপুষ্টিজনিত রোগঃ জেরোপথ্যলামিয়া, প্যারালাইসিস, পেরোসিস,ক্যানাবলিজম, রিকেট ।

১৪.২ ব্রয়লারের সংক্রামক রোগ সমূহের নাম, কারন, সংক্রমন, লক্ষণ. চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

ভাইরাসজনিত রোগসমূহ :

রাণিক্ষেত রোগ

রাণিক্ষেত মুরগির ভাইরাসজনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কমবেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশের মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রানীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রানীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি আক্রন্তা হয়। সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়ায়, যেমন- শীত ও বসন্তকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়েও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে শনাক্ত করা হয়। তাই তাকে নিউক্যাসল ডিজিজ বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রাণিক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে এ রোগকে রানীক্ষেত রোগ বলা হয় ।

রোগের কারণ : প্যারামিক্সোভিরিডি পরিবারের নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস নামক এক প্রজাতির প্যারামিক্সোভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ -
নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-
বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।

- অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, হাঁচি-কাশি থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি আমদানির মাধ্যমে।
- মৃত মুরগি বা পাখি যেখানে সেখানে ফেললে।
- বন্য পশুপাখির মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ : রানীক্ষেত রাগের প্রধানত তিন প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা-

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ
খ. মেসোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ।
গ. লেন্টোজেনিক প্রকৃতি।

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ : এ প্রকৃতির রানীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্মক। এতে অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুত জীবাণু সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যেতে পারে। তবে তা না হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যেমন–

- প্রথমদিকে আক্রান্ত পাখি দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
- মাথায় কাঁপুনি হয়, ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করে।
- সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাকমুখ দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- শরীর শুকিয়ে যায়।
- মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখমুখ ফুলে যায়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়।

খ. মেসোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ:
মেসোজেনিক প্রকৃতিতে আক্রান্ত মুরগিতে রোগলক্ষণ ততটা তীব্র নয়। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়:

- ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখির কাশি হয় ও মুখ হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
- হলদে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে।
- জীবাণু আক্রমণের দুই সপ্তাহ পর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে মাথা ঘুরায় ও পা অবশ হয়ে যায়।
- মাথা একপাশে বেঁকে যেতে পারে, কখনো বা মাথা দুই পায়ের মাঝখানে চলে আসে অথবা সোজা ঘাড় বরাবর পিছন দিকে বেঁকে যেতে পারে।

গ. লেন্টোজেনিক প্রকৃতি : এতে মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা-

- শ্বাসতন্ত্র কম আক্রান্ত হওয়ায় এ তন্ত্রের লক্ষণ কম প্রকাশ পায়।
- সামান্য কাশি থাকে।
- কিছুটা ক্ষুধামান্দ্য ভাব থাকে।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

চিত্র : ১৪.১ রানীক্ষেত রোগের লক্ষণ

রোগ নির্ণয় :

ময়নাতদন্তে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখে

- শ্বাসনালীতে রক্তাধিক্য ও রক্ত সঞ্চায়ন।
- স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে রক্তাম্বু বা শৈষ্মিক নিঃশ্বাস
- প্লীহা বড় হয়ে যায়।
- খাদ্য অন্ত্রে, বিশেষ করে প্রভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে, রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত ।
- অন্ত্রের শেষভাগে পাতলা সাদাটে মল।

চিত্র:১৪.২ রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত

চিকিৎসা :

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত পাখিকে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইডজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ০.০১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত পাখিকে দৈনিক ২/৩ বার খাওয়ানো যেতে পারে।

২০২০

রোগ প্রতিরোধ :
রানীক্ষেত রোগ প্রতিরোধ দুই ধরনের টিকা ব্যবহার করা হয়। যথা- বি.সি.আর.ডি.ভি এবং আর. ডি. ভি।

বি.সি.আর.ডি.ভি : এ টিকা বীজের প্রতিটি শিশি বা ভায়ালে হিম শুষ্ক অবস্থায় ১ মি. লি. মূল টিকাবীজ থাকে। প্রতিটি শিশির টিকা বীজ ৬ মি.লি. পরিশ্রুত পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হয়। এরপর ৭ দিন ও ২১ দিন বয়সের প্রতিটি বাচ্চা মুরগির এক চোখে এক ফোঁটা করে ড্রপারের সাহায্য নিতে হবে।

আর. ডি. ভি : এ টিকাবীজের প্রতিটি ভায়ালে ০.৩ মি.লি. মূল টিকাবীজ হিম শুষ্ক অবস্থায় থাকে। এ টিকা দুমাসের অধিক বয়সের মুরগির জন্য উপযোগী। প্রথমে ভায়ালেরটিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তা থেকে ১ মি.লি. করে নিয়ে প্রতিটি মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। ছয় মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে। টিকা ছাড়া খামার থেকে রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা-

রানীক্ষেত রোগে মৃত পাখিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটিচাপা দিতে হবে।
খামারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন-আয়োসান, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায়) দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

গামবোরো রোগ

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রমণ রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এ রোগের পাখির রোগ প্রতিরোধক অঙ্গ অর্থাৎ বার্সা ফ্যাব্রিসিয়াস আক্রান্ত হয় বলে প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ রোগকে বার্ড এইডস বা পোল্ট্রি এইডসও বলা হয়। এই রোগটি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ডেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের গামবোরো জেলায় শনাক্ত করা হয় বলে একে গামবোরো রোগ বলে। কিন্তু এর মূল নাম ইনফেকশাস বার্সাইটিস বা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ। এ রোগে সাধারণত ২-৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্তের হার খুব বেশি (১০০% পর্যন্ত), তবে মৃত্যুহার খুব কম (৫-১৫%)। তবে কোনো কোনো সময় আক্রান্ত বাচ্চার ৫০% ও মারা যেতে পারে। এ রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

রোগের কারণ :
বিরনাভিরিডি পরিবারের অর্ন্তগত বিরনা ভাইরাসের সেরোটাইপ ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসের দুটো স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন- ক্ল্যাসিকাল ও ভেরিয়েন্ট স্ট্রেইন।

সংক্রমণ:
নিম্নলিখিতভাবে এ রোগটি সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

* একই ঘরে রাখা অসুস্থ বাচ্চার সংস্পর্শে সুস্থ বাচ্চা এলে।
* বাতাসের মাধ্যমে।
* কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি মাধ্যমে।
* খাদ্য, লিটার, পোকামাকড়ের মাধ্যমে।
* পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থীর জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে।

১০৪

গামবেরো রোগে আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

১) ক্ষুধামান্দা
২) পালক উশকোখুশকো হয়ে যায়।
৩) শ্লেষ্মাযুক্ত মল ত্যাগ করে, মলে রক্ত থাকতে পারে। এ মল মলদ্বারের চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে।
৪) প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পরে তা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে আসে।
৫) পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।
৬) পাখি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে যায়।
৭) শরীরের সতেজতা নষ্ট হয়।
৮) তীব্র রোগে পাখির শরীরে কাঁপুনি হয় ও অবশেষে মারা যায়।
৯) বেঁচে যাওয়া পাখির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
১০) বাচ্চাগুলো একসঙ্গে ব্রুডার বা ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে থাকে।
১১) ক্রিম সবুজ রঙের ডায়রিয়া হয়।

চিত্র:১৪.৩ গামবোরো রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ নির্ণয় :

মৃত বাচ্চার ময়নাতদন্তে নিম্নলিখিত প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে গামবোরো রোগ শনাক্ত করা যায়

* থাইমাস এবং বার্সা ফুলে যায় ও তাতে রক্তের ছিটা থাকে।
* পা এবং উরুর মাংসে রক্তের বড় বড় ছিটা দেখে।

চিত্র : ১৪.৪ গামবোরো রোগের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই । তবে আক্রান্ত পাখিগুলোকে ৩-৫ দিন স্যালাইন পানি (৫ লিটার পানি +২৫০ গ্রাম আখের গুড় + ১০০ গ্রাম লবণ) পান করালে এদের পানিশূন্যতা রোধ হয়। এরা গায়ে শক্তি পায় এবং রক্তপড়া বন্ধ হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

রোগ প্রতিরোধই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা। এজন্য খামারে সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ঘরদোর, খাঁচা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক, যেমন ফরমালিন (ফরমালিন : পানি = ১:৯), আয়োসান বা সুপারসেপ্ট দিয়ে ধৌত করতে হবে। বাংলাদেশে গামবোরোর বেশ কয়েক ধরনের টিকা আমদানি করা হয় যেমন :

* নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ ।
* ভি১ বার্সা জি
* বার ৭০৬
* গামবোরাল সিটি ইত্যাদি।

এগুলো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় নির্দিষ্ট বয়সে পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, ১৪-১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪-২৮ দিন বয়সে বুস্টার হিসেবে চোখে ড্রপ বা মুখের মাধ্যমে পান করিয়ে এ টিকা প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza)

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ :

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস এরোগের কারণ। মানুষে ছড়ালে একে বার্ড ফ্লু বলে। মানুষে সংক্রমণের কারণে বার্ড ফ্লু বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত রোগ। এ রোগে ব্রয়লার মুরগির মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার :

রোগাক্রান্ত মুরগির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শ, মুরগির মল, লালা ইত্যাদি ব্যবহৃত খাদ্য, পানি, যন্ত্রপাতি, পাত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
এছাড়া আক্রান্ত খামারের যানবাহন, ব্যক্তি, পরিদর্শনকারী ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- ব্রয়লারের খাবার চাহিদা কমে যায়
- চোখ, মাথা ও ঝুঁটি ফুলে যায়
- চোখে দিয়ে পানি পড়ে
- শরীরের পালকবিহীন অংশে রক্ত জমে কালো হয়ে যায়
- মুরগি দুর্বল হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে যায়
- আক্রান্ত মুরগির শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ঘড়ঘড় শব্দ করে
- ঝুঁটি বেগুনি রং ধারণ করে।
- সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা দেখা যায়
- আক্রান্তের হার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে

চিত্র : ১৪.৫ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

শরীরের বিভিন্ন অংশে ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। চামড়ার নিচে, শ্বাসনালি, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ ও ঘা দেখা যায়। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত ল্যাবে পাঠাতে হবে।

প্রতিরোধের উপায় :

জৈব নিরাপত্তা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া কোনো খামারে এ রোগ দেখা দিলে সম্মিলিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমস্ত ব্রয়লার মুরগিকে ধ্বংস করতে হবে। কোনোভাবেই আক্রান্ত মুরগি খামার থেকে বের করা যাবে না।

ফাউল পক্স :

পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স (Fowl pox) একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সের সব প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। পাখির বসন্ত একটি মারাত্মক রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকতা লাভ করে। তখন মৃত্যু হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও ফাউল পক্স বলতে সব পাখির বসন্ত রোগকেই বুঝায় তথাপি বর্তমানে আলাদা নামেও যেমন- পিজিয়ন পক্স, টার্কি পক্স, ক্যানারি পক্স প্রভৃতি ডাকা হয়। পৃথিবীর প্রায় পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশেই বসন্ত রোগ দেখা যায়। এ রোগে পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত উন্মুক্ত স্থানে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে নডিউল সৃষ্টি হয় যা বসন্তে গুটি নামে পরিচিত।

রোগের কারণ :

পক্সভিরিডি পরিবারের ফাউল পক্স ভাইরাস নামক ভাইরাস বসন্ত বোগেব কাবণ।

২০২০

সংক্রমণঃ নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। যথা–

* রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে সুস্থ্য পাখিতে এ রোগ ছড়াতে পারে।
* ত্বকের ক্ষত বা কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে।
* কিউলেক্স ও অ্যাডিস মশার মাধ্যমে।
* তাছাড়া কখনো কখনো রক্তশোষক মাছি, ফ্লি ও আঠালীর মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

বসন্ত রোগ প্রধানত দুই প্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা-

ক. ত্বকীয় বা হেড ফর্ম : এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত পাখির মুখমন্ডলে বসন্তের গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটিকে শুষ্ক বসন্তও বলা হয়।

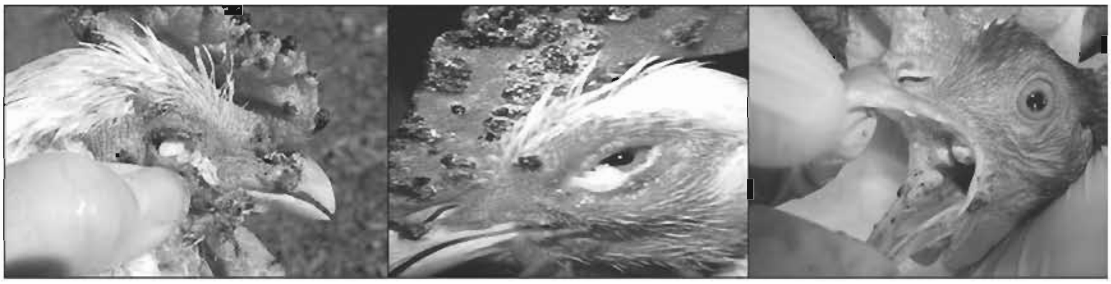

চিত্র : ১৪.৬ ত্বকীয় বা হেড ফর্ম ডিপথেরিটিক প্রকৃতির লক্ষণ

খ. ডিপথেরিটিক প্রকৃতি : এ প্রকৃতিতে প্রথমে আক্রান্ত পাখির জিহ্বায় ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষত পরে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণে অবশেষে পাখির মৃত্যু ঘটে। এ প্রকৃতির বসন্ত আর্দ্র বসন্ত নামেও পরিচিত। এ দুই প্রকৃতির বসন্ত আবার পাখিতে মৃদু ও তীব্র আকারে রোগলক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।

মৃদু প্রকৃতির বসন্তে :

* পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোসকা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।
* মুরগির ঝুঁটি, গলকম্বল, পা, পায়ের আঙ্গুল গুলো ও পায়ের চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।
* চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়

তীব্র প্রকৃতির বসন্তেঃ

* দেহের মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী ও অন্ত্রের দেয়ালেও বসন্তের ক্ষত দেখা দিতে পারে।
* শ্বাসনালী আক্রান্তের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।
* এতে ডিম পারা মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।
* এতে পাখির মৃত্যু হার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

২০২০

রোগ নির্ণয়-

* আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল দাগ হয়।

* পরবর্তীতে যা বড় হয়ে পুঁজপূর্ণ হয়, পেঁকে ঘা সৃষ্টি করে। এ ঘায়ে শেষে মামড়ি সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে খসে পড়ে।

চিকিৎসা :

এ রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত ক্ষত জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন- মারকিউরিকক্রোম) দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে সকেটিল, সালফানিলামাইড বা অন্য কোনো জীবাণুনাশক পাউডার লাগালে সুফল পাওয়া যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পাখিদের টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। বসন্ত প্রতিরোধের জন্য এ দেশে দুই ধরনের টিকা প্রয়োগ করা হয়। যথা-

১। পিজিয়ন বক্স টিকা : এটি ৩ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে মিশিয়ে দুসপ্তাহের বাচ্চার ডানার পালকবিহীন অংশে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল বা সুচ দিয়ে খোঁচা মেরে প্রয়োগ করা হয়।

২। ফাউল পক্স টিকা : এ টিকা হিম শুষ্ক অবস্থায় ০.৩ মি.লি. মাত্রায় কাচের অ্যাম্পুলে থাকে। এ পরিমান টিকা পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে দুই'শ পাখিতে প্রয়োগ করা যায়। পিজিয়ন পক্স টিকার মতো এ টিকাও এ পদ্ধতিতে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল দিয়ে পাখির ডানার পালকবিহীন স্থানে ৩ বার বিদ্ধ করতে হবে প্রতিবারই পরিশ্রুত পানিতে গুলানো টিকায় নিডল চুবিয়ে নিতে হবে। এ টিকা প্রয়োগের ৫,৭ও ১০তম দিনে টিকাবদ্ধ স্থানে বসন্তের গুটি দেখা গেলে এর কার্যকারিতা প্রমাণ হবে। এ টিকা এক মাসের বেশি বয়সের পাখিকে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও বিদেশে প্রস্তুত বসন্ত রোগের টিকা পাওয়া যায়। যেমন- ওভোডিপথেরিন ফোর্ট (ইন্টারভেট) যা কোম্পানির নির্দেশমতো মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। বছরে একবার পাখিতে এ টিকা প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ
সালমোনেলোসিস (Salmonellosis)

সালমোনেলা গোত্রের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগগুলোকে সালমোনেলোসিস বলে। যে কোনো বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবে ১ দিন থেকে ২ সপ্তাহ বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। প্রধানত ডিমের মাধ্যমে বাচ্চাতে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। মৃত্যুহার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। সালমোনেলা পুল্লোরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হলে একে পুলোরাম রোগ বলে। সালমোনেলা গ্যালিনেরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হলে একে ফাউল টাইফয়েড রোগ বলে।

রোগের লক্ষণ :

- ব্রয়লার বাচ্চা পাছা ভিজা থাকবে ও হলদে বর্ণের পাতলা পায়খানা করবে।
- বাচ্চা চিঁ চিঁ শব্দ করবে এবং মাথা একদিকে করে তাপের কাছে জমা হবে।
- পাখা এলোমেলো হবে। চুপচাপ বসে ঝিমাবে।
- খাবারের প্রতি অনীহা থাকবে।
- তীব্র পানিশূন্যতার কারণে মুরগি মারা যায়।
- মৃত বাচ্চার উদর গহ্বরে ডিমের কুসুম লেগে থাকে।
- বাড়ন্ত মুরগিতে খোঁড়া পা ও হাড়ের জয়েন্ট ফুলে ওঠার কারণে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- মুরগির হক জয়েন্ট ফুলে যায় ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।
- ঝুঁটি সাদা হয়ে যায়।

চিত্রঃ-১৪.৭ সালমোনেলোসিস রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :
বাচ্চাতে কুসুম অশোধিত অবস্থায় থেকে যায়।

প্রতিরোধ :
- বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখতে হবে।
- বাহক মুরগি নিধন করতে হবে সালমোনেলা মুক্ত বাচ্চা দ্বারা খামার শুরু করতে হবে।
- নিয়মিত আইওসান মিশ্রিত পানি দ্বারা ঘর, খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার করতে হবে।

চিকিৎসা :
ইএসবি ৩০% পাউডার বা কসুমিক্স প্লাস ১ লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম মিশিয়ে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন স্যালাইন খাওয়াতে হবে। শুধু অ্যান্টিবায়োটিক সালমোনেলা দূর করা সম্ভব নয়। সালমোনেলা কিলার (যেমন : বায়োট্রনিক এস ই নিয়মিত ব্যবহারে রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

নেক্রেটিক এন্টারাইটিস (Necrotic Enteritis)

এন্টারাইটিস কথাটির অর্থ হলো অন্ত্রের প্রদাহ। নানা কারণে অন্ত্রে প্রদাহ হতে পারে। অন্ত্রে উত্তেজক পদার্থের উপস্থিতি বা বিভিন্ন জীবাণু ও পরজীবীর কারণে এন্টারাইটিস হয়। সাধারণত ২-৮ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে ১ (এক) সপ্তাহ বয়সী বাচ্চাও আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ৫-৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

এন্টারাইটিস সৃষ্টির কারণ :
নেক্রোটিক এন্টারাইটিস যে কোনো বয়সের মোরগ-মুরগির হতে পারে। মৃত্যুহার লেয়ার মুরগির তুলনায় ব্রয়লার মুরগির বেশি। রোগটির সংক্রমণ কোনোরূপ পূর্বলক্ষণ প্রকাশ না করেই ঘটতে পারে। পুরাতন লিটার পুনঃব্যবহার করলে রোগটি ছড়াতে পারে। পুরাতন লিটারের মধ্যে রোগটির স্পোর বা বীজ থাকার সম্ভাবনা বেশি।

রোগের লক্ষণ :
- আক্রান্ত মোরগ-মুরগি ভীষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
- প্রচণ্ড ডায়রিয়া দেখা দেয়, লক্ষণ প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়।
- অনেক সময় লাল রঙের গুড়ের মতো পায়খানা হয় যা কক্সিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় হিসাবে ভুল হতে পারে।
- তাছাড়া অনেক সময় পানির মতো পাতলা পায়খানা হয় এবং বদহজমকৃত খাদ্য পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসতে পারে।
- মোরগ-মুরগির ডানা ঝুলে পড়ে, দাঁড়াতে পারে না।
- পালক উস্কোখুস্কো হয়ে যায়।
- ঠোঁট দিয়ে লালা পড়ে।
- বুকের মাংস কালো হয়ে যায়।

চিত্র:১৪.৮ নেক্রেটিক এন্টারাইটিস রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

কলিজা বড় হয়ে যায়, হলুদাভ রঙের এবং রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। অন্ত্রে রক্তক্ষরণ হয় এবং গ্যাস জমে বেলুনের মতো ফুলে উঠে। অনেক সময় ক্ষুদ্রান্ত্রে সাদা রঙের ঘা দেখা দেয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর মোটা হয়ে যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ :

১. **ভাইরাস :** ভ্যাকসিন বা টিকা প্রদানের মাধ্যমে ভাইরাসজনিত রোগ দমন করা হয়।

২. **প্রটোজোয়া :** কক্সিডিয়া নামক প্রটোজোয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোল্ট্রি খাদ্যে কক্সিডিয়া বিরোধী ঔষধ ও ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়।

৩. **ব্যাকটেরিয়া :** এন্টারাইটিস সৃষ্টিকারী ২ ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে-

(ক) সালমোনেলা, ই. কলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া– খাদ্যে বিভিন্ন এসিডিফায়ার (সালমোনেলা কিলার), এন্টিবায়োটিক (সি.টি.সি./অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন/ফুরাজলিডন/টাইলোসিন ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়।

(খ) ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস : নামক গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি নেক্রোটিক এন্টাররাইটিস রোগটি দমনের জন্য আমরা কার্যকর তেমন কিছু ব্যবহার করা হয় না।

বায়োসিকিউরিটি মেনে চলতে হবে। সংক্রমিত ঘর ও সরঞ্জাম ১:২০০ বা ১:৫০০ কস্টিক সোডা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

চিকিৎসা :

যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন- টেট্রাসাইক্লিন বা রেনামাইসিনের যে কোনো একটি ঔষুধ বিধি মোতাবেক পানির সাথে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

কলিবেসিলোসিস (Colibacillosis)

ই কলাই নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে কলিবেসিলোসিস রোগ বলে। এই জীবাণুটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সব প্রাণীর শরীরের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশে যেমন- খাদ্য বা পানির ভিতর এই জীবাণু উপস্থিত থাকে। সময় সুযোগমতো জীবাণুটি শরীরের ভেতর রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের অন্য কোনো রোগের উপস্থিতিতে বা অন্য কোনো ধরনের কারণে শরীর যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই এই জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে। আবহাওয়াগত বা অন্য কোনো কারণে বাতাসের আর্দ্রতা বা লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সংক্রমণের উপায় :

১) ডিম পাড়া মুরগির প্রজননালীতে জীবাণু বিদ্যমান থাকলে তা ডিমকে আক্রান্ত করতে পারে বা ঐ ডিম হতে যে বাচ্চা ফোটে তাকে সংক্রমিত করতে পারে।

২) আক্রান্ত মুরগির সংস্পর্শে এলে বা হাঁচি, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অন্য মুরগিতে ছড়াতে পারে।

৩) ইনকিউবেটরের আর্দ্রতা বেশি থাকলে এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে এই রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকলে সদ্য ফোটা বাচ্চার রোগ দেখা দিতে পারে।

৪) মোরগ-মুরগি স্থানান্তর করার সময় পরিবহন বা অন্য কোনো ধকল পীড়নের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাো কমে গেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৫) ঘরের মধ্যে এমোনিয়া গ্যাস জমে গেলে যে পীড়ন সৃষ্টি হয় তার ফলেও মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

এ রোগের লক্ষণগুলো নির্ভর করে মুরগির কোন অঙ্গে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করেছে তার উপর। যেমন:

১. অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis) :

- পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে এবং পিছনের পালকে বিষ্ঠা লেগে থাকে।
- পালক উস্কোখুস্কো থাকে।

২. কলিসেপটিসেমিয়া (Colisepticaemia) :

- হঠাৎ করে মোরগ-মুরগি অসুস্থ হয়ে পড়ে ও নিস্তেজ হয়ে যায়। নড়াচড়ায় অনীহা ভাব প্রকাশ পায়।
- মৃত্যুহার বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- শরীরের ভিতর বিভিন্ন অঙ্গে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়।
- ডিমের মাধ্যমে সংক্রমণ হলে ভ্রুণ মারা যায় বা বাচ্চা ফুটলেও রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত মৃত্যু হতে থাকে।
- যকৃতের মধ্যে সবুজ ক্ষত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো দেখা যায়।

৩. কলিগ্র্যানুলোমা (Coligranuloma) :

- মুরগির যকৃৎ, অন্ত্র ইত্যাদির ঝিল্লিতে বা পর্দায় গুটিগুটি দানার মতো দেখা যায়।

৪. এয়ার স্যাক ডিজিজ (Air Sac Disease) :

- ৬-৭ সপ্তাহের ব্রয়লার মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- শ্বাসনালী ও শ্বাসথলির মধ্যে এই ইনফেকশন হয় বলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও চোখে প্দাহ দেখা দেয।

২০২০

৫. প্যানঅপথ্যালমাইটিস ও সোলেন হেড ডিজিজ (Panopthalmitis & Swollen Head Disease) :

- কলি সেপ্টিসোমিয়া রোগে আক্রান্ত মুরগির চোখের ভিতর ও তার চারিধারে দধির মতো অথবা পুঁজ জাতীয় পদার্থ জমা হয় বলে চোখ ফুলে যায় ও চোখ বন্ধ করে রাখে। কখনও কখনও চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এটাই প্যানঅপথ্যালমাইটিস নামে পরিচিত।
- আবার দেখা যায় ব্রয়লার মুরগির চোখের চারিধারে পানি ও পুঁজ জমে ফুলে যায়। ফলে মনে হয় মাথা ফুলে গেছে। এটাকেই "সোলেন হেড ডিজিজ" বলে। এ সমস্ত মুরগি বার বার মাথা নাড়ে ও ঘাড় বাঁকিয়ে রাখে।

৬. চর্ম প্রদাহ (Dermatittis) :

- চামড়ার নিচে জলপূর্ণ স্ফীতি ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ পরিলক্ষিত হয়।
- চামড়ার ঘা দেখা যেতে পারে।

৭. সাইনোভাইটিস (Synovitis) :

- রক্তের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে হাড়ের জয়েন্ট বা অস্থি সন্ধিতে ইনফেকশন করে।
- সাধারণত বাচ্চা মুরগি আক্রান্ত হয়। ফলে অস্থিসন্ধি বা গিরা ফুলে যায় ও মুরগি হাঁটতে পারে না।

৮. ওম্ফ্যালাইটিস (Omphalitis) :

- নাভীর প্রদাহে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে।
- অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে বাচ্চারা জড়ো হতে থাকার প্রবণতা দেখা যায়।
- এই রোগে আক্রান্ত হলে বাচ্চার নাভীর ঘা শুকায় না এবং বাচ্চার মৃত্যু হয়।

প্রতিরোধের উপায় :

- জৈব নিরাপত্তা মেনে চলতে হবে।
- ডিম ফোটানোর জন্য সুস্থ, নীরোগ ও জীবাণুমুক্ত ডিম বেছে নিতে হবে।
- কোনোরূপ ধকল বা পীড়নে আক্রান্ত হওয়া মাত্র সিভিট বেট পাউডার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

চিকিৎসা ঃ

সিপ্রোফ্লক্স সলুশন ১ মিলি ১-২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে । ডায়রিয়া হয় বিধায় খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হয়।

ওম্ফ্যালাইটিস/ন্যাভাল ইল :

ওম্ফ্যালাইটিস একটি ই কলাই নামক একপ্রকার ব্যাটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট জীবাণুঘটিত রোগ তবে সংক্রামক নয়। ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে এ রোগটি মোরগ-মুরগিকে আক্রমণ করে। ঘর বা লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে, হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মধ্যে আর্দ্রতা বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে, কোনো কারণে বাচ্চা অবস্থায় মুরগির পেটে থাকা ডিমের কুসুম অব্যবহৃত থাকলে, বাচ্চা অবস্থায় জীবাণুর সংস্পর্শে এলে ওম্ফ্যালাইটিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা খুব বেশি বা কম হলে এবং পরিবহনজনিত পীড়নের কারণে মৃত্যু হার অধিক হয়।

২০২০

রোগের লক্ষণ :

- মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত মুরগির বাচ্চা সাধারণত সুস্থ দেখায়।
- অসুস্থ বাচ্চার ঝিমুনি হয় ও মাথা ঝুলে পড়ে।
- আলো-তাপের উৎসের দিকে জড়ো হয়ে থাকে।
- নাভি ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় সেটি লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। এ সময় সে স্থানে বাচ্চার ব্যথা অনুভূত হয়।
- জন্ম থেকে ১০-১৫ দিন বয়স পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু হার ১৫% পর্যন্ত হয়।
- বুকের চামড়ার নিচে ইডিমা (মাংসপেশী পচন ও পানি জমা দেখা দিতে পারে।

চিত্রঃ-১৪.৯ ওম্ফ্যালাইটিস রোগের লক্ষণ (মুরগির পেটে থাকা ডিমের কুসুম অব্যবহৃত)

প্রতিরোধ :

হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মাধ্যমে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগের প্রতিরোধ ও বিস্তার রোধ করা সম্ভব। ইনকিউবেটরে পরিষ্কার ও ভালো ডিম বাছাই করতে বসাতে হবে।

চিকিৎসা : ট্রেট্রা-ভেট পাউডার অথবা ডক্সাসিল-ভেট পাউডার নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে।

২০২০

মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট রোগ
মাইকোপ্লাজমোসিস (Mycoplasmosis)

মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগসমূহকে মাইকোপ্লাজমোসিস বলে। সাধারণত মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম ও মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি নামক জীবাণু মুরগির মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। সকল বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যু হার সাধারণত কম তবে অন্য রোগে সৃষ্ট জটিলতার জন্য মৃত্যু হার ৩০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার :

- আক্রান্ত মুরগি ও ডিমের মাধ্যমে সুস্থ মুরগি বা বাচ্চাতে রোগটি হতে পারে।
- গৃহপালিত মুরগি, বন্যপ্রাণী,আঠালী, ইঁদুর প্রভৃতির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
- রোগটির সংস্পর্শে আসা মানুষের হাত পা ও আক্রান্ত ফার্মের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি বা পরিবহন যানের মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- চোখ দিয়ে পানি ও নাক দিয়ে লালা ঝরে, চোখে পুঁজ জমা হয়ে থাকে।
- গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
- চোখের পাতা, মাথা, মুখ ও পায়ের গিরা ফুলে থাকে। যার জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটে।
- ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মুরগি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।
- পায়ের তলায় ফুলে যায়, আর পুঁজ হতে পারে।
- বুকের মাংসে ফোসকা দেখা যায়।
- ব্রয়লারের ৪-৮ সপ্তাহে বয়সে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

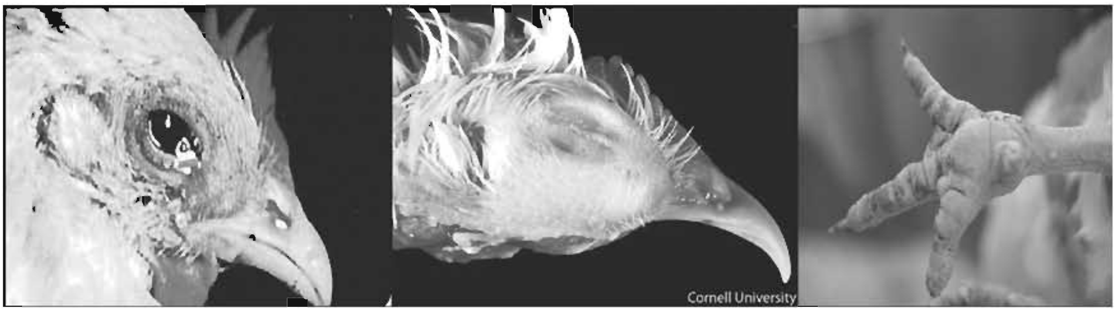

চিত্র:-১৪.১০: মাইকোপ্লাজমোসিস রোগে চোখ, নাক দিয়ে পানি, লালা ঝরে, চোখে পুঁজ জমা হয়ে পায়ের তলায় ফুলে যায়

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

শ্বাসনালীতে প্রচুর হলুদাভ সর্দি (মিউকাস) জমে এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। গিরায় ক্রিমের মতো আঠালো পদার্থ দেখা যায়।

২০২০

প্রতিরোধ :

রোগ ছাড়ানোর উপায়গুলো ভালোভাবে জেনে সেগুলো সম্পর্কে সতর্কতামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়মিত টিকা দিতে হবে। মাইকোপ্লাজমা মুক্ত খামার থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। হ্যাচিং ডিম ইনকিউবেটরে রেখে ২-৩ ঘণ্টা তাপ (৩৭-৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) দিয়ে ০.০৪% -০.১০টাইলোসিন টারট্রেট বা জেন্টামাইসিন দ্রবণের মধ্যে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১০-৩০ মিনিট রেখে দিলে ডিমের মধ্যেকার মাইকোপ্লাজমা জীবাণু মারা যায়। মুরগির শেডে অতিরিক্ত ধুলাবালি ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

চিকিৎসা :

টাইলোসিন টারট্রেট ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ

ব্রুডার নিউমোনিয়া (Aspergillosis)

এসপারজিলাস ফ্লেভাস নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এ রোগকে এসপারজিলোসিস বলা হয়। ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার ব্রুডিংকালীন সময়ে এ রোগ নিউমোনিয়া প্রকৃতির হয় বিধায় একে ব্রুডার নিউমোনিয়াও বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য বয়সের মুরগি আক্রান্ত হতে পারে। পুষ্টির অভাবজনিত কারণে দুর্বল মুরগি এবং বাড়ন্ত মুরগি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ব্রুডিংকালীন সময়ে হলে ১০-৫০% মুরগি মারা যেতে পারে।

রোগের বিস্তার :

- হ্যাচারিতে ডিম হতে বাচ্চা ফোটার পর বা ব্রুডার হাউজে ব্রুডিং-এর সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এই ছত্রাকের স্পোর ফুসফুসে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
- লিটার বেশি আর্দ্র হলে এই রোগের জীবাণু জন্ম নেয়। উক্ত স্পোর শ্বাসনালীতে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ :

- শ্বাসকষ্ট হয় ও হা করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।
- নিঃশ্বাসের সময় ঘড়ঘড় শব্দ হয়।
- খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দুর্বল হয়ে যায়।
- পিপাসা বেড়ে যাওয়ার ফলে বারবার পানি পান করে।
- বাচ্চা মুরগিতে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।
- চোখে আক্রান্ত হলে চোখ ফুলে যায় ও চোখ দিয়ে সবসময় পানি পড়ে।
- মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে অবশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না।

চিত্র : ১৪.১১ : ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগে চোখ ফুলে যায়, ফুসফুসে সাগুদানারমতো নডিউল

পোষ্টমর্টেম লক্ষণ :
শ্বাসনালী, কণ্ঠনালী ও ফুসফুসে সাগুদানারমতো সাদা বা হলুদাভ নডিউল দেখা যায়। ফুসফুসে ধূসর বর্ণে ফেনা পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ :
১) হ্যাচারি যন্ত্র বাচ্চা ফোটানোর আগে ফিউমিগেশন করা উচিত। ছত্রাকমুক্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর আগে বেছে নিতে হবে। স্যাঁতসেঁতে বা বেশি শুকনা লিটার ব্যবহার করা উচিত না।
২) বেশি দিনের পুরনো ছত্রাকযুক্ত খাদ্য খাওয়ানো যাবে না, খাদ্য উপাদান মেশানোর পর বেশিদিন রাখা যাবে না। ময়লা আবর্জনামুক্ত শুকনা পরিবেশ রাখতে হবে। খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। খাবারে নিয়মিত কপার সালফেট এবং মোল্ড বাইন্ডার যোগ করতে হবে।

চিকিৎসা :
কোনো সঠিক চিকিৎসা নেই। মাইকোফিক্স প্লাস বা যে কোনো টক্সিন বাইন্ডার প্রতি কেজি খাদ্যে ১.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। অথবা নিস্টাটিন জাতীয় ঔষুধ খাবারে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

আফলা-টক্সিকোসিস (Aflatoxicosis)

এটি মাইকোটক্সিনজনিত মারাত্মক রোগ। অ্যাসপাজিলাস নামক ছত্রাক থেকে এই মাইকোটক্সিন তৈরি হয় বা খাদ্যের মাধ্যমে বিশেষ করে সয়াবিন, ভুট্টা, চালের গুঁড়া ইত্যাদির মাধ্যমে খামারের মুরগিতে বিস্তার লাভ করে। নিম্নমানের খাদ্য (১৪% এর অধিক আর্দ্রতা), উপযুক্তভাবে গুদামজাত না করা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ পোল্ট্রি খাদ্য মাইকোটক্সিন দ্বারা আক্রান্ত। সকল বয়সের মুরগি আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার :

- খাদ্য যদি কোনো কারণে ভিজে যায় এবং সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়।
- খাদ্য মেশানোর পর বেশি দিন রাখা হয় এবং তা যদি মুরগিকে খাওয়ানো হয়।

রোগের লক্ষণ :

- পালক ঠোকরাবে।
- পায়ের রং ফ্যাকাসে হবে ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবে।
- খাদ্যে অরুচি ও পাতলা পায়খানা হবে।
- মুখে ঘা দেখা দেবে।
- পালক উসকো-খুসকো হবে।
- ঝিমাবে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিবে।
- শরীরের ওজন কমে যায়।
- পুষ্টি দ্রব্যের শোষণ হ্রাস পায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।
- পরবর্তীতে মুরগি মারা যাবে।

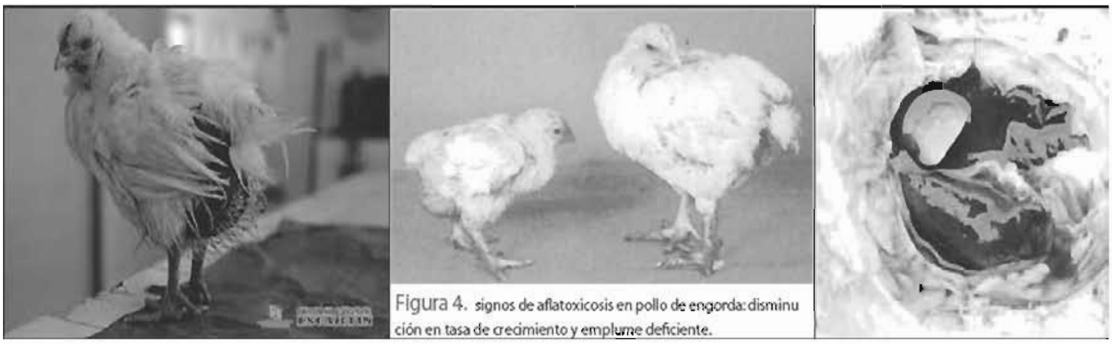

চিত্র : ১৪.১২.আফলা-টক্সিকোসিস রোগে পালক উসকো-খুসকো, লিভার কালচে বর্ণ হয়ে যাওয়া

পোস্টমর্টেম লক্ষণ : লিভার কালচে বর্ণের। চামড়ার নিচে রক্তের ফোঁটা। পেটের ভিতরে প্রচুর রক্ত পাওয়া যাবে।

প্রতিরোধ :

খাবারে টক্সিন বাইন্ডার ও মোল্ড ইনহিবিটর নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত লিটার ও খাবার পরিবর্তন করতে হবে। মাঝে মাঝে খাবারে অফলাটক্সিনের পরিমাণ জানার জন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে হবে। লিটার শুকনা ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পচা, ভেজা ও নষ্ট খাবার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। পরিষ্কার খাবার ও পানি সরবরাহ করতে হবে।

চিকিৎসা :

* মাইকোফিক্স প্লাস বা যে কোনো টক্সিন বাইন্ডার খাদ্যে মেশাতে হবে।
* পানিতে আখের গুড় ও কপার সালফেট মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
* পচা খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

২০২০

প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ :
ককসিডিওসিস (Coccidiosis) বা রক্ত আমাশয়

ককসিডিয়া নামক প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে ককসিডিওসিস বলে। অল্প বয়সের মুরগি বিশেষ করে ৪-৮ সপ্তাহের ব্রয়লার মুরগি এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে বেশি বয়সী মুরগিতেও কখনও কখনও এ রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশে আইমেরিয়া টেনেলা ও আইমেরিয়া নেকাট্রিক্স নামে ২টি জীবাণু দ্বারা রক্ত আমাশয় হয়। মুরগির বাচ্চার মড়কের কারণগুলোর মধ্যে এই রোগ অন্যতম।

রোগের লক্ষণ :

- হঠাৎ করে খাদ্য ও পানি গ্রহণে অনীহা দেখাবে।
- পালক উসকো খুসকো হবে।
- রক্ত মিশ্রিত চুনা পায়খানা করবে ও মলদ্বারের পালকগুলো পায়খানায় ভিজা থাকে।
- বাচ্চা চোখ বুজে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে।
- শরীরে কাঁপুনি হয়।
- ঠোঁট পা ঝুঁটি ও গলার ফুল ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

আক্রান্ত মুরগিতে রক্তমিশ্রিত পায়খানা থাকে। অন্ত্রের আক্রান্ত স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখা যায় ও অন্ত্রের দেয়ালের বাইরে থেকে রক্ত আবরণের চিহ্ন দেখা যায়। সিকামে রক্ত মিশ্রিত তরল বিষ্ঠা থাকবে।

প্রতিরোধ :

- স্বাস্থ্যসম্মত লিটার ও পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
- ব্রয়লারের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাড়ন্ত মুরগির সাথে বাচ্চা মুরগি রাখা যাবে না।
- পানির পাত্রের নিচের ও চারিপার্শ্বের লিটার প্রতিদিন উল্টেপাল্টে দিতে হবে।
- বাচ্চা মুরগির ঘরে কাজ করার পর বড় মুরগির ঘরে কাজ করতে হবে।
- বিধি মোতাবেক ঘর পরিষ্কার ও লিটার পরিবর্তন করে নতুন ব্যাচে বাচ্চা তুলতে হবে।
- লিটার সব সময় শুষ্ক রাখতে হবে। ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৫-৭ কেজি চুন ছিটিয়ে মিশিয়ে দিয়ে লিটার ওলটপালট করে দিলে লিটার শুষ্ক থাকবে। ফলে ককসিডিয়ার জীবাণুসহ অন্যান্য জীবাণু মারা যাবে।
- প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যে ৫০ গ্রাম বাজারে প্রাপ্ত ককসিডিওস্ট্যাট মিশিয়ে খাদ্যে ব্যবহার করতে হয়।
- জৈব নিরাপত্তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- টিকা ব্যবহার করেও বাচ্চার ককসিডিওসিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিকিৎসা

- ইএসবি-৩ (৩০%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ গ্রাম বা Embayin (২৫%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে ৩ দিন খাওয়ানোর পরে ২ দিন শুধুমাত্র পানি খাওয়াতে হবে। পুনরায় ৩ দিন উক্ত ঔষুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া ককট্রিট ইপি পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ভিটামিন-কে গ্রুপের ঔষুধ প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ৫-৬ দিন খাওয়াতে হবে।

চ) অন্যান্য রোগ :

এসাইটিস (Ascites) বা পেটে পানি জমা রোগ

এসাইটিস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ব্রয়লার মুরগির একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের কারণ একাধিক তবে রক্ত সংবহন তন্ত্রের ত্রুটির জন্যই শেষ পর্যন্ত এসাইটিস দেখা দেয়। যে কোনো বয়সের মুরগিই আক্রান্ত হতে পারে তবে ৫-৬ সপ্তাহের মুরগিই বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ :

- সাধারণ ঝাঁকের ছোট মুরগিগুলোই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- পালক উসকো-খুসকো হয়।
- ঝুঁটি ফ্যাকাসে ও কুচকানো থাকে।
- হাঁটা বা নড়াচড়ায় অনীহা দেখায়।
- শ্বাসকষ্ট হয় এবং পেট বড় হয়ে যায়।

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

আক্রান্ত মুরগির পেটে হলুদাভ বা বাদামি রঙের পানি জমা হয়। হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যায়।

প্রতিরোধ :

- বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ভালো থাকলে, ব্রয়লার প্রতি জায়গার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে, শেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লিটার শুষ্ক থাকলে, দুপুরের দিকে ২-৩ ঘণ্টা খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখলে এবং পানিতে দ্রবণীয় মাল্টি ভিটামিন খাওয়ালে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- খাদ্যের সাথে নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতি টনে ১২৫ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা :

এর কোনো চিকিৎসা নেই। তবে খাবারের অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ ব্যবহার করলে এবং পি এইচ কন্ট্রোলার ১ মিলি/২মিলি পানিতে ৫-৭ দিন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এনফ্লক্স-ভেট সলুশন ব্যবহার করলে রোগের প্রবণতা কমে। ২০২০

১৪.৩ ব্রয়লারের পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutritious Disease) :

খাদ্যের যে কোনো এক বা একাধিক খাদ্যোপাদানের ঘাটতির কারণে ব্রয়লার মুরগির বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। নিচের ব্রয়লারে বিভিন্ন ভিটামিনসমূহের অভাবজনিত রোগ, সেগুলোর চিকিৎসা ও প্রতিকারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ :
ভিটামিন এ

কতদিন পর্যন্ত মুরগিগুলো এই ভিটামিনের অভাবে ভুগছে তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিন-‘এ’ এর অভাবে সৃষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। বয়স্ক মুরগিতে লক্ষণ দেখা দিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। কিন্তু ব্রয়লার মুরগিতে ২/৩ সপ্তাহে মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিটামিন-‘এ’ এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো অবস্থা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, চোখের পাতা ফুলে যায়।
- নাক ও চোখ দিয়ে আঠার মতো জলীয় পদার্থ বের হয়।
- রাতকানা রোগ হয়।
- পায়ের হাঁটু ও চামড়ার হলুদ রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে।
- খাবার গ্রহণে আগ্রহ কমে যায় ও পালকের চাকচিক্য কমে যেতে পারে।
- মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল নীলাভ ও শুষ্ক হয়। ঝুঁটি শুষ্ক ও ফ্যাঁকাশে হয়ে যায়।
- বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়।

অভাব নিরূপণ :

১) খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ সঠিক আছে কিনা তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।

২) রক্তের সিরামে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করা।

৩) চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় কিনা তা লক্ষ করার মাধ্যমে এই ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

খাদ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন। শাকসবজি, ভুট্টা, গম, ছোট মাছ, ফলমূল, ফলমূলের খোসা, হাঙ্গর মাছের তেল খাওয়ালে ভিটামিন-এ এর অভাব দূর হয়। লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিদিন বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন এ.ডি.ই দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমতো খাদ্য বা পানির সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে।

২০২০

ভিটামিন ডি

শরীরের হাড় এবং ডিমের খোসার গঠনের জন্য অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতার জন্য এই ভিটামিন অত্যন্ত জরুরি। সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে বা খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে ভিটামিন-ডি নষ্ট হয়ে যায় ফলে মুরগি খাবার হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-ডি পায় না।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- পায়ের অস্থি নরম মোটা ও বাঁকা হয়ে যায়, ফলে মুরগি ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। একে 'রিকেট/অস্টিওম্যালেসিয়া' রোগ বলা হয়।
- ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে হাড় বাঁকা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।
- ঠোঁট, হাড় ও পায়ের নখ নরম হয়ে যায়, ফলে মুরগি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলে।
- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ও পাঁজর ফুলে যায়।

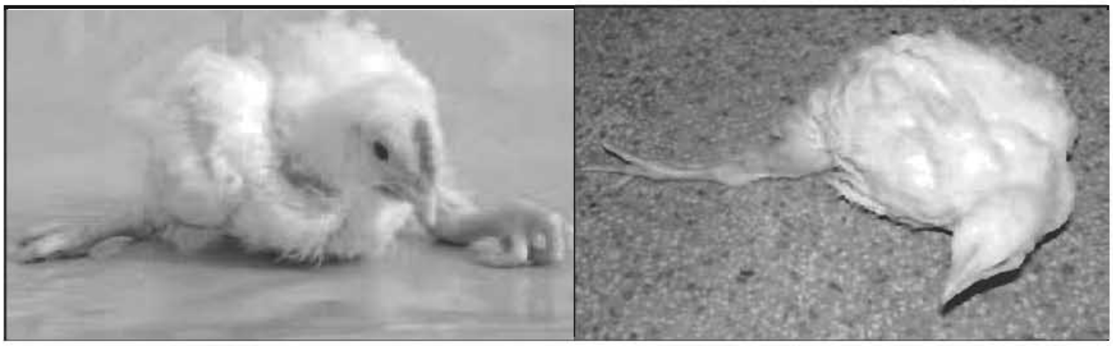

চিত্র : ১৪.১৩ ভিটামিন ডি অভাবজনিত লক্ষণ :

রোগ নিরূপণ :

ক) লক্ষণ দেখে রোগ নিরূপণ তথা ভিটামিন-ডি এর অভাব বোঝা যায়।

খ) খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং

গ) সন্দেহজনক মুরগিকে যদি ভিটামিন-ডি সরবরাহ করে ভালো ফল লাভ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ভিটামিন-ডি এর অভাবে ভুগছিল।

সতর্কতা : অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন-ডি খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োগ করলে মুরগির কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন-ডি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির এ.ডি.ই দ্রবণ নির্দেশমতো খাওয়াতে হবে।

২) যেহেতু ভিটামিন-ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত তাই একই সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম-এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৩) খামারে ছোট বাচ্চাগুলোকে সম্ভব হলে দিনের কিছুটা সময় রোদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিলে এবং সকালবেলা ব্রয়লারের জন্য সূর্যালোকের ব্যবস্থা করলে ভিটামিন-ডি এর অভাবজনিত রোগের আশঙ্কা অনেক কমে যাবে।

ভিটামিন ই

ভিটামিন-ই অভাবে মুরগির এনসেফালোমেলাসিয়া, মাসকুলার ডিসট্রোফি, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি রোগ হতে পারে। খাদ্যে অপর্যাপ্ত সেলিনিয়ামের উপস্থিতি, বিভিন্ন উপকরণের সঠিক অনুপাতে মিশ্রণ না করা, তেল জাতীয় খাদ্যের অক্সিডেশন ইত্যাদির কারণে ভিটামিন-ই এর অভাব হতে পারে।

ভিটামিন ই কাজঃ

ডিমের উর্বরতা বৃদ্ধি করে প্রজনন ক্ষমতা ঠিক রাখে ।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- আক্রান্ত ব্রয়লার হাঁটতে পারে না, পা টান করে ছেড়ে দেয়।
- বাচ্চার মাথার বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও জায়গাগুলো নরম হয়। এ রোগকে অ্যানসেফালোম্যালেশিয়া বলে।
- বুক ও উরুর মাংস শুকিয়ে যায়, একে মাসকুলার ডিস্ট্রফি বলে।
- চামড়ার নিচে পানি জমার কারণে শরীর ফুলে যায়, একে অ্যাকজুডেটিভ ডায়াথেসিস বলে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

(ক) চিকিৎসার জন্য বাজারে প্রাপ্ত এ.ডি.ই দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমতো খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

(খ) রোগ প্রতিরোধের জন্য সর্বদা খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের মাত্রা বজায় রাখতে হবে।

(গ) খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তেল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ রাখতে হবে।

(ঘ) সংরক্ষিত খাদ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ খনিজ বিশেষত সেলেনিয়াম খাদ্যে মিশাতে হবে।

ভিটামিন কে

এই ভিটামিনটি শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। আমাশয় আক্রান্ত হলে পায়খানায় প্রচুর রক্ত দেখা যায়। খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন সংরক্ষণ করলে খাদ্যের উপস্থিত এই ভিটামিনটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- এ ভিটামিনের ঘাটতির কারণে শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষত হলে, রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। ফলে মুরগির মৃত্যু ঘটে।
- চামড়া ও মাংস পেশিতে রক্তপাত হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

ক) রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসা চলাকালেও অতিরিক্ত ভিটামিন-কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

খ) সবুজ ঘাস, মাছের গুঁড়া, শাকসবজি ইত্যাদি খাওয়ালে ঘাটতি দূর হয়।

গ) চিকিৎসার জন্য খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)

পানিতে দ্রবণীয় এ ভিটামিনটির অভাবে খুব তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-বি-১ বিদ্যমান না থাকলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- অরুচি এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
- দৈহিক ওজনহ্রাস।
- উসকো-খুসকো পালক।
- দুর্বলতা এবং হাঁটতে অনীহা।
- ঝিমানো ভাব।
- ঘাড় বাঁকানো বা ঘুরিয়ে উল্টোভাবে রাখা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- কখনও কখনও মুরগি ঘাড় পিছনের দিকে বাঁকা করে উর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করে। একে 'স্টার গেজিং' বলে।

রোগ নির্ণয় :

১. লক্ষণ অনুযায়ী ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে।

২. আক্রান্ত মুরগির খাদ্যে ভিটামিন-এর পরিমাণ গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এরা আসলে ভিটামিন- বি-১ এর অভাবে ভুগছে কিনা।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) পানি বা খাবারে ভিটামিন-বি-১ সরবরাহ করা। প্রথম কয়েক দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

২) খুব অসুস্থ মুরগির জন্য আরও বেশি পরিমাণে ভিটামিন- বি-১ খাবারে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৩) এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন খাবারের সাথে ভিটামিন-বি১ মিশিয়ে দিতে হবে।

ভিটামিন বি -২ (রাইবোফ্লাভিন)

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং খাবার পানির পিএইচ ভিটামিন বি-২ কে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই খাদ্যে এর অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

বাচ্চা অবস্থায় প্রথমকয়েক সপ্তাহ ও ভিটামিনটির অভাব হলে মুরগির মধ্যে–

- দৈহিক দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়।
- শুকিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক পালক গজায় না।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- তীব্র আক্রান্ত মুরগির পা অবশ হয়ে গিয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হাঁটে।
- প্রায় সময় ও ভিটামিনের অভাবে পায়ের অবশতাজনিত রোগ দেখা যায় যাকে কার্ল-টো-প্যারালাইসিস বলে । এক্ষেত্রে দুই পা দু দিকে অর্থ্যাৎ সামনের দিকে এক পা চলে পিছনের দিকে চলে যায় ফলে পা-গুলো অচল হয়ে যায়। তাই তারা হাঁটতে পারে না এবং না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে।

২০২০

রোগ নিরূপণ :
রোগের লক্ষণ দেখে ভিটামিন বি-২ সরবরাহ করলে যদি লক্ষণগুলো দ্রুত চলে যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিরগুলো ঐ ভিটামিনের অভাবে ভুগছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :
১) খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-২ থাকা দরকার।
২) মাঝে মাঝে পানিতে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে বি-২ সরবরাহ করা প্রয়োজন, যাতে এই ভিটামিনের অভাব না হয়
৩) আক্রান্ত মুরগিগুলোকে আলাদাভাবে রেখে ভিটামিন বি-২ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি-৬ (পাইরিডক্সিন)

খাবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকলে এবং সে অনুযায়ী ভিটামিন বি-৬ এর স্বল্পতা থাকলে সাধারণত এ ভিটামিনটির অভাবজনিত সমস্যা দেখা যায় । কারণ এটি প্রোটিনের বিপাকে সাহায্য করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা অরুচি, উসকো-খুসকো পালক ইত্যাদি।
- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত বা কম হওয়া।
- প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- গুরুতর আক্রান্ত মুরগিগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং সব শেষে খিঁচুনি দেখা যায় এবং মৃত্যু হয়।

রোগ নির্ণয় :
খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করে ও রোগের লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণার ভিত্তিতে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ঐ ঝাঁকের মুরগিগুলো ভিটামিন বি-৬ এর অভাবে ভুগছিল।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :
১) লক্ষণ প্রকাশ পেলে খাবারের বা পানির সাথে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করে এ রোগের লক্ষণ প্রশমিত করা যায়।
২) নিয়মিত পরিমাণমতো ভিটামিন বি৬ খাবারের সাথে সরবরাহ করলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় না।

বায়োটিন

অধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে বায়োটিন সৃষ্টিকারী জীবাণু মরে গিয়ে কিংবা খাদ্যের মধ্যে বায়োটিনের পরিমাণ কম হলে অথবা খাদ্যে বায়োটিন নষ্টকারী কোনো পদার্থের উপস্থিতি থাকলে মুরগিতে এটার অভাবজনিত বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। বাচ্চা মুরগির শরীরের অসাড়তার হাত থেকে রক্ষার জন্য এ ভিটামিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- পালক ভেঙে ঝুলে পড়া ও পরে হাড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে।
- অনেক সময় চোখের পাতা বুজে থাকে বা চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
- বাচ্চা মুরগির পায়ের নিচে, মুখের কোনায় এবং চোখের পাতায় কড়া পড়ে যেতে পারে।
- ডিমের ভিতরে বাচ্চা মরে যায়।
- ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।

রোগ নির্ণয় :

১) লক্ষণ দেখে বায়োটিন প্রয়োগের ফলে যদি চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মুরগির বায়োটিনের অভাবে ভুগছিল।

২) খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ এবং রোগের লক্ষণ দেখে সমন্বয় করেও রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়োটিন মিশাতে হবে।

২) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে পানিতে অতিরিক্ত বায়োটিন মিশাতে হবে।

৩) খাদ্য বা পানিতে অত্যাধিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

৪) খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে খাদ্যে বায়োটিনের অভাব না হয়।

কলিন

মোরগ-মুরগির শরীরে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে কলিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শারীরিক অসাড়তা দূর ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা কলার গঠনে এবং স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুরগির খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কলিন সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- পায়ের হাড় নরম ও বাঁকা হয়ে মুরগি অসাড় হয়ে যায়।
- দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে।
- ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির কলিজায় অতিরিক্ত চর্বি ও রক্তক্ষরণজনিত লক্ষণ দেখা দেয়।
- ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমে যায় ফলে ডিম পাড়াও কমে যায়।

রোগ নির্ণয় :

লক্ষণ দেখে এবং পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়াও খাদ্যস্থিত কলিন বৃদ্ধি করে যদি ফল পাওয়া যায় তবে ধরতে হবে কলিনের অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবিন মিল, গম ভাঙা, ফিশ মিল ইত্যাদি থাকায় মোরগ-মুরগিতে কলিনের অভাব সাধারণত হয় না। কারণ সয়াবিন মিল ও ফিশমিলে প্রচুর পরিমাণে কলিন থাকে। মোরগ-

২০২০

মুরগিতে প্রায়ই কলিনের অভাব হয়। তাই বাজারে বাণিজ্যিকভিত্তিতে যে কলিন বা কলিন ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন মতো খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে। তবেই কলিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

ভিটামিন বি ১২ (সায়ানো-কোবালামিন)

শরীরের কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরিতে, শর্করা ও চর্বির বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় ভিটামিন বি-১২ সাহায্য করে। তন্ত্রের বিভিন্ন জীবাণু এই ভিটামিনটি তৈরি করে বিধায় এই ভিটামিনটির অভাবজনিত রোগ খুব কম দেখা দেয় এবং খাদ্যে এর প্রয়োজন অত্যন্ত নগণ্য।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- মৃত্যুর হার বেড়ে যায় এবং ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।
- ডিমের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে।

রোগ নির্ণয় :

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ইতিহাস, লক্ষণ ইত্যাদি দেখে ভিটামিন বি-১২ দিয়ে চিকিৎসা দিলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিতে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) লক্ষণ দেখা দিলে পানি বা খাবারের সাথে ভিটামিন বি-১২ সরবরাহ করতে হবে।
২) সুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে পানির সাথে ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন সি

স্ট্রেস বা পীড়ন প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসেবে ভিটামিন-সি ব্যবহার হয়ে থাকে। মোরগ-মুরগি ভিটামিন সি যথেষ্ট পরিমাণে নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে। দৈহিক বৃদ্ধি, বীর্য উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রকম বিষক্রিয়া বিশেষত কিছু খনিজ লবণের বিষক্রিয়ার হাত থেকে মোরগ-মুরগিকে রক্ষা করার ক্ষমতা ভিটামিন-সি এর রয়েছে। খাদ্যে ভিটামিন-সি এর অভাব থাকলে বা মোরগ-মুরগি অত্যাধিক গরম আবহাওয়ায় থাকলে বা পীড়ন (স্ট্রেস) সৃষ্টি হলে মোরগ-মুরগির ভিটামিন-সি এর অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায়।
- খাদ্য হজম কম হয়।
- পীড়নের মধ্যে পড়লে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়
- মোরগ-মুরগির বিশেষত মোরগের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

২০২০
১) খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি মেশাতে হবে।
২) মোরগ-মুরগির ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) পীড়ন হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পানির সাথে অতিরিক্ত ভিটামিন-সি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৪) ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে ও পরে কয়েকদিন ভিটামিন-সি সরবরাহ করতে হবে।

খ) খনিজ পর্দাথের অভাবজনিত রোগ

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজঃ
১. পাখির দেহের অস্থি গঠন ,ডিমের খোসা তৈরিতে খনিজপদার্থ অত্যাবশ্যক।
২. দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ :
- ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়।
- অস্থির গঠন ঠিকমতো হয় না।
- রক্ত জমাট বাঁধে না।
- রিকেট রোগ ও কেজ লেয়ার ফ্যাটিগ রোগ হয়।
- বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :
১) মাছের গুঁড়া, ঝিনুক, হাড়, দানা শস্য, পালংশাক ইত্যাদি মুরগির খাদ্যে সরবরাহ করলে এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।
২) মুরগির খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে– বাচ্চা মুরগিতে ২.২:১।
৩) মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে– বাড়ন্ত মুরগিতে ২.৫:১।
৪) মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে– ডিমপাড়া মুরগিতে ৯:১।

সোডিয়াম

সোডিয়ামের কাজ :
১. দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করার জন্য জরুরি।
২. অস্থি গঠন করে।

অভাবজনিত লক্ষণ :
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- হাড় নরম হয়।
- রক্ত পাতলা হয়।
- ডি-হাইড্রেশন দেখা দেয় ও মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : খাদ্যে সাধারণ লবণ সরবরাহ করে এর অভাব দূর করা যায়।

জিংক

জিংকের কাজ :

১. পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, পালক গজানো ও ডিম উৎপাদনের জন্য জিংক প্রয়োজন।
২. অস্থির গঠনে জিংক প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- পালক কম গজায় ও পায়ের চামড়া উঠে যায়।
- পায়ের হাড় খাটো ও মোটা হয়।
- মুরগি ঠোকরা ঠুকরি করে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : মুরগির খাদ্যে জিংকের বা জিংক সমৃদ্ধ উপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে ।

সেলেনিয়াম

সেলেনিয়ামের কাজ :

১. সেলেনিয়াম হচ্ছে গ্লটাথায়োন পারোক্সিডেজ (Glutathion Peroxidase) নামক এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

- ডিম বসানোর ৪র্থ দিনে ভ্রুণের মৃত্যু হয়।
- চামড়ার নিচে পানি জমে।
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

ছোলা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বা খাদ্যে সেলেনিয়াম যুক্ত করলে এর অভাব দূর হয়।

লৌহ ও কপার

অভাবজনিত লক্ষণ :

- রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।
- লাল পালক এর রং ফ্যাকাশে হয়।
- স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

শাকসবজি, ঘাস, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। খাদ্যে ফেরাস সালফেট ও কপার সালফেট সংযোজন করতে হবে।

২০২০

১৪.৪ ব্রয়লারের টিকা প্রদান কর্মসূচি :

টিকা বীজ হচ্ছে রোগের প্রতিরোধক যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্ট্রিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়। পাখির দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। টিকা বীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে একপ্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক আমিষ পদার্থ তৈরি হয়। যাকে অ্যান্টিবডি বলা হয়। এ অ্যান্টিবডিই হচ্ছে রোগপ্রতিরোধ পদার্থ। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যাবধানে টিকা প্রদানের যে সিডিউল তৈরি করা হয় তাই টিকাদান কর্মসূচি ।

বর্তমানে খামারীরা নিম্নলিখিত টিকা প্রদান কর্মসূচি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেন—

বয়স (দিন)	রোগের নাম	ভ্যাকসিনের নাম	প্রবেশ পথ	ডোজ/পরিমাণ
৬-৮	রানীক্ষেত	এনডি-লেসোটা(জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা
১০	গামবোরো	ডি-৭৮ (জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা
১৭	গামবোরো	গামবোরো ডি-৭৮(জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা
২১	রানীক্ষেত	এনডি-লেসোটা (জীবন্ত)	চোখে/মুখে	১ ফোঁটা

১৪.৫:-মৃত ব্রয়লার সৎকার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মৃত ব্রয়লার সৎকার :
রোগাক্রান্ত ও মৃত মুরগির মাধ্যমে সহজেই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। যা খামারের জন্য ক্ষতির কারণ। সে জন্য রোগাক্রান্ত মুরগিকে তৎক্ষণাৎ পৃথক করে রোগ শনাক্ত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। মৃত মুরগি তৎক্ষণাৎ শেড থেকে সরিয়ে নিতে হবে। মোটা পলিথিনের প্যাকেটে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুন নিয়ে এর মধ্যে মৃত মুরগি রেখে ভালোভাবে মুখটি বন্ধ করতে হবে। খামার থেকে নিরাপদ স্থানে মাটির কমপক্ষে ৩ ফুট নিচে পুঁতে রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক ইনসেনারেটর মেশিন থাকলে মৃত মুরগি পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ব্রয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :
ব্রয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা :
১. লিটার, আবর্জনা, বিষ্টা ব্যবস্থাপনার ফলে পরিবেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকে বায়ু দূষণ হয় না।
২. জনসাধারণের জন্য দুর্গন্ধমুক্ত পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।
৩. খামারে রোগের আক্রমণ কম হয়।
৪. উন্নত মানের জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

(ক) জৈব সার হিসাবে :
ডিপ লিটার এ নাইট্রোজেনের পরিমাণ গোবর সার অপেক্ষা ১০ গুণ বেশি। ২৫টি মুরগি বছরে ১ টন জৈব সার তৈরি করতে পারে। ডিপ লিটার খোলা স্থানে না রেখে একটি একক চালা ঘর করে চারিদিকে বেড়া দিয়ে এর মধ্যে জমা করতে হবে।

২০২০

তবে লিটার পচিয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরি করলে গুণাগুণ আরও বৃদ্ধি পায়। মাটিতে গর্ত করে পচনশীল আবর্জনার স্তর তৈরি করে তার উপর লিটার দিয়ে ভরতে হবে। এর উপর কচুরিপানা, ঘাস, লতা-পাতা দিয়ে ভরাট করে গর্তটি মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। এ অবস্থায় দুই সপ্তাহ রেখে গর্ত থেকে তুলে সরাসরি জমিতে ব্যবহার করা যায় লিটার সরাসরি চারাগাছে ব্যবহার না করে সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করে ভালোভাবে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আর জমিতে পানি থাকলে সরাসরি রাসায়নিক সারের মতো ছড়িয়ে ব্যবহার করা যায়।

প্রাকৃতিক উপায়ে তাপ উৎপাদনের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থের বা লিটারের জীবাণু ধ্বংস করে সার উৎপাদনকে কম্পোস্টিং বলে। এছাড়া লিটার আরো দুইভাবে ব্যবহার করা যায়-

(খ) মাছের খাদ্য হিসেবে :
ডিপ লিটার মাছের জন্য সুষম খাদ্য। এ খাদ্য দিলে মাছের জন্য অন্য কোনো সম্পূরক বা পরিপূর্ণ খাবারের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া খরচও কম হয়। লিটার পানিতে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইটোপ্লাংটন ও জুপ্লাংটন জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদনে সাহায্য করবে। পানিতে বিভিন্ন স্থানের মাছের খাদ্য হিসেবে লিটার ব্যবহৃত হয়। প্রতি হেক্টরে ৪৫.৫ কেজি লিটার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে লিটার বা বর্জ্য পদার্থ পুকুরে সরাসরি মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করে পচানোর পর ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) বায়োগ্যাস হিসাবে :
পারিবারিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়। লিটার থেকে বাতি জ্বালানো ও রান্নার কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়া–
(ক) হাঁস মুরগি ও গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে;
(খ) লিটার-সামগ্রী পরিশুদ্ধ করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
(গ) লিটার মৃত হাঁস-মুরগির সাথে কম্পোস্ট করে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১৪.৬ খামারের জৈব নিরাপত্তা বা বায়ো-সিকিউরিটি

বর্তমান বিশ্বে খামার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি বহুল আলোচিত শব্দ। খামার স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে খামার পরিকল্পনা, উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ, এমনকি ভোক্তার কাছে উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথা জীবাণুমুক্ত ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাবমুক্তভাবে সম্পন্ন করাই জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য :

১) বহিরাগত রোগজীবাণুর যেমন : রানীক্ষেত রোগ, বার্ড ফ্লু জাতীয় রোগের কবল থেকে খামার রক্ষা করা।
২) মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ জীবাণু যেমন– সালমোনেলা থেকে খামারকে রক্ষা করা।
৩) খামারের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান।
৪) রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় কমানো, লাভজনক উপায়ে খামার গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি কমানো।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখলে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা যাবে :

১. খামারের স্থান নির্বাচন :

- পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি করে ঘর তৈরি করতে হবে।
- চারিদিকে খোলামেলা, প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের সক্ষম এমন স্থান বেছে নিতে হবে।
- লোকালয় থেকে দূরে কিন্তু খামারের পণ্য বাজারজাতকরণের ভালো যোগাযোগ সুবিধাসম্পন্ন ও শহর থেকে অনতিদূরে খামারের স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- খামারে পর্যাপ্ত পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে।

২. রোগজীবাণুর উৎস ও প্রতিরোধের উপায় নির্বাচন :

১) বাহক পাখি, বাইরে থেকে আমদানিকৃত জীবাণুবাহী ডিম ও ১ দিন বয়সের বাচ্চা, আক্রান্ত ডিম ও পাখি, মানুষের হাত পা ও পোশাকাদি, ধুলবালি, পালক, বিষ্ঠা, ও জৈব বর্জ্য, বন্যপাখি, শিকারি জীবজন্তু, ইঁদুর ইত্যাদি।
২) দূষিত পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি।
৩) রোগজীবাণু দুষ্ট সরবরাহের যন্ত্রপাতি যথা–ট্রাক, খাঁচা, ডিমের পাত্র ইত্যাদি।

রোগ বিস্তার প্রতিরোধের উপায় :
(ক) যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ ;

- যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে।
- সব ধরনের দর্শনার্থী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারের কর্মীদের খামারে ব্যবহৃত জুতা ও পোশাকাদি আলাদা রাখতে হবে এবং খামারের বাইরে বের করা যাবে না।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে ও পরে হাত–পা জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে ও শরীরের বহিরাংশে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- খামারের বন্যপ্রাণী, পোষাপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- এক খামারে একই বয়সের মুরগি পালন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একটি ঘরে একই বয়সের মুরগি রাখতে হবে।

(খ) খামারে অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ :

- দর্শনার্থীদের জন্য একটি তথ্য বই সংরক্ষণ করতে হবে। খামার পরিদর্শনকারীর নাম-পরিচয়, সাক্ষাৎকারের তারিখ-সময় ইত্যাদি তথ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করে খামারের নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারকর্মী ও খামার পরিদর্শনকারী বহিরাগত উভয়কেই কাজ করার সময় বা খামার পরিদর্শনের সময় জীবাণুমুক্ত জুতা ও পোশাকাদি পরিধান করতে হবে। খামার পরিদর্শন ও কাজের শেষে পুনরায় এদের জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।
- উপকরণ সরবরাহকারী বাস/ট্রাক ড্রাইভার ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরও উপরোক্ত উপায়ে যথাসম্ভব জীবাণু মুক্ত রাখতে হবে।
- বন্যপাখি নিয়ন্ত্রণের জন্য খামার ঘরের চারদিকে আলো বিকিরণকারী অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বেঁধে দিতে হবে। ২০২০

গ) চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতা :

- পোল্ট্রি খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অথবা চিকিৎসার কাজে নিয়োজিক চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যকর্মীকে জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।
- প্রতিটি আলাদা শেডে ঢোকার পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক ঔষুধ দিয়ে হাত-পা ধৌত করতে হবে। সম্ভব হলে আলাদা অ্যাপ্রন, হাত পায়ের মোজা ও মাথার আবরণী ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে নিয়োজিত কর্মী (বৃন্দ) খামারে প্রবেশকারী যানবাহন, তাদের চালক ও সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মীবৃন্দের যে কোনো ধরনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন।
- ময়নাতদন্ত করার জন্য বাতাসের অনুকূলে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে খামারে জীবাণু প্রবেশের কোনে আশঙ্কা নেই। ময়নাতদন্ত শেষে স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৩. নিয়মিত টিকা প্রয়োগ :

খামারে মোরগ-মুরগিকে টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগমুক্ত রাখা একটি আধুনিক, জটিল ও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। আধুনিক কালে পোল্ট্রি শিল্পের সাফল্য সময়মতো ও সফলভাবে টিকা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই টিকা প্রয়োগ কালে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করা বাঞ্ছনীয়। টিকা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে–

- হ্যাচারির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত স্বাস্থ্যকর্মীকে ১ দিন বয়সী বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে খামারিদের ধারণা দিতে হবে। মায়ের বা বাচ্চার শরীরের অ্যান্টিবডি টাইটার লেভেল নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাচ্চার টিকা প্রদান কর্মসূচি নির্ণয় করতে হবে।
- সঠিকভাবে উৎপন্ন, সংরক্ষিত, পরিবাহিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণি ভেদে টিকা প্রদানের সঠিক মাধ্যম অনুসারে টিকা প্রদান করতে হবে। যেমন- জীবন্ত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে খাবার পানি, স্প্রে বা চোখে ফোঁটা প্রদানের মাধ্যমে ও মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুতকৃত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- অসুস্থ মুরগিকে টিকা প্রয়োগ করা যাবে না।
- টিকা প্রদানের পূর্বে ভিটামিন এ, ডি ও ই ব্যবহার করা ভালো।
- টিকা প্রদানের পর ভিটামিন সি, ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম ব্যবহার করা ভালো।

৪. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

- প্রতি সপ্তাহে মোরগ-মুরগির খাদ্য ও পানি গ্রহণের পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য পরিমাণে কমাতে বা বাড়াতে হবে।
- সঠিকভাবে আলো প্রদান করতে হবে।
- কোনোরূপ রোগের লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথেই নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভজনক খামারের পূর্বশর্ত। তাই খামারের ভেতরের ও বাইরের চারিদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। মেঝে বা লিটার পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচে নতুন লিটার দেওয়া ও ঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা উচিত। খামারের সকল যন্ত্রপাতি, যেমন- মুরগির খাঁচা, ডিম রাখার পাত্র, খাবার ও পানি পাত্র ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বছরে অন্তত একবার শেডসহ সকল যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে অথবা ফিউমিগেশন করে পরিষ্কার করতে হবে। খামার পরিষ্কার রাখার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে–

খামারে ব্যবহৃত পুরোনো লিটার যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অপসারণ কালে ব্যবহৃত লিটার দ্বারা কোনোভাবেই যেন খামারের পরিবেশ নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

- সমস্ত ঘর ঝাড়ু দিতে হবে। খামারের প্রতিটি অংশ, যেমন– মেঝে, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্ব সহ অন্যান সরঞ্জাম, দরজা-জানালার মাঝে থাকা ধুলাবালি, মাকড়সার জাল প্রভৃতি পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট বাল্বের জায়গায় নতুন বাল্ব লাগাতে হবে।
- শেডের ভিতরে জীবাণুনাশক স্প্রে করলে ঘরের পিছন দিকে স্প্রে করা শুরু করে সামনের দিকে এসে শেষ করা উচিত। ঘরের ভেতরে প্রথমে ছাদ, পরে দেয়াল এবং সবশেষে মেঝেতে স্প্রে প্রয়োগ করার নিয়ম।
- শুকনো মেঝেতে অন্তত চার ইঞ্চি পুরু, শুষ্ক, শোষণক্ষম লিটার ছড়িয়ে দিতে হবে। লিটার হিসাবে ধানের তুস সর্বোত্তম।
- লিটারে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে কীটনাশক নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। কীটনাশক ও জীবাণুনাশক একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে কীটনাশক দেয়ালে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঘরের চারপাশে পর্দা হিসাবে পলিথিন বা নাইলনের বস্তা ব্যবহার না করে চটের বস্তা ব্যবহার করা উচিত। খাঁচা পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচ বাড়ন্ত মুরগি পালন শেষে সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা অতীব জরুরি। লেয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্লক উঠানোর আগে সমস্ত ঘর ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

৬. স্বাস্থ্য সম্মত ও আদর্শ খাদ্য প্রদান :

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন-সালমোনেলোসিস) ও ছত্রাকজনিত যেমন-এসপারজিলোসিস, আফলা টক্সিকোসিস রোগের জীবাণু খামারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সত্যিকারের ভালো খাবার বলতে জীবাণুমুক্ত ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্যকে বুঝায়।

৭. মুরগির ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা :

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংসকারী জীবাণুনাশক অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রাতেই বেশি কার্যকর। বাতাসের তাপমাত্রা ৭০° F এর উপরে এবং আর্দ্রতা ৭৫% এর উপরে থাকলে ফরমালডিহাইড গ্যাস সবচেয়ে কার্যকর।

ক) ক্লোরক্স (সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড দ্রবণ) : ১ কন্টেইনার ক্লোরক্স দিয়ে ৮০ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। বাঁশের তৈরি মুরগির ঘরের মেঝে, চালা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরক্স খুবই কার্যকরি।

খ) ভায়োডিন (আয়োডিন দ্রবণ) : ১ বোতল ভায়োডিন ১০% সলিউশন দিয়ে ৫ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। গামবোরো ভাইরাস মারা, হাত-পা জীবাণুমুক্ত এবং মুরগির জন্য আয়োডিন যৌগ ক্লোরক্স হতে উত্তম।

গ) চুন দিয়ে মাচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি। ১০০-২০০ মুরগি পালন উপযোগী একটি ঘরের মাঁচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ২০ কেজি পাউডার চুন ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮. বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পানির পাত্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা :

১) পান করার জন্য মুরগির খামারে টিউবওয়েলের পানি অথবা বাতাস দূষিত নয় এমন এলাকার সঠিক উপায়ে রাখা বৃষ্টির পানি অথবা পৌর কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত পানি অথবা ছাঁকা অথবা ১০০ লিটার পানির সাথে অন্তত ৩০০ মি. গ্রা. ক্লোরিন পাউডার মিশ্রিত করে ৩-৬ ঘণ্টা সংরক্ষণ করার পর সেই পানি সরবরাহ করা উচিত।

২) শেডে মুরগি থাকা অবস্থায় সপ্তাহে একবার পানিতে বেকিং সোডা সোডিয়াম বাই কার্বনেট) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ড্রিংকার, বাল্ব ও পাইপ লাইনে আঠালো বস্তু জমতে পারবে না। পানির সাথে অ্যান্টিবায়োটিক বা ভিটামিন দেওয়ার ঠিক আগেই বেকিং সোডা মিশ্রিত পানি পরিচালনা করতে হবে। প্রতি গ্যালন মজুদ দ্রবণের সাথে এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা দিতে হবে।

৩) লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালনে পানি সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নতুন ব্যাচের ব্যবস্থাপনা :

পুনরায় মুরগি বা বাচ্চা তোলার পূর্বে ঘর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন–

১) সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ/সরবরাহ লাইন পরীক্ষা করতে হবে। মেরামতের প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে করতে হবে।

২) মুরগির খাঁচা, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) পানির পাত্র ও সরবরাহ লাইন প্রয়োজনে মেরামত করতে হবে।

৪) থার্মোমিটার, থার্মোস্ট্যাট, গ্যাস ব্রুডার, স্টোভ ইত্যাদি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

৫) আগের ব্যাচের মুরগির বিষ্ঠাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে অথবা কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির কাজে লাগাতে হবে।

৬) মুরগির খাঁচা, খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৭) টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্যসমূহ জীবাণুনাশক দেওয়ার কয়েক ঘন্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে।

৮) দ্রব্যসমূহ ভালোভাবে শুকানোর পর নতুন বাচ্চা তুলতে হবে।

প্রশ্নমালা
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লারের রোগগুলোকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
২. ভাইরাসজনিত দুটি রোগের নাম লিখ।
৩. ব্যাকটেরিয়াজনিত তিনটি রোগের নাম লিখ ।
৪. সংক্রামক রোগ কাকে বলে?
৫. অসংক্রামক রোগ কাকে বলে?
৬. রানীক্ষেত রোগের কারণ কী?
৭. গামবোরো রোগের কারণ কী?
৮. মারেক্স রোগের কারণ কী?
৯. পক্স রোগের কারণ কী?
১০. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ কী?
১১. অন্তঃপরজীবীর নাম কী কী?
১২. সোলেন হেড ডিজিজ কাকে বলে ?
১৩. স্টার গেজিং কাকে বলে ?
১৪. কার্ল-টো-প্যারালাইসিস কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রানীক্ষেত রোগের লক্ষণ কী?
২. রানীক্ষেত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. গামবোরো রোগের লক্ষণ কী?
৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ কী?
৫. ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ কী?
৬. সালমোনেলা লক্ষণ কী?
৭. ইনফেকশাস করাইজা রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি কী?
৮. নেক্রোটিক এন্টারাইটিস রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কী?
৯. কলিবেসিলোসিস রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কী?
১০. ওম্ফালাইটিস রোগের লক্ষণ কী?
১১. মাইকোপ্লাজমা রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায়?
১২. মাইকোপ্লাজমা রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায়?
১৩. ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী?
১৪. আফলা টক্সিকোসিস রোগের চিকিৎসা কী?
১৫. ককসিডিওসিস রোগ কোন প্রটোজোয়া দ্বারা হয়?
১৬. রক্ত আমাশয় রোগ প্রতিরোধের উপায় কী?
১৭. রক্ত আমাশয় রোগ দেখা দিলে কী চিকিৎসা দিতে হবে?
১৮. অ্যাসাইটিস রোগের লক্ষণ কী?
১৯. ভিটামিন এ এর অভাব জনিত লক্ষণ লিখ।

২০২০

২০. ভিটামিন বি এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২১. ভিটামিন ই এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২২. ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২৩. ভিটামিন সি এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২৪. জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রানীক্ষেত রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
২. গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৩. মারেক্স রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৪. পক্স রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৫. মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৬. ইনফেকশাস করাইজা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৭. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৮. ককসিডিওসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৯. আফলা টক্সিকোসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
১০. ওম্ফালাইটিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা বর্ণনা কর।
১১. ব্রয়লারের টিকাদান কর্মসূচি উল্লেখ কর।
১২. জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি এমন রোগ প্রতিরোধে গৃহীত প্রয়োজনীয় জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২০২০

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রয়লার বাজারজাতকরণ

১৫.১ ব্রয়লার বাজারজাতকরণের সঠিক বয়স :

দৈহিক বৃদ্ধি খাদ্য গ্রহণের হার ও ভোক্তার পছন্দের ওজন বিবেচনা করে ব্রয়লার ৫-৬ সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করা হয়। ব্রয়লার উৎপাদনের সাথে সাথে বাজারজাত করতে না পারলে খামারের ক্ষতি হয়। তবে ব্রয়লার বিক্রয়ের পূর্বে ভোক্তার চাহিদা ও রুচির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ভোক্তা যে বয়সের ও যে ওজনের ব্রয়লার পছন্দ করে উৎপাদনকারীকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্রয়লার উৎপাদন করতে হবে।

১৫.২ বাজারজাতকরণের সময় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ :

বাজারজাতকরণের সময় নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে–

- খামারের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি করতে হবে।
- ব্রয়লার বিক্রির ৫-৭ দিন পূর্ব থেকে ব্রয়লারকে কোনো প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো উচিত নয়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- বড় শহরের কাছাকাছি যেখানে ক্রেতা বেশি সেখানে ব্রয়লার বাজারজাতকরণে সুবিধা।
- বাজার থেকে খামারের দূরত্ব বিবেচনায় রাখতে হবে।
- ব্রয়লার বিক্রি করার জন্য পূর্ব থেকেই খামারীকে বিক্রয় কেন্দ্র বা পাইকারি বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যাতে লাভজনক মূল্যে ব্রয়লার বিক্রি করা যায়।
- সাধারণত এক ব্যাচের সমস্ত ব্রয়লার একদিনে বিক্রি করা ভালো, যাতে পরিবহন খরচ কম পড়ে। অবশ্য নির্দিষ্ট ওজনের ব্রয়লার সরবরাহের জন্য মোরগ ব্রয়লার আগে বিক্রি করা যায়। মুরগি ব্রয়লার সমওজনের হলে পরে বিক্রি করা যায়।
- কোনো কারণে এক সাথে সমস্ত ব্রয়লার বিক্রি করা সম্ভব না হলে জবেহ্ করে পালক ও নাড়িভুঁড়ি ফেলানোর পর প্রক্রিয়াজাত করে ঠাণ্ডা ঘরে রাখার ব্যবস্থা নিতে হয়।
- তবে সব ভোক্তাই প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস পছন্দ নাও করতে পারে। কারণ ইসলামী শরিয়া মতো জবেহ্ করার বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকে বা অনেকে মৃত মুরগির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করতে পারে। এ ধরনের ভোক্তা জীবন্ত মুরগি ক্রয়কে বেশি পছন্দ করে।
- ভোক্তার রুচি ও পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রক্রিয়াজাত কারখানায় মুরগি জবেহ্, ভালো মুরগির মাংস ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ব্রয়লার ধরার ২-৩ ঘণ্টা পূর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ করতে হয় এতে মাংসের গুণাগুণ ভালো থাকে।
- ব্রয়লার ধরার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা না হলে মুরগির পা বা পাখা ভেঙে যেতে পারে, মাংস থেঁতলে যেতে পারে।
- পরিবহনের খাঁচার উন্নতি সাধন ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন।
- গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট ঋতুতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে বাজারের মুরগির আমদানি বেশি হয়, ফলে বাজারে ব্রয়লারের দাম কমে যায়।
- আবার বিশেষ ঋতুতে ডিম পাড়া শেষে ডিম পাড়া মুরগি বাজারে বেশি আমদানি হয়, ফলে দাম কমে যায়। এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

বাজারজাত করার পদ্ধতি :

সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে বাজারে ব্রয়লার বিক্রি হয়–

১) জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি করা।

২) জবেহ্ করার পর শুধু রক্ত ও পালক বাদ দিয়ে বরফে প্যাক করে বিক্রি করা।

৩) ড্রেস করা ব্রয়লার টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা।

৪) নাড়িভুঁড়ি ছাড়ানো বা রান্না করার জন্য প্রস্তুত ও বরফে দ্রুত জমানো অবস্থায় বিক্রি করা।

৫) প্রক্রিয়াজাত করা ব্রয়লার আরও প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করা। যেমন, ফ্রাই, রোল, চিকেন বল ইত্যাদি।

১৫.৩ ব্রয়লার বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া

প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোগকারীর নিকট উৎপাদিত দ্রব্য আসতে বিভিন্ন হাত ঘুরে আসে। স্থানীয় ফড়িয়া বা পাইকারগণ সরাসরি খামার থেকে জীবন্ত ব্রয়লার ক্রয় করে বাজারে খুচরা বিক্রি করে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ফড়িয়া বা পাইকারগণ নিজেরাই দাম নির্ধারণ করে। বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতার মুরগির সাথে প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র রাখে। ক্রেতা মুরগি কিনে জবেহ্ করার পর যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামতো প্রক্রিয়াজাত করে আনতে পারে। এতে প্রক্রিয়াজাত বিষয়ে ক্রেতার মনে কোনো সন্দেহ থাকে না এবং বিক্রেতার বাড়তি কিছু লাভ হয়।

বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী এখানে কাজ করে বিধায় উৎপাদনকারী তাদের ন্যায্য মূল্য পায় না। অপরদিকে ভোক্তাগণ অধিক মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করে থাকেন। বাজারের পরিবেশে মুরগি বিক্রয়ের সাথে জবেহ্ ও প্রক্রিয়াজাত করার ফলে বিভিন্ন রোগ জীবাণুতে আক্রান্ত হয়। বিক্রেতাগণের একই হাতে জীবন্ত মুরগি ধরা, জবেহ্ ও নোংরা হাতে মাংস প্রক্রিয়াজাত করা কখনই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাছাড়া মুরগির পায়খানা ও উপজাত পরিবেশকে আরও নোংরা করে। এছাড়া প্রক্রিয়াকরণ উপজাতের সঠিক ব্যবহার হয় না।

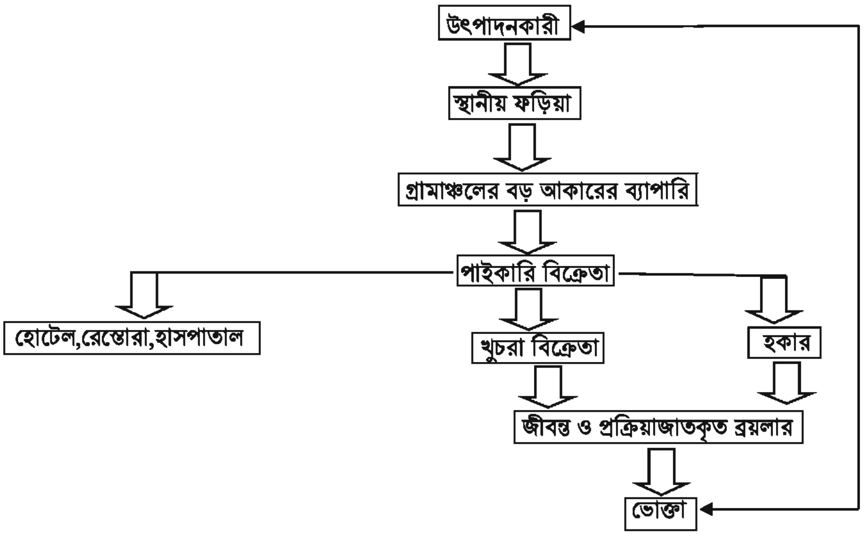

চিত্রঃ ১৫.১ ব্রয়লার বাজারজাতকরণের প্রচলিত প্রক্রিয়া

বড় বাণিজ্যিক খামারগুলোর সমবায় সমিতির অনুরূপ ছোট খামারগুলো সমবায় ভিত্তিতে প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন করতে পারবে অথবা ছোট খামারগুলোতে উৎপাদিত জীবন্ত ব্রয়লার নির্দিষ্ট মূল্যে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় সরবরাহ করতে পারবে। এ বিষয়গুলোকে নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি ধ্যান ধারণার আলোকে আমাদের সমগ্র বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে নিম্নলিখিতভাবে ঢেলে সাজাতে হবে–

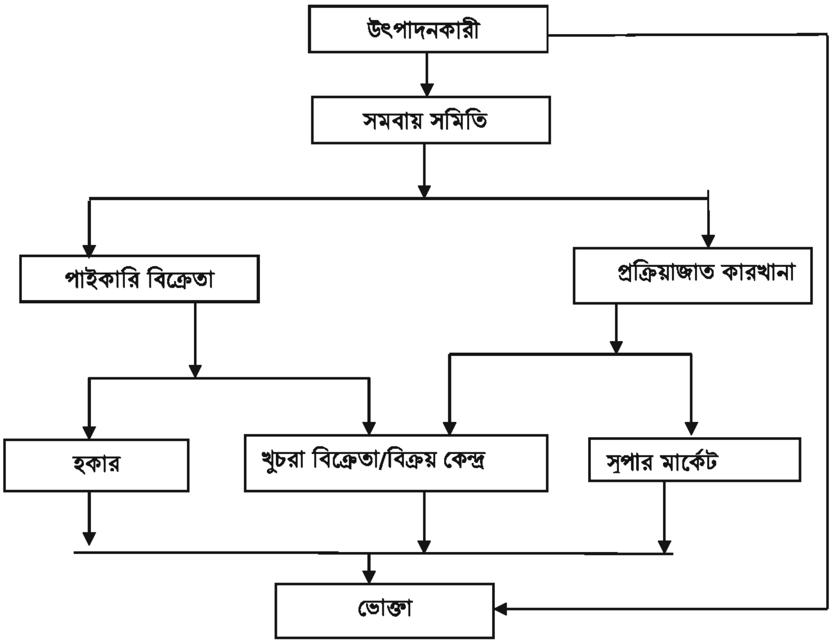

চিত্র : ১৫.২ ব্রয়লার বাজারজাতকরণের লাভজনক প্রক্রিয়া।

ব্রয়লার পরিবহন :

ছোট খামার পর্যায় থেকে আড়তদার পর্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে জীবন্ত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়–

- রিকশা ভ্যানে কয়েকতলা বিশিষ্ট লোহার বা বাঁশের ফালির খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন
- রিকশা ভ্যানে বড় গোল ঝুঁড়ি বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন
- পিকআপ ভ্যানে অনেক তলা বিশিষ্ট লোহার খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন
- বাসের ছাদে বড় চ্যাপ্টা ঝুড়িতে ব্রয়লার ভরে বড় শহরে ব্রয়লার পরিবহন

২০২০

বড় খামার পর্যায় থেকে আড়তদার বা প্রক্রিয়াজাত প্লান্ট পর্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে জীবন্ত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়-

- পিকআপ ভ্যানে অনেক তলা বিশিষ্ট লোহার খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন;
- বড় ট্রাকে মুরগি বহনের বড় বড় ক্রেটে ব্রয়লার ভরে কয়েক তলা সাজিয়ে ব্রয়লার পরিবহন

চিত্র ১৫.৩:বড় ট্রাকে মুরগি বহনের বড় বড় ক্রেটে ব্রয়লার ভরে কয়েক তলা সাজিয়ে ব্রয়লার পরিবহন

আড়তদার বা পাইকারি বিক্রেতা থেকে খুচরা বিক্রেতা বা হকার বা সুপার মার্কেটে নিম্নলিখিতভাবে জীবন্ত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়—

- রিকশা ভ্যানে কয়েক তলা বিশিষ্ট লোহার বা বাঁশের ফালির খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন
- রিকশা ভ্যানে বড় গোল ঝুঁড়ি বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন
- সাইকেলের পিছনে ঝুঁড়িতে করে ব্রয়লার পরিবহন
- পিকআপ ভ্যানে অনেক তলা বিশিষ্ট লোহার খাঁচা বসিয়ে ব্রয়লার পরিবহন

প্রক্রিয়াজাত প্লান্ট থেকে সুপার মার্কেটে নিম্নলিখিতভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়-

- হিমায়িত ট্রাক বা ভ্যানে করে প্রক্রিয়াজাতকৃত প্যাকেটজাত ব্রয়লার পরিবহন করা হয়।

প্রশ্নমালা

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সাধারণত কত সপ্তাহে ব্রয়লার বাজারজাত করা হয়?
২. ব্রয়লার বিক্রির কত দিন পূর্বে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো বন্ধ করতে হয়?
৩. প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ব্রয়লার ধরার কত ঘন্টা আগে থেকে খাদ্য প্রদান বন্ধ করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার বাজারজাতকরণের সময় কী কী সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?
২. বাজারে ব্রয়লার কী কী উপায়ে বিক্রি করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্তমানে ব্রয়লার বাজারজাতকরণের চ্যানেল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ব্রয়লার পরিবহন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ষোড়শ অধ্যায়
ব্রয়লারের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি

১৬.১ ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ

জীবন্ত ব্রয়লারকে ব্যবহারকারীর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে যে ধাপগুলো সম্পন্ন করা হয়, একে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। জবেহ করা, পালক ছড়ানো, নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেওয়া, বরফে ঠাণ্ডা করা, টুকরো করে কাটা এবং মোড়কাবৃত করা এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ নিম্নলিখিত কারণের জন্য করা হয়ে থাকে :

- প্রক্রিয়াজাতকৃত ব্রয়লার ফ্রোজেন করে সংরক্ষণ করা যায়, সহজে পরিবহন করা যায় এবং সুবিধামতো বিক্রি করা যায়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অবরোধ, হরতাল, পরিবহন সমস্যা ইত্যাদি কারণে সময়মতো বাজারজাতকরণের জন্য।
- ব্রয়লারের বাজার দর হঠাৎ কমে গেলে খামারে মুনাফা অর্জন ব্যাহত হতে পারে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্রেতাই বাজার থেকে জীবন্ত ব্রয়লার ক্রয় করে নিজেরাই ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী জবেহ্ করে পালক ছাড়িয়ে, নাড়িভুঁড়ি ও অন্যান্য উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দিয়ে বিভিন্ন অংশ কেটে ভালোভাবে ধুয়ে রান্নার জন্য তৈরি করে বা রেফ্রিজারেটরে রেখে দেয়। তবে ইদানীং বড় বাজারগুলোতে বিক্রেতারা এই কাজটি করে থাকে;

যেমন–

- জবেহ্ করা
- ড্রেসিং মেশিনে পালক ছাড়ানো
- নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেওয়া ও
- অন্যান্য উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া

ক্রেতা ড্রেসড মাংস পলিথিন প্যাকে বাসায় নিয়ে এসে বিভিন্ন অংশ কেটে ধুয়ে রান্না করে। এ প্রচলিত পদ্ধতিতে মুরগির রক্ত, পালক, নাড়িভুঁড়ি ও অন্যান্য উচ্ছিষ্টাংশ ডাস্টবিন বা অন্যত্র ফেলে দেওয়া হয়। অথচ এই মূল্যবান উপজাতগুলো দিয়ে পোল্ট্রি খাদ্য তৈরি করা যায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করা হতো, তবে এই উপজাত কাজে লাগানো যেত।

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত পূর্বপ্রস্তুতি :

- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরার ২/৩ ঘণ্টা পূর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ রাখতে হয়ে। ফলে পরিপাকতন্ত্রের সালমোনেলা জীবাণুর বৃদ্ধি কমে যায়।
- খাদ্য বন্ধ রাখার ফলে ব্রয়লার মুরগি কিছুটা ওজন হারায়।
- ব্রয়লার মুরগি দুই পর্যায়ে অনাহারে থাকে। যেমন– খামারে অবস্থানকালে ধরার পূর্ব এবং খামার থেকে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত। ২ পর্যায়ে মোট ৮ থেকে ৯ ঘণ্টার অতিরিক্ত অভুক্ত রাখা উচিত নয়।

অভুক্ত সময় মোট ওজন হারানোর পরিমাণ যেমন -

২০২০

অভুক্ত সময় মোট ওজন হারানোর পরিমাণ যেমন –

অভুক্ত রাখার সময় (ঘন্টা)	ওজন হারানোর পরিমাণ (শতকরা হার)
৩ ঘণ্টা	শতকরা ২ ভাগ
৬ ঘণ্টা	শতকরা ৩ ভাগ
৯ ঘণ্টা	শতকরা ৪ ভাগ
১০ ঘণ্টা	শতকরা ৫ ভাগ
১৫ ঘণ্টা	শতকরা ৬ ভাগ

- মুরগি ধরে খাঁচায় ঢুকানোর পূর্ব পর্যন্ত পানি প্রদান করা হয়।
- খাঁচায় বা ক্রেটের ভিতর ঢোকানোর পর প্রক্রিয়াজাত করা পর্যন্ত আর পানি প্রদান করা হয় না।
- প্রক্রিয়াজাত করার পর মাংস পরিচর্যা ও চিলিং করার সময় ২/৩ অংশ ওজন বেড়ে যায়।

ব্রয়লার মাংস থেঁতলানো বা বিবর্ণতা পরিহার;

- ব্রয়লার ধরা বা হাতানোর সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে মাংস থেতলানো হয়, বিবর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং মাংসের গুণগতমান ক্ষুন্ন হয়।
- ব্রয়লার ধরার জন্য পরিচর্যাকারীদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও কলাকৌশল বিষয়ে অবহিত করতে হয়, যেমন–
- প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের ২ সপ্তাহ পূর্বে কাঁকর প্রদান বন্ধ রাখতে হয় ।
- ফিনিশার খাদ্যের সাথে সকল প্রকার ঔষধ ব্যবহার প্রক্রিয়াজাত করার ৫ দিন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।
- রাত্রে যখন মুরগি শান্ত থাকে তখন ধরতে হয় এবং ক্রেট বা খাঁচার মধ্যে ভরতে হয়।
- মুরগি ধরার ২ ঘণ্টা পূর্বে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।

১৬.৩ ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মকানুন :

- যে কক্ষগুলোতে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করা হবে সে কক্ষগুলোতে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করা।
- জবেহ করার পূর্বে জীবন্ত ব্রয়লারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ।

ফুড হ্যান্ডেলারদের নিম্নোক্ত সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

- তীব্র ডায়রিয়া আক্রান্ত
- কলেরা রোগে আক্রান্ত
- হেপাটাইটিস-এ তে আক্রান্ত
- ফিতা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত
- যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত
- ঠান্ডা বা ফ্লু এর উপসর্গ দেখা দিলে।

১. গ্রহণ করা :

২০২০ জীবন্ত ব্রয়লার খাঁচায় করে প্লান্টে এনে খাঁচা থেকে বের করে পা দুটি উপরের লোহার কড়ায় আটকিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঝুলন্ত ব্রয়লারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সেকশনে যাবে।

২. জবেহ্ করা :

চাকু দিয়ে হালাল পদ্ধতিতে ব্রয়লারের গলায় জুগুলার শিরা কেটে দিয়ে জবেহ করার পর ১.৫-২ মিনিটের মধ্যে রক্ত সম্পূর্ণ ঝরে যাবে। মাথা থেকে দেহ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সম্পূর্ণ রক্ত না ঝরলে মাংস বিবর্ণ দেখাতে পারে।

৩. পালক ছাড়ানো :

এর পর ৫১-৫৩$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম পানিতে চুবিয়ে ৯০ সেকেন্ড রেখে সেমি-স্কেলডিং করা হয়। পালক তোলার জন্য রাবারের তৈরি অনেকগুলো আঙুল আছে এমন ড্রামে ব্রয়লার রেখে ড্রামটি ঘুরানো হয়। এতে ব্রয়লারের পালকগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং চামড়ার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না।

চিত্র ১৬.১ আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ

৪. শরীরের উপরে সামান্য ঝলসানো :

ব্রয়লারের গায়ে চুলের মতো সরু পালক থাকে, যা আগুনের শিখার মধ্যে দিয়ে ব্রয়লারকে টেনে দিলে পুড়ে পরিষ্কার হয়।

৫. ধৌত করা :

দুই দিক থেকে সজোরে পানি স্প্রে করে ব্রয়লারের শরীরের উপরিভাগ ধোয়া হয়। এতে গায়ে লেগে থাকা পালক, পোড়া পালক ও অন্যান্য ময়লা শরীর থেকে দূর হয়।

৬. ছোট পালক তোলা :

অনেক সময় ব্রয়লারের শরীরে মাত্র গজাচ্ছে এমন পালক থাকে। এগুলোকে পিন ফেদার বলে। এগুলো হাত ও চাকু দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। চাকু ও বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে চেপে ধরে টান দিলেই এগুলো উঠে আসে।

৭. নাড়িভুঁড়ি অপসারণ :

লেজের উপরিভাগে অবস্থিত তেলগ্রন্থি কেটে ফেলার পর বুকের অগ্রভাগ থেকে পায়ু পথ খাড়াভাবে কেটে পেট খোলা হয়। নাড়িভুঁড়ি হতে যকৃৎ ও গিজার্ড বের করে সরিয়ে রেখে নাড়িভুঁড়ির অবশিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া হয়।

৮. ফুসফুস, বৃক্ক ও মাথা অপসারণ :

ফুসফুস ও বৃক্ক শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম দ্বারা বক্ষ ও পেট থেকে টেনে বের করা হয়। ছুরি দিয়ে মাথা কেটে ফেলা হয়।

চিত্র ১৬. ২ আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ

৯. গলা, কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালী অপসরাণ :

গলা কাঁধের কাছ থেকে কেটে ফেলা হয়। কণ্ঠনালী ও গলার থলি গলার কাছ থেকে হাতে ছাড়িয়ে নেয়া হয়, হাঁটু থেকে পা আঙুলসহ কেটে নেয়া হয়।

১০. ধোয়া ও বরফে ঠাণ্ডা করা :

ব্রয়লারের শরীরে লেগে থাকা রক্ত ও ময়লা সজোরে পানির স্প্রে দিয়ে ধুয়ে বরফের পানিতে ৪০০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ২৪ ঘণ্টার কম সময় পর্যন্ত রেখে দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। এতে ব্রয়লারের সেলফ্ লাইফ বৃদ্ধি পায়।

১১. প্যাকেটজাতকরণ :

ব্রয়লার আস্ত বা এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে কেটে প্যাকেটজাত করা হয়। প্লান্ট থেকে খুচরা দোকান পর্যন্ত পৌঁছাতে সবসময়ই ব্রয়লার ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। মাথা, গলা, কলিজা, গিলা ইত্যাদি পরিষ্কার করে প্যাকেটে ভরে একইভাবে খুচরা বিক্রেতার কাছে পৌঁছায়।

ফুড গ্রেড প্যাকেজিং সামগ্রীর তালিকা:

নিম্নে কতগুলো ফুড গ্রেড প্যাকেজিং সামগ্রীর উদাহরণ দেওয়া হলো:

- প্লাস্টিকের ফিল্ম (Plastic film)
- Polythene Terephthdate or PET
- পেপার, পেপার বোর্ড ও ফয়েল (Paper, paper board & foil)
- লেমিনেটেড পেপার (Laminated Paper)
- টেট্রা প্যাক (Tetra Pak)
- প্লাস্টিক টিউব অথবা বোতল (Plastic Tube or Bottle)
- কাঁচের (Glass) জার বা বোতল
- সেলোফেন ও পলিভিনাইল ক্লোরাইড (Cellophane & PVC)
- পলিইথিলিন Polyethylene (PE)
- পলি প্রপাইলিন Polypropylene (PP)
- পলি এমাইড Polyamid (PN) or Nylon
- পলিস্টাইরিন Polystyrene (PS)
- পলিকার্বনেট (Polycarbonate)
- Ethyl vinyl Alcohol (EV-OH)
- Poly vinyl Alcohol (PVAL)
- সেলুলোজ এসিটেট Cellulose Acetate (CA)
- ইথিলিন ভিনাইল এসিটেট (Ethylene vinyl Acetate)

২০২০

প্রশ্নমালা

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণ কী?
২. ব্রয়লার কেন প্রক্রিয়াজাত করা হয়?
৩. মাংস বিবর্ণ হয় কেন?
৪. ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরার কত ঘণ্টা পূর্বে খাদ্য বন্ধ করতে হয়?
৫. কত তাপমাত্রায় কত সময় ধরে ব্রয়লার পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর পালক ছড়ানো হয়?
৬. সেমি-স্কেলডিং কী?
৭. পিন ফেদার কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপের নামগুলো কী?
২. প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম কানুনসমূহ লেখ।
৩. অভুক্ত থাকার বিভিন্ন সময় কতটুকু ওজন হারায় তা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২. ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

ট্রেডের নামঃ পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং

শ্রেণিঃ নবম

বিষয়ঃ ট্রেড -১ (প্রথম পত্র)

জব নং: -০১

জবের নামঃ

ছাত্র/ছাত্রীর নামঃ...

রোল নং : .... সেশনঃ ....

জব সম্পাদনের তারিখ সমূহঃ ....

ছাত্র- ছাত্রীরা এ জব ...৬.... বার অনুশীলন করবে

নম্বর বিভাজন	প্রাপ্ত নম্বর
জব অনুশীলন (৬)	
কাজের প্রতি আগ্রহ (২)	
নিরাপত্তা অনুশীলন ও পরিচ্ছন্নতাঃ (২)	
মোট (১০)	

শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রতিষ্ঠানের নামঃ গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

২০২০

জব নং-১

জবের নামঃ মুরগির বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সনাক্তকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মোরগ-মুরগি পৃথকীকরণ ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের জন্য বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচিতির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে এক জোড়া মোরগ-মুরগি পাশাপশি রেখে পর্যবেক্ষণ করে বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম ও কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখে মোরগ-মুরগির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) মোরগ-মুরগির বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করতে পারবে।
২) বাহ্যিক গুরত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের কাজ বলতে পারবে।
৩) বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনগত পার্থক্য জেনে মোরগ-মুরগি পৃথকীকরণ করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) প্রাপ্তবয়স্ক একটি মোরগ ও একটি মুরগি ।
২) মুরগি রাখার দুটি খাঁচা।
৩) অ্যাপ্রন ও দস্তানা।
৪) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১) প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ কর।
২) নিরাপত্তার জন্য অ্যাপ্রন ও দস্তানা পরে নাও।
৩) পৃথকভাবে ২টি মোরগ-মুরগিকে এমনভাবে ধর যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আহত না হও।
৪) মোরগ-মুরগি এমনভাবে ধর যেন গায়ে বিষ্ঠা না লাগে।
৫) মোরগ-মুরগিকে পাশাপাশি রেখে এদের ঠোঁট থেকে লেজ পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ শনাক্ত করে এদের নাম, কাজ ও মোরগ-মুরগির ক্ষেত্রে এদের কোনো পার্থক্য আছে কীনা তা জেনে নাও এবং প্রতিটি অঙ্গের নাম ধারাবাহিক ভাবে লেখ।

ক)	মাথার অঙ্গ সমূহ:	খ)	শরীরের অঙ্গসমূহ	গ)	পায়ের অংশসমূহ
১.	ঠোঁট	১.	গলা	১.	ড্রামস্টিক
২.	নাকের ছিদ্র	২.	বুক	২.	রান (উরু)
৩.	মাথার ঝুটি	৩.	পিঠ	৩.	পায়ের নলা
৪.	গলার ফুল	৪.	পাখা	৪.	পায়ের নখ
৫.	কানের লতি	৫.	লেজ	৫.	স্পার
৬.	চোখ	৬.	অবসারণী	৬.	পায়ের পাতা

মোরগের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ :

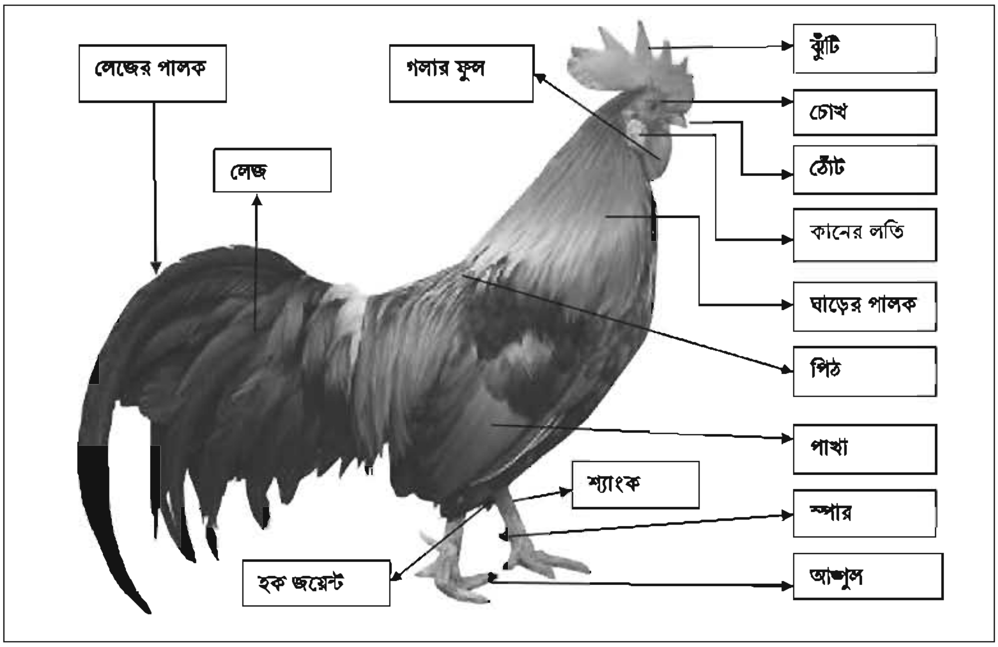

চিত্র : ১.১ মোরগের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ

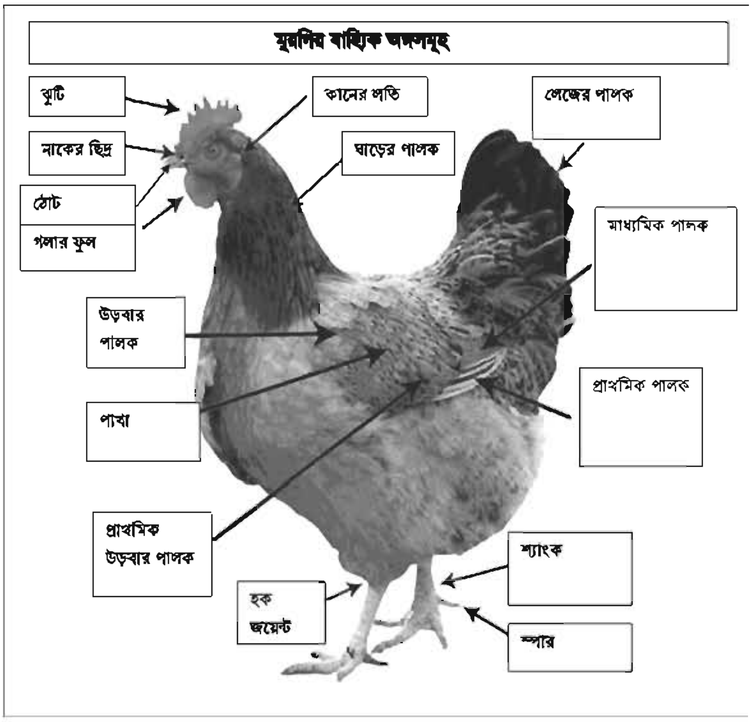

চিত্র : ১.২ মুরগির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ

২০২০

৬) এর পর মোরগ মুরগির ছবি এঁকে এদের অঙ্গসমূহ চিহ্নিত কর।
৭) কাজ শেষে ল্যাবরেটরি ও ব্যবহৃত উপকরণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখ ।

সতর্কতা :
১) মুরগি সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ কর যাতে পরীক্ষণ কালে ছোটাছুটি না করে এবং আহত করতে না পারে।
২) শরীর থেকে দূরে ধরতে হবে যেন গায়ে বিষ্ঠা না লাগে।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
প্রশ্ন : ১) মুরগির মাথার বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
২) মোরগ-মুরগির মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য কী কী ?

জব নং-০২
জবের নাম : মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের সনাক্তকরণ (পরিপাকতন্ত্র)।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :
মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ শারীরিক কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে পরিপাকতন্ত্রের গঠন ও কাজ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এই অঙ্গ খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক ক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রাখে। জবটিতে মোরগ-মুরগির দেহ ব্যবচ্ছেদ করে পরিপাকতন্ত্র পৃথক করে এর বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর গঠন ও কাজ সম্পর্কে জানা হয়।
উদ্দেশ্য :
১) পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
২) পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবে ।
৩) পরিপাক অঙ্গের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১। কাঁচি (ছোট ও বড়)	২। চিমটা
৩। ক্লিপ ও পিন	৪। মোম ট্রে

প্রয়োজনীয় উপকরন :

১। একটি মোরগ/মুরগি	২। পলিথিন
৩। টেবিল	৪। অ্যাপ্রোন
৫। দস্তানা	৬। কাগজ, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধারা :
১) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ কর।
২) নিরাপত্তা মূলক পোশাক যেমন অ্যাপ্রন ও দস্তানা পরে নাও।
৩) সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে মোরগ/মুরগি জবাই কর।

৪) জবাইয়ের পর রক্ত ঝরা শেষে মোরগ/মুরগিকে ট্রেতে চিৎ করে স্থাপন কর।
৫) ধারালো চাকুদিয়ে ব্যবচ্ছেদ করে অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত কর।
৬) পরিপাকতন্ত্র আলাদা কর।
৭) পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে চিহ্নিত কর

মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পরিপাকতন্ত্র

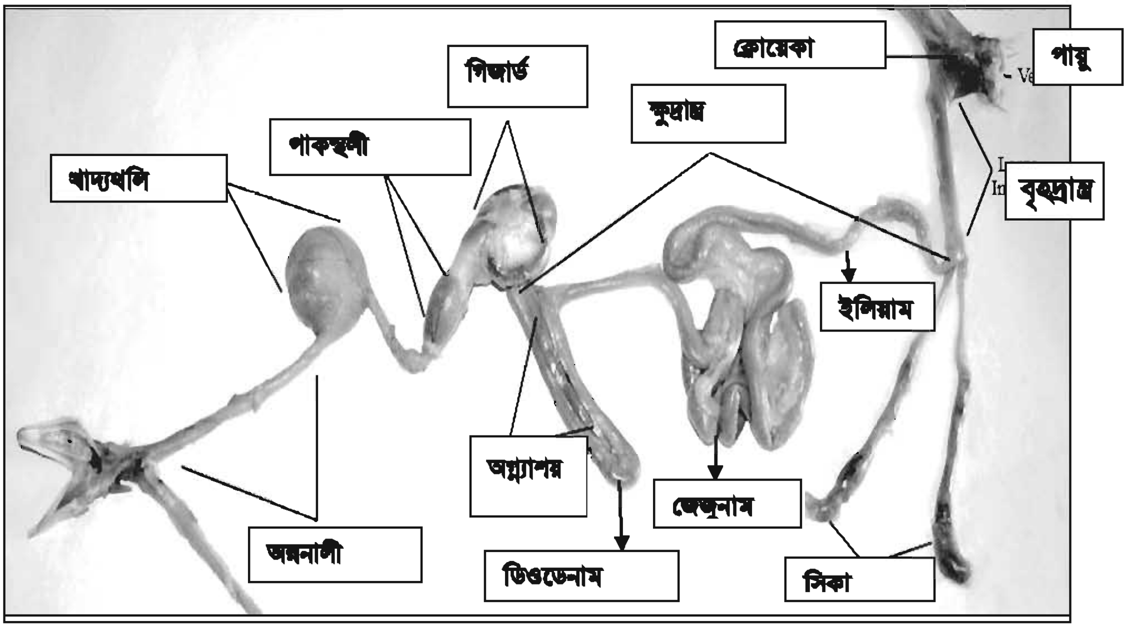

চিত্র : ২.১ মুরগির পরিপাকতন্ত্র

মুরগির পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ:

১. মুখ ও মুখগহব্বর	৬.ক্ষুদ্রান্ত্র:ক.ডিওডেনাম, খ.জেজুনাম	৯. সাহায্যকারী গ্রন্থিঃ
২. খাদ্যনালী	ও গ.ইলিয়াম	ক) যকৃৎ
৩. খাদ্য থলে	৭.বৃহদান্ত্র: ক.সিকাম, খ.কোলন	খ) অগ্ন্যাশয়
৪. প্রোভেন্টি কুলাস	গ. রেকটাম	গ) পিওথলি
৫. গিজার্ড	৮.অবসারণী	ঘ) প্লীহা

নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দাও :

১. পরিপকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লিখ।
২. পরিপাকতন্ত্রের সাহায্যকারী গ্রন্থিগুলোর নাম লেখ?
৩. ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশগুলোর নাম লেখ।

২০২০

জব নং-০৩

জবের নাম : মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের সনাক্তকরণ (প্রজননতন্ত্র)।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মুরগির অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ শারীরিক কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে প্রজননতন্ত্রের গঠন ও কাজ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এই অঙ্গ ডিম ও বাচ্চা উৎপাদনের মূল ভূমিকা রাখে। জবটিতে মোরগ-মুরগির দেহ ব্যবচ্ছেদ করে প্রজননতন্ত্র পৃথক করে এগুলোর বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করে তাদের গঠন ও কাজ সম্পর্কে জানা হয়।

উদ্দেশ্য :

৪) প্রজননতন্ত্রর বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে ;
৫) প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবে ;
৬) প্রজনন অঙ্গের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১। কাঁচি (ছোট ও বড়)
২। চিমটা
৩। ক্লিপ ও পিন
৪। মোম ট্রে

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। একটি মোরগ ও একটি মুরগি
২। পলিথিন
৩। টেবিল
৪। অ্যাপ্রোন
৫। দস্তানা
৬। কাগজ, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

৮) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ কর।
৯) নিরাপত্তামূলক পোশাক যেমন অ্যাপ্রন ও দস্তানা পরে নাও।
১০) সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে মোরগ-মুরগি জবাই কর।
১১) জবাইয়ের পর রক্ত ঝরা শেষে মোরগ ও মুরগিকে দুইটি পৃথক ট্রেতে আলাদাভাবে চিৎ করে স্থাপন কর।
১২) ধারালো চাকু দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করে অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত কর।
১৩) প্রজননতন্ত্র আলাদা কর।
১৪) এবার প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে চিহ্নিত কর।

২০২০

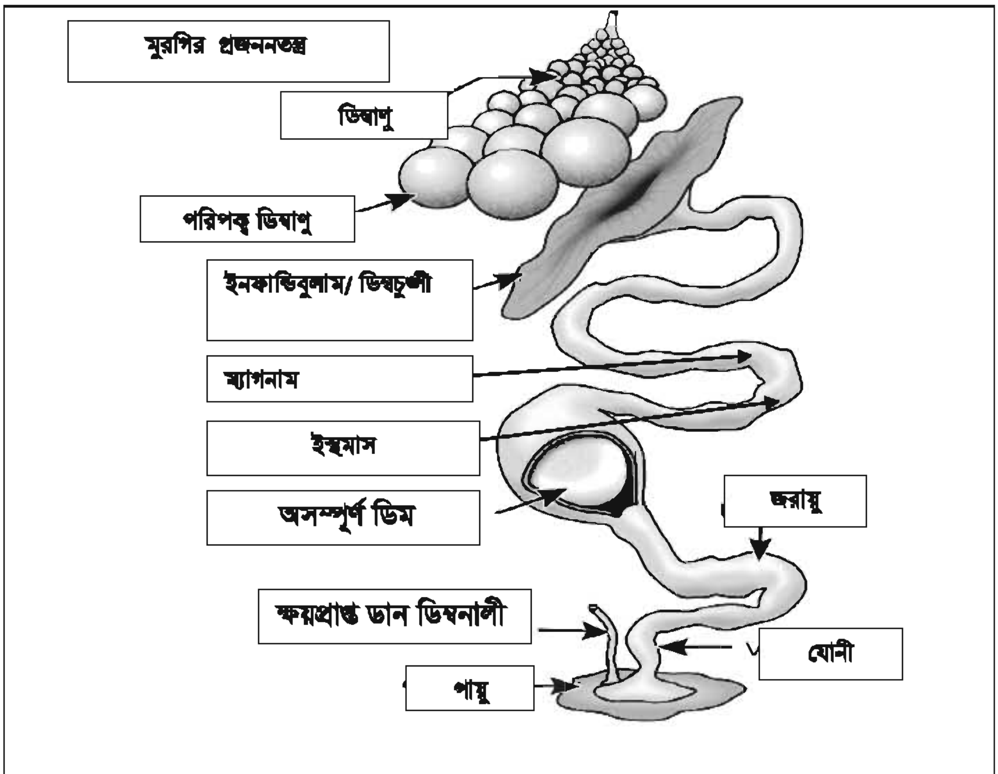

চিত্র : ৩.১ মোরগির প্রজননতন্ত্র

মোরগের প্রজননতন্ত্র :

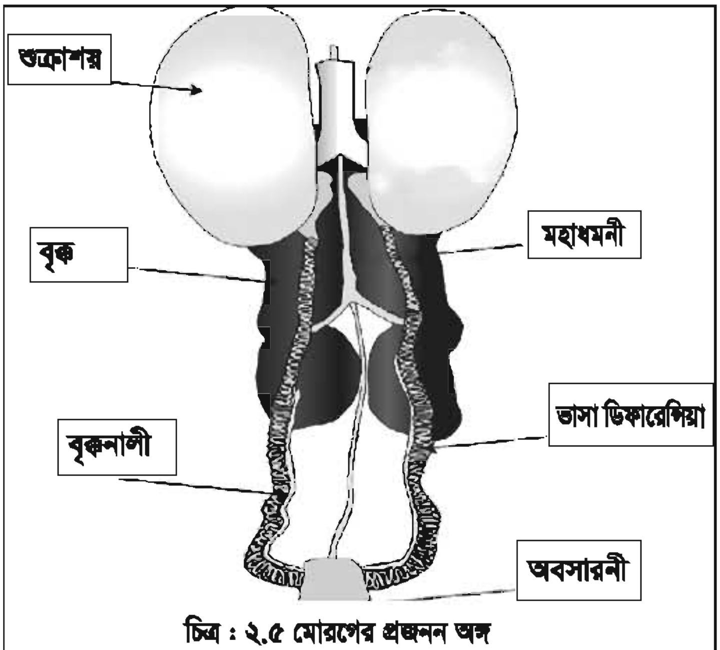

চিত্র : ২.৫ মোরগের প্রজনন অঙ্গ

২০২০

(ক) স্ত্রী ও পুরুষ প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশসমূহঃ

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র	পুং-প্রজননতন্ত্র
১) ডিম্বাশয়	১. শুক্রাশয় (টেস্টিস)
২. ম্যাগনাম	২. শুক্রনালী
৩ ফানেল	৩. প্যাপিলি
৪ ডিম্বনালি	
৫. ক্লোয়েকা	

সাহায্যকারী গ্রন্থিসমূহঃ

- প্রোস্টেট গ্রন্থি
- ইউরেথ্রাল গ্রন্থি

সতর্কতা :

১) মুরগি ধরা ও জবাই করার সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ কর যাতে পরীক্ষণ করলে ছোটাছুটি না করে এবং আহত করতে না পারে।

২) সাবধানে ব্যবচ্ছেদ কর যাতে কোনো অংশ ছিঁড়ে না যায়।

৩) প্রজননতন্ত্র যত্ন সহকারে আলাদা কর যেন সকল অংশ চেনা যায়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) শুক্রনালী দেখতে কেমন ও এর কাজ কী?

২) ডিম্বানালী কয়টি অংশ ও কী কী?

২০২০

জব নং-০৪

জবের নাম : মুরগির জাত সনাক্তকরণ

জবের বর্ণনা :

উৎপত্তি, উৎপাদন ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের মুরগি পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি জাতের মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। জবটিতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত মুরগির জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেমন উৎপত্তি, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। পরীক্ষণ কালে সকল জাত সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে বইপত্র ও ম্যাগাজিন থেকে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পোস্টার ও স্লাইড করে তা প্রদর্শন করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) বাহ্যিক উৎপাদান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুরগির জাত শনাক্ত করতে পারবে।
২) উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুরগির জাত শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।
৩) পালনের উদ্দেশ্য অনুসারে মুরগির জাত বাছাই করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) ওভারহেড প্রজেক্টর
২) স্লাইড প্রজেক্টর
৩) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগি
২) মুরগি রাখার খাঁচা
৩) অ্যাপ্রোন
৪) দস্তানা
৫) বিভিন্ন জাতের মুরগির তথ্য সম্পর্কীয় বই ও ম্যাগাজিন।
৬) প্রয়োজনীয় স্লাইড।
৭) ও.এইচ. পি. শীট
৮) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি
৯) ডিজিটাল কনটেন্ট

কাজের ধারা :

১) বিভিন্ন জাতের মুরগি সংগ্রহ করে পাশাপাশি খাঁচায় সাজিয়ে রাখ।
২) সম্ভব না হলে তাদের প্রয়োজনীয় ছবি, তথ্যযুক্ত স্লাইড ও মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট সংগ্রহ কর।
৩) বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ কর।
৪) নিরাপত্তামূলক পোশাক যেমন অ্যাপ্রন ও দস্তানা পরে নাও।
৫) বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগি ধরে এগুলোর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করে সংগৃহীত তথ্যের সাথে মিলিয়ে নাও।

৬) মোরগ-মুরগির জাতগুলো উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং পালনের উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণি বিভাগ কর।

৭) বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগির ছবি এঁকে সেগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ কর।

উৎপত্তিস্থলের ভিত্তিতে মোরগ-মুরগিকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়

১. আমেরিকান জাত : প্লাইমাউথ রক, রোড আইল্যান্ড রেড,নিউ হ্যাম্পশায়ার ।

২. ভূমধ্যসাগরীয় জাত : লেগহর্ন, মিনর্কা, আনকোনা, ফাইওমি ।

৩. ইংলিশ জাত : অস্ট্রালর্প, কর্নিশ, সাসেক্স

৪. এশিয়ান জাত : ব্রাহমা, কোচিন,আসিল ,ল্যাংশ্যান

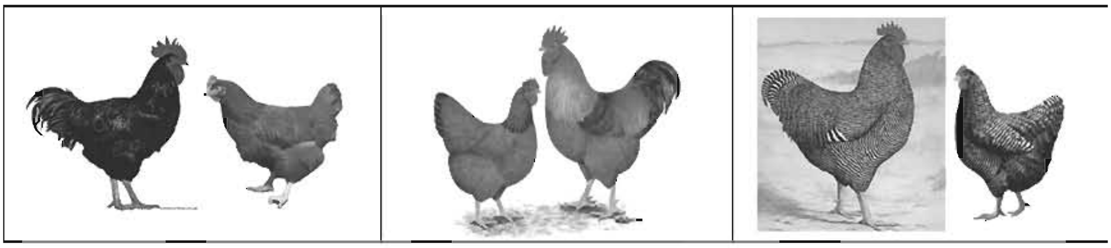

চিত্র-৪.১ রোড আইল্যান্ড রেড (মোরগ-মুরগি) প্লাইমাউথ রক (মোরগ-মুরগি) নিউহ্যাম্পশায়ার (মোরগ-মুরগি)

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ-

- এদের পায়ের নালা পালকবিহীন
- কানের লতি লাল রঙের
- এরা ডিম ও মাংস উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী
- গায়ের চামড়া হলুদ রঙের
- ডিমের খোসার রঙ বাদামি
- এরা আকারে মাঝারি
- বছরে ১৫০-২০০টি ডিম দেয়।

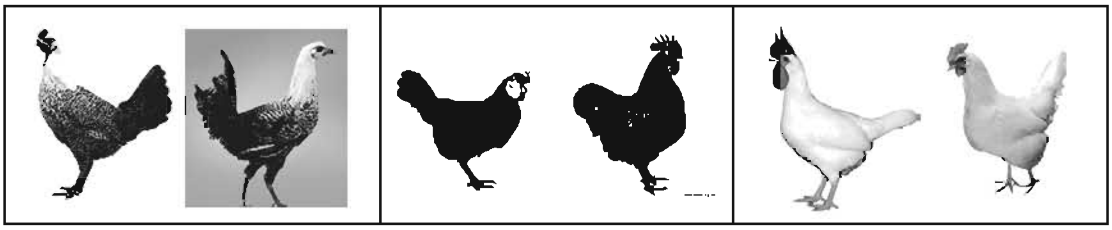

চিত্র : ৪.২ ফাওমি মিনর্কা হোয়াইট লেগহর্ণ

২০২০

ভূমধ্যসাগরীয় জাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

- পায়ের নলা পালকহীন।
- পালক আটসাঁট ও দেহের সাথে সুবিন্যস্ত।
- আকারে ছোট।
- কুঁচে হওয়ার অভ্যাস নেই।
- অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ডিম দেয়।
- ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- পায়ের চামড়ার রং সাদা অথবা হলুদ।
- কানের লতি সাদা রঙের।
- ডিমের খোসা সাদা।
- বৎসরে ২০০-২৫০টি ডিম দেয়।

ব্রিটিশ জাত:

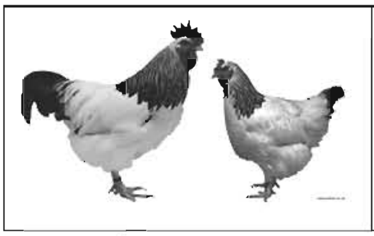

চিত্র ৪.৩ সাসেক্স

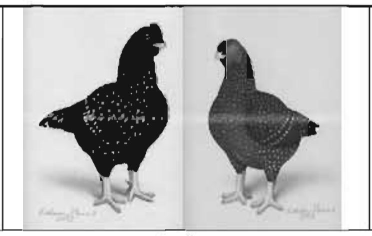

কর্নিশ

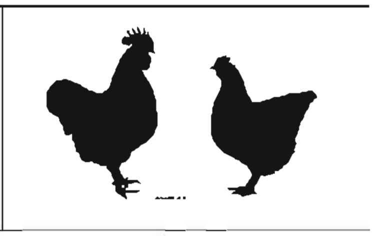

অস্ট্রালর্প

বৈশিষ্ট্যসমূহ :

এগুলোর পায়ের নলা পালকবিহীন।

- এরা আকারে মাঝারি ।
- মাংস ও ডিম উৎপাদন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার উপযোগী।
- কর্নিশ এবং রেড ক্যাপ ছাড়া সবগুলো জাতের গায়ের চামড়ার রঙ সাদা ও কানের লতি লাল।
- ডরকিং এবং রেডক্যাপ ছাড়া সবগুলো জাতের ডিমের খোসার রঙ বাদামি ।
- বছরে ১০০-১৫০টি ডিম দেয়।

এশিয়াটিক জাত:

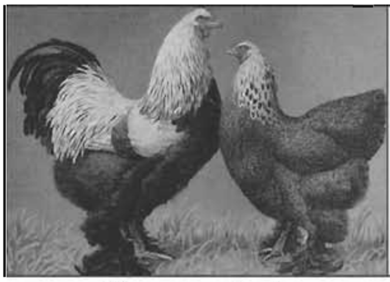

চিত্র ৪.৪ ব্রাহমা

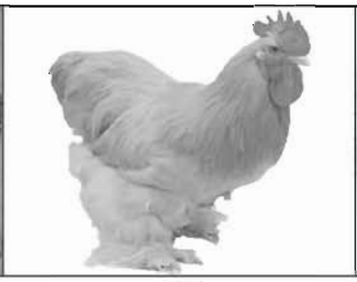

কোচিন

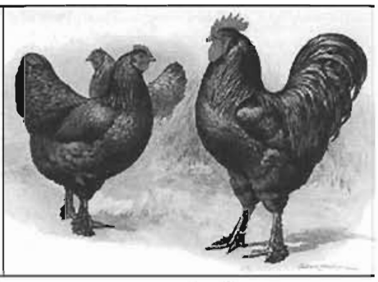

ল্যাংশ্যান

২০২০

বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পায়ের নলায় পালক থাকতে পারে।
- কানের লতি লাল।
- ডিমের খোসার রং বাদামি।
- পায়ের চামড়া হলুদ।
- অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে।
- কুঁচে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ডিম উৎপাদনের হার কম, বছরে ৪০-৬০টি ডিম দেয়।

৮) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ কাজ শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যথা স্থানে সংরক্ষণ কর।

সতর্কতা :

১) বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগি পৃথকভাবে রেখে সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন এক জাতের সাথে অন্য জাত মিশে না যায়।

২) মুরগি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন ছুটে না যায় ও গায়ে বিষ্ঠা না লাগে।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) ডিম পাড়ার জন্য কোন কোন জাতের মুরগি পালন করা হয়?

২) মাংস উৎপাদনের জন্য কোন জাতের মুরগি পালন করা উচিত?

৩) সাদা খোসা ও বাদামি খোসার ডিম দেয় এমন কয়েকটি জাতের নাম লিখ।

জব নং -০৫

জবের নাম : ব্রয়লার খামারের প্রকল্প প্রণয়ন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

বাণিজ্যিক খামার লাভজনকভাবে পরিচালনা জন্য একটি ভালো খামার পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে উপকরণসমূহের বর্তমান বাজারদর যাচাই করা হয় এবং তাদের আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ পৃথকভাবে চিহ্নিত করে বাস্তবতার সাথে সংগঠিত রেখে আয় ব্যয়ের হিসাব করে লাভ ক্ষতি নিরূপণ করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) ক্যালকুলেটর
২) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি
৩) বিভিন্ন উপকরণের বাজারদর
৪) কাগজ, কলম, পেন্সিল।

কাজের ধারা :

১) খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ কর
২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও কাঁচামালের সঠিক বাজার দর সম্পর্কিত তথ্য জেনে নাও
৩) খামার পরিকল্পনার খাতসমূহ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ কর
৪) প্রথমে স্থায়ী খাতের সম্ভাব্য ব্যয়সমূহ হিসাব কর
৫) এরপর আবর্তক খাতের সম্ভাব্য ব্যয়গুলো হিসাব কর ও মোট ব্যয় লিপিবদ্ধ কর
৬) পরবর্তীতে খামারের আয়ের খাতগুলো হিসাব করে মোট আয়ে হিসাব কর
৭) খামারের মোট আয় থেকে মোট ব্যয় হিসাব করে নীট লাভ বের কর
৮) খামার পরিকল্পনার হিসাব পুনরায় নিরীক্ষা করে দেখ তা সঠিক আছে কিনা

নিম্নে ১০০০ মুরগির ব্রয়লার খামারের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব প্রদান করা হলো-

স্থায়ী খরচ :

ক্রমিক নং	খরচের খাত	বিবরণ	টাকা
১	জমি	নিজস্ব	-
২	ব্রয়লার ঘর	১০০০ মুরগি ১.৫ বর্গফুট (প্রতি বঃফুটের খরচ) ১৫০০বঃফুঃ×৮০০/-	১২০০,০০০.০০
৩	অফিস কাম স্টোর রুম	২০০বঃফুঃ×৩০০/- (প্রতি বঃফুট)	৬০,০০০.০০
৪	যন্ত্রপাতি	ক) হাইগ্রোমিটার ও থার্মোমিটার খ) খাদ্য পাত্রঃ বড় ৫০টি × ৫০/- ছোট ২০টি ×৪০/- গ) পানির পাত্র : ছোট ১০টি ×৩০/- বড় ২৫টি×৫০/-	১০০০.০০ ২৫০০.০০ ৮০০.০০ ৩০০.০০ ১২৫০.০০
৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি	(কোদাল, বেলচা, বালতি ইত্যাদি)	১০০০.০০
৬	আসবাব		৫০০০.০০
৭	চট/পর্দা		১০০০.০০
	মোট		১২৭২৮৫০.০০

২০২০

আবর্তক খরচঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
১	বাচ্চা ক্রয় ১০২০টি (২% মৃত) x ৪০.০০ (প্রতিটি)	৪০৮০০.০০
২	খাদ্য ক্রয়ঃ ১০০০টি x ৩.৫ কেজি (খাদ্য/ ব্রয়লার) x৪০/-(প্রতি কেজি মূল্য)	১৪০০০০.০০
৩	লিটার ২৫ বস্তা x ১৫০/- (প্রতি বস্তার মূল্য)	৩,৭৫০.০০
৪	ঔষুধপত্র ও টিকা ১০০০টি x ৩.০০(প্রতি ব্রয়লারের জন্য)	৩,০০০.০০
৫	শ্রমিক খরচ (আনুমানিক)	৬০০০.০০
৬	বিদ্যুৎ খরচ ও পানির বিল	১০০০.০০
৭	অবচয়: (১২৭২৮৫০x১৫%)/৮ব্যাচ=২৩৮৬৬.০০	২৩৮৬৬.০০
৮	ব্যাংক সুদ: (১২৭২৮৫০x১৪%)/৮ব্যাচ=২২২৭৫.০০ ১৪%=০.১৪	২২২৭৫.০০
৯	অন্যান্য	০০
১০	মোট:	২৪০৬৯১.০০

আয়ের খাতঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
১	ব্রয়লার বিক্রি : ১০০০x২ কেজি (ওজন)x১৩৫/- (প্রতি কেজি মূল্য)	২,৭০,০০০.০০
২	লিটার ও বস্তা বিক্রি ৫০x১৫০/-(প্রতি বস্তার মূল্য)	৭,৫০০.০০
৩	মোট	২,০৭,৫০০.০০

লাভের হিসাব :

মোট আয়	২,০৭,৫০০.০০
মোট ব্যয়	২৪০৬৯১.০০
নীট লাভ	৩৩১৯১.০০

কথায় : (মোট তেত্রিশ হাজার একশ একানব্বই টাকা মাত্র)

সতর্কতা :

১) প্রতিটি খাতের হিসাব চলতি বাজার দর হিসেবে করতে হবে। কারণ খাদ্য ও উপকরণের বাজারদর খুবই ওঠানামা করে।

২) হিসাবগুলো পুনরায় সাবধানতার সাথে যাচাই করা প্রয়োজন যাতে ভুল না হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) খামার পরিকল্পনায় আবর্তক ব্যয়ের খাতগুলো কী কী?

২) অবচয় মূল্য কীভাবে হিসাব করবে?

৩) নীট লাভ কীভাবে হিসাব করা হয়?

২০২০

জব নং-০৬

জবের নাম : ব্রয়লার পালন কক্ষ প্রস্তুতকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

লাভজনক ব্রয়লার পালন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে কক্ষ প্রস্তুতকরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত না হলে উৎপাদন মারাত্বক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এজন্য উদ্দেশ্য ও পালন পদ্ধতি অনুসারে ব্রয়লারের মুরগির ঘর তৈরি করে তাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) লাভজনক ব্রয়লার উৎপাদন করতে পারবে

২) স্বাস্থ্যসম্মত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে পারবে

৩) রোগজীবাণু ও ধকল এর প্রভাব কমিয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবে

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) বীকার, মাপচোঙ

২) ফ্যান

৩) অ্যাগজস্ট ফ্যান

৪) হাইগ্রোমিটার

৫) থার্মোমিটার

৬) চিকগার্ড

৭) হোভার।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) জীবাণুনাশক : সুপারসেপ্ট, ফিনল, ডেটল ইত্যাদি

২) ঝাড়ু

৩) বেলচা

৪) বালতি

৫) মগ

৬) রশি

৭) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

৮) ফরমালডিহাইড (৪০%)

৯) মাটি/কাচের পাত্র।

কাজের ধারা :

১) ব্রয়লার পালনের জন্য নির্ধারিত ঘরটি ভালোভাবে পরিষ্কার কর।

২) ঘরের সমস্ত ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন : খাবার পাত্র, পানির পাত্র, হোভার, চিকগার্ড, ব্রুডার, বালতি, মগ, নিক্তি ইত্যাদি ভালোভাবে ধুয়ে নাও।

২০২০

চিত্র ৬.১ : উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার

৩) জীবাণুনাশক দিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত কর এবং রোদে শুকিয়ে নাও।
৪) ঘর জীবাণুনাশক (প্রস্তুতকারকের নিদের্শনা মোতাবেক) দিয়ে বা প্রয়োজনে ফিউমিগেশন করে জীবাণু মুক্ত কর।
৫) লিটার ৫% পটাশ মিশ্রিত পানিতে হালকা ভিজিয়ে পরে তা রোদে শুকানোর পর ওজনের ১% হারে চুন ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত কর।
৬) ঘরে লিটারসহ অন্যান্য দ্রব্য স্থাপন কর।
৭) বাচ্চা (ব্রয়লার) ঘরে স্থাপনের অন্তত ৩৬/৪৮ ঘন্টা পূর্বে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ও অন্যান্য দ্রব্য স্থাপন করে কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ কর।
৮) ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব ও একটি ফ্যান স্থাপন কর।
৯) হাইগ্রোমিটার ও থার্মোমিটার বাচ্চার মাথা বরাবর উচ্চতায় চিকগার্ড ও হোভারের মাঝে স্থাপন কর।
১০) ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় খাদ্য ও পানির পাত্র স্থাপন কর।
১১) ঘরে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি চালু করে তা সঠিকভাবে কার্যকর কীনা তা পরীক্ষা কর।
১২) এর পর ঘরে ব্রয়লার বাচ্চা পালনের জন্য ছেড়ে দাও।

সতর্কতা :

১) জীবাণুনাশক নির্ধারিত মাত্রায় কম/বেশি ব্যবহার করা যাবে না।
২) ফিউমিগেশন করার সময় দ্রুত স্থান ত্যাগ কর ও ঘর বায়ুরোধী করার ব্যবস্থা নাও।
৩) লিটার/বিষ্টা খামার হতে নিরাপদ দূরে সরিয়ে রাখ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) ব্রয়লার ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে?
২) হাইগ্রোমিটার ও থার্মোমিটার কোথায় স্থাপন করবে?
২০২০ ৩) লিটার কীভাবে জীবাণুমুক্ত করবে?

জব নং-০৭
জবের নাম : ব্রয়লার ঘরে যন্ত্রপাতি স্থাপন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

সফলভাবে ব্রয়লার পালন করতে ব্রয়লার ঘরে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র, থার্মোমিটার, ব্রুডার, ফ্যান, লাইট ইত্যাদি ব্রয়লারের সংখ্যা অনুসারে সঠিক সংখ্যায় উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়, যাতে ঘরের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত থাকে।

উদ্দেশ্য :

১) ছাত্র/ছাত্রীরা ব্রয়লার পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারবে।
২) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও স্থাপন কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) ব্রুডার
২) থার্মোমিটার
৩) হাইগ্রোমিটার
৪) ফ্যান
৫) অ্যাগজস্ট ফ্যান
৬) লাইট

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) লিটার
২) পেপার (পুরাতন)
৩) চিকগার্ড
৪) খাদ্য পাত্র
৫) পানিরপাত্র

কাজের ধারা :

১) ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করে নাও।
২) মেঝেতে লিটার স্থাপন কর।
৩) বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে মেঝেতে ব্রুডার স্থাপন কর।
৪) ব্রুডারের চারদিকে ঘিরে চিকগার্ড স্থাপন কর।
৫) হোভারের নিচে লিটারের উপর খবরের কাগজ বিছাও।
৬) খবরের কাগজের উপর প্রয়োজনমাফিক খাদ্য ও পানির পাত্র স্থাপন কর।

চিত্র : ৭.১ ব্রয়লার ঘরে যন্ত্রপাতি সহ ব্রুডার স্থাপন

চিত্র ৭.২: ব্রয়লার ঘরে যন্ত্রপাতি স্থাপন

৭) মুরগির বুক সমান উচ্চতায় থার্মোমিটার ঝুলিয়ে দাও।

সাবধানতা :

১) চিকগার্ড গোলাকার করে স্থাপন করতে হবে।
২) সাবধানে যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর যেন নষ্ট না হয় এবং আহত না হও।।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) ব্রুডার কী?
২) চিকগার্ড কেন দেওয়া হয়।
৩) ব্রয়লার ঘরে থার্মোমিটার কেন স্থাপন করা হয়?

২০২০

জব নং-০৮

জবের নাম : ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

পায়ে পালক না থাকায় বাচ্চা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সেজন্য তাদের কৃত্রিম ভাবে তাপ প্রদান করা হয় যাকে ব্রুডিং বলে। এক্ষেত্রে শীতের দিনে সাধারণত ৪ সপ্তাহ এবং গরমের দিনে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করা প্রয়োজন। ব্রয়লার বাচ্চাকে ব্রুডিং এর পাশাপাশি খাদ্য, পানি, আলোকদান, টিকা প্রদান ও ঔষুধ প্রয়োগসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) বাচ্চাকে ঠান্ডা হতে রক্ষা করার কৌশল জানবে।
২) ব্রয়লার ঘরের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারবে।
৩) ব্রয়লারের সঠিক ওজন নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) ব্রুডার
২) টিকাদানের প্রয়োজনীয় সিরিঞ্জ/ভ্যাকসিনেটর
৩) হাইগ্রোমিটার
৪) থার্মোমিটার

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) লিটার
২) পেপার
৩) খাদ্য পাত্র
৪) পানির পাত্র
৫) খাদ্য
৬) টিকা
৭) ঔষধপত্র
৮) বেলচা, কোদাল, ঝাড়ু
৯) অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

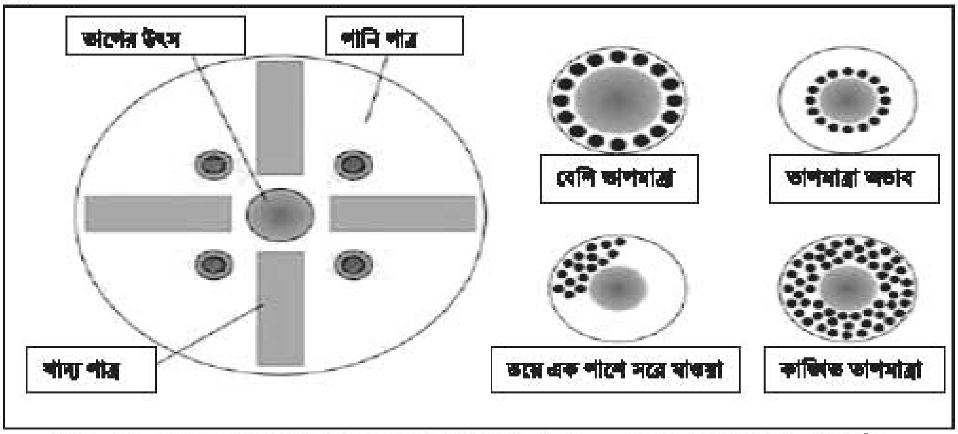

চিত্রঃ-১১.৫ খাদ্য ও পানি পাত্র স্থাপন এবং বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

কাজের ধাপ :

১) ব্রয়লার পালনের উপযোগী একটি ঘর নির্বাচন কর ।

২) ব্রুডিং হাউজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করে নাও।

৩) ব্রুডিং ঘরে পরিষ্কার ও শুকনো লিটার ৩-৪ পুরু করে বিছিয়ে নাও।

৪) ব্রুডিং ঘরের সুবিধাজনক স্থানে ব্রুডার, চিকগার্ড, হাইগ্রোমিটার, থার্মোমিটার ইত্যাদি সঠিকভাবে স্থাপন কর। সাধারণত ধারণ ক্ষমতা অনুসারে ৩০০-৪০০ বাচ্চার জন্য ১টি ব্রুডার প্রয়োজন।

৫) চিকগার্ডের ভিতরে পেপার বিছিয়ে তার উপর প্রয়োজনীয়সংখ্যক খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র স্থাপন কর।

৬) চিকগার্ডের ভেতরে বাচ্চা ছাড়ার ১২ ঘণ্টা পূর্বে ভিতরে কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা নিশ্চিত কর।

৭) প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা উঠলে খাদ্য ও পানি দেবার পর চিকগার্ডের মধ্যে একদিনের বাচ্চা ছাড় ও নিম্নের তালিকা মোতাবেক সপ্তাহভিত্তিক তাপমাত্রা নিশ্চিত কর।

বাচ্চার বয়স (সপ্তাহ)	ব্রুডিং তাপমাত্রা		মন্তব্য
	ডিগ্রি ফারেনহাইট (^0F)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (^0C)	
১	৯৫	৩৫	শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ ও গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করানো হয়। এর পর বাচ্চা প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।
২	৯০	৩২	
৩	৮৫	২৯	
৪	৮০	২৭	
৫	৭৫	২৪	
৬	৭০	২১	

৮. ব্রুডিংকালে তাপমাত্রা কম-বেশি হলে বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

৯. ব্রুডিং কালে বাচ্চাকে তালিকা মোতাবেক প্রয়োজনীয় স্টাটার রেশন ও বিশুদ্ধ পানি পরিবেশন কর।

১০. নির্ধারিত তালিকা মোতাবেক ঔষুধপত্র ও টিকা প্রদান কর।

১১. ৩-৪ সপ্তাহ পর ব্রুডার এবং চিক গার্ড সরিয়ে ফেল ।

১২. সূচি মোতাবেক টিকা ও ঔষুধ প্রদান কর।

১৩. বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি যথাযথ হচ্ছে কীনা খেয়াল রাখ।

১৪. মুরগির বিষ্ঠা নিয়মিত পরিষ্কার কর।

১৫. সকল তথ্য রেকর্ডশীট ও রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ কর।

সতর্কতা :

১) ব্রুডিং তাপমাত্রা যাতে কম-বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২) ওষুধ ও টিকা প্রদানের সময় পদ্ধতি ও মাত্রা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩) কোনো বাচ্চা অসুস্থ্য কীনা তা শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে সরিয়ে ফেল।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) ব্রুডিং তাপমাত্রা কম-বেশি হলে বাচ্চার অবস্থান দেখে তা কীভাবে বুঝা যায়?

২) ব্রুডিং-এর সময় বাচ্চা যাতে লিটার খেয়ে না ফেলে সেজন্য কী ব্যবস্থা নেবে?

৩) ব্রুডারের তাপমাত্রা কম হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

জব নং-০৯

জবের নাম : লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

সাধারণত লিটার পদ্ধতিতেই ব্রয়লার পালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্রয়লারের মাঝে খাদ্য গ্রহণ কম-বেশি হওয়ায় দরুন ওজন কম-বেশি হয়। লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালনের ক্ষেত্রে ব্রুডিং হতে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাপনা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন, খাদ্য ও পানি প্রদান, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ, টিকা ও চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি অনুশীলন করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) স্বল্প ব্যয়ে সহজভাবে লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন করতে পারবে।
২) আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, খাদ্য প্রদানসহ অন্যান্য সেবা সহজে ও সুষমভাবে প্রদান করতে পারবে।
৩) প্রাপ্ত লিটার উত্তম জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) থার্মোমিটার
২) হাইগ্রোমিটার
৩) নিক্তি
৪) সিরিঞ্জ
৫) ব্রুডার

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) ব্রয়লার
২) লিটার
৩) খাবার পাত্র
৪) পানির পাত্র
৫) হোভার
৬) চিকগার্ড
৭) পেপার (পুরাতন)
৮) টিকা
৯) ঔষুধ (প্রয়োজনীয়)

কাজের ধারা:

১. ঘর তৈরি কর (প্রতি ব্রয়লারের জন্য ১ ব. ফুট করে জায়গা)।
২. ঘর পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত কর।
৩. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ স্থাপন কর।

২০২০

ক) লিটার স্থাপন কর।
খ) মেঝেতে খবরের কাগজ বিছাও।
গ) ব্রুডার স্থাপন প্রতি ৩০০-৪০০ বাচ্চার জন্য ৪ফুট ব্যাসের ১টি ব্রুডার স্থাপন কর।
ঘ) থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটার স্থাপন কর।
ঙ) খাবার পাত্র (২৫ টির জন্য ১টি) ও পানির পাত্র (৫০টির জন্য ১টি) স্থাপন কর।

৪. যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ কর।
৫. যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ঠিক থাকলে খামারে বাচ্চা প্রতিস্থাপন কর।

চিত্রঃ লিটার পদ্ধতিতে ব্রয়লার পালন

৬. দৈনন্দিন করণীয় কার্যাবলি সঠিকভাবে পালন কর।

- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার কর
- তালিকা মোতাবেক খাদ্য ও পানি প্রদান কর।

পুষ্টিমান	স্টারটার	ফিনিসার
শক্তি (কিলো ক্যাল./ কেজি)	২৯০০-৩০০০	৩০০০-৩২০০
আমিষ (%) ২২-২৩ ২০-২১	২২-২৩	২০-২১

- নিয়মিত লিটার উলট-পালট কর।
- তাপমাত্রা, আলো ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ কর।
- তাপমাত্রা : প্রথম সপ্তাহে ৩৫° সে. পরবর্তী প্রতি সপ্তাহে করে কমে ২০° সে. এ নিয়ে আসো।
- আর্দ্রতা : আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০-৬৫% নিয়ন্ত্রন কর।
- আলোক প্রদান : প্রথম ২ দিন ২৪ ঘন্টা আলো দিতে হবে, ৩-৭ দিন ২৩ ঘন্টা ও ২য় সপ্তাহ থেকে মাঝে মাঝে আলো নিভিয়ে পুনরায় জ্বালাও।

৭. সূচি মোতাবেক টিকা ও ওষুধ প্রদান কর।
৮. বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি যথাযথ হচ্ছে কীনা খেয়াল রাখো।
৯. মুরগির বিষ্ঠা নিয়মিত পরিষ্কার কর।
১০. সকল তথ্য রেকর্ডশীট ও রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ কর।
১১. সঠিক সময়ে বাজারজাত কর।

সতর্কতা :

১) খাদ্য ও পানি প্রদানের সময় ও পরিমাণ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২) ওষুধ ও টিকা প্রদানের সময়,পদ্ধতি ও মাত্রা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩) লিটারের গুণাগুণ সঠিকভাবে খেয়াল রাখ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) প্রয়োজনের তুলনায় কম মেঝের জায়গা দিলে কী হবে?

২) লিটার জমাট বেঁধে গেলে কী করবে?

৩) ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত থাকা ভাল?

জব নং-১০

জবের নাম : ব্রয়লার খাদ্য উপকরণসমূহ শনাক্তকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ব্রয়লার খামারের খাদ্য খরচ প্রায় ৬০-৭০%। আর উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করে সুষম রেশন তৈরি করে খাওয়ালেই ব্রয়লারের কাঙ্ক্ষিত ওজন নিশ্চিত করা সম্ভব। সেজন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমূহের সঠিক গুণাগুণ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এদের ব্যবহার বিধি ও মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১) ব্রয়লার রেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ শনাক্ত করতে পারবে।

২) খাদ্য উপকরণসমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি তথ্য জানতে পারবে।

৩) খাদ্য উপকরণসমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপকরন

২) প্লাস্টিকের জার (ট্রান্সপারেন্ট)

৩) মার্কার

৪) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি

কাজের ধারা :

১. বাজার ও বিভিন্ন উৎস থেকে ব্রয়লার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ কর

২. খাদ্য উপকরণসমূহের সঠিক পুষ্টিমান বই পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ কর।

৩. খাদ্য উপাদানসমূহের উৎকৃষ্ট মান যাচাই কর যেমন– দানাদার অবস্থা, আর্দ্রতা, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি সঠিকভাবে আছে কীনা যাচাই কর।

২০২০

বাংলাদেশে সাধারণত নিম্নলিখিত খাদ্য উপাদানসমূহ পোল্ট্রি খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যাদের পুষ্টিমানের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো :

শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান

গম

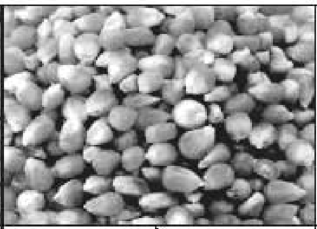

ভুট্টা

রাইস পোলিশ

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	শক্তি (কি. ক্যাল/ কেজি)	আমিষ (%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১	গম/ গম ভাঙ্গা	৩০০০	১২	০.০৪	০.৩৭
২	ভুট্টা/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩৩০০	০৯	০.০১	০.২৫
৩	রাইস পোলিশ	৩১০০	১২	০.০৬	১.৩০
৪	৪. গমের ভুসি	১৪৬০	১৫	০.১৫	১.২০

আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান

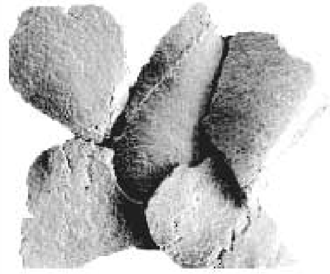

সরিষার খৈল

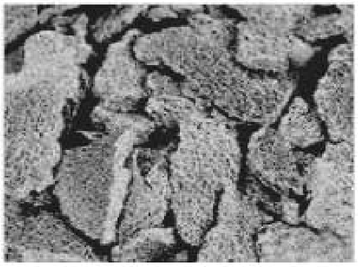

তিলের খৈল

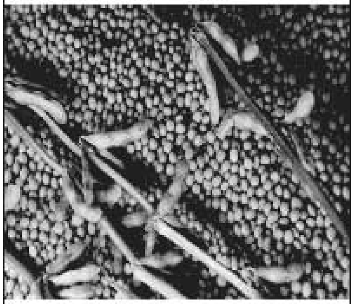

সয়াবিন মিল

শুঁটকি মাছ (দেশি)

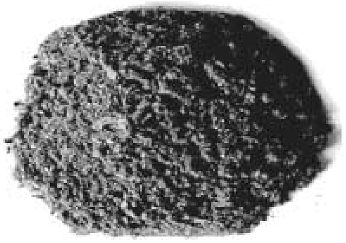

শুঁটকি গুঁড়া

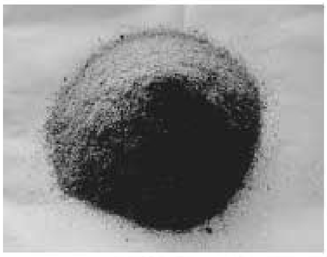

প্রোটিন কনসেনট্রেট

২০২০

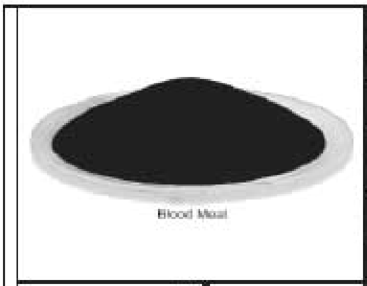

বোন মিল

বাদাম

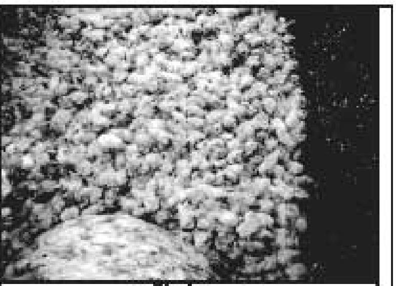

পোল্ট্রি উপজাত

১	তিলের খৈল	১৬৩০	৩২	২.০০	১.২০
২	সরিষার খৈল	১৭৯০	৩৫	০.৭০	০.৯০
৩	নারিকেল খৈল	১২৮০	২৩	০.১৮	০.৬০
৪	বাদাম খৈল	২৬৫০	৪৫	০.১৬	০.৫৬
৫	সয়াবিন ভাজা	৩৩০০	৩৭	০.২৫	০.৫৮
৬	সয়াবিন মিল	২২০০	৪৪	০.২০	০.৬০
৭	ফিশ মিল (বিদেশি)	২৯৩০	৬০	৫.৫০	৩.৩০
৮	শুঁটকি মাছ (দেশি)	২৮০০	৫০	৭.১৬	২.৮২
৯	প্রোটিন কনসেনট্রেট	২৩৫০	৫০	১০	৪.৫
১০	রক্তের গুঁড়া	২৭৫০	৮৫	০.৩০	০.২৫

সয়াবিন তেল

চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদান

১	সয়াবিন তেল	৮৮০০	-	-	-

খনিজ জাতীয় খাদ্য উপাদান

এছাড়াও পোল্ট্রি খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম ভিটামিন ও খনিজ উৎস, ছত্রাক ও টক্সিন বাইন্ডার, এনজাইম, কৃত্রিম অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন :

ক) ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স- জি এস, ডব্লিউ এস এবং এল

খ) ছত্রাক বাইন্ডার- মোল্ড স্টপ, সরবাটক্স
গ) টক্সিন বাইন্ডার-ডট, ইএসবি-৩
ঘ) কৃত্রিম অ্যামাইনো এসিড- লাইসিন, মিথিওনিন
ঙ) ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি

৪. প্রতিটি উপাদানের পুষ্টিমান সঠিকভাবে জেনে নিয়ে মান ও ব্যবহার অনুযায়ী গ্রুপে ভাগ করে লিপিবদ্ধ কর।
৫. এরপর প্রতিটি খাদ্য উপাদানের নমুনা পৃথকভাবে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জারে রেখে তার গায়ে নাম লিখে রাখ।
৬. কাজ শেষে কক্ষটি পরিষ্কার করে খাদ্য উপাদানসহ প্লাস্টিকের জারগুলো সুন্দরভাবে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা জায়গায় সাজিয়ে রাখ।

সতর্কতা :

১) কোনো ভাবেই ভেজাল বা নিম্নমানের খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে না।
২) নির্ভরযোগ্য উৎস থাকে খাদ্যের পুষ্টিমান সংগ্রহ করতে হবে।
৩) খাদ্য উপকরণসমূহ সঠিকভাবে লেবেলিং করে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে যাতে সহজে নষ্ট না হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) শর্করা জাতীয় ৩টি খাদ্য উপকরণের নাম ও পুষ্টি মান লেখ।
২) হাড়ের গুঁড়া কোন জাতীয় খাদ্য ও তা কীভাবে চিনবে?
৩) সয়াবীন মিলের সাথে সয়াবিন ভাঙা কীভাবে পার্থক্য করবে? এদের পুষ্টিমানের পার্থক্য কত?

২০২০

জব নং-১১

জবের নাম : ব্রয়লারের সুষম রেশন তৈরি

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

বয়স অনুসারে ব্রয়লারকে সাধারণত তিন ধরনের খাদ্য প্রদান করা হয়। যথা- ব্রয়লার স্টারটার গ্রোয়ার ও ফিনিশার। তবে বর্তমানে অনেক খামারে শুধুমাত্র ব্রয়লার স্টারটার ও গ্রোয়ার রেশন ব্যবহার করা হয়। এ জন্য ব্রয়লারের নির্দিষ্ট বয়স ও নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান হিসাবে সকল ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে সুষম রেশন তৈরি করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) বয়স অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সুষম রেশন তৈরি।
২) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক খাদ্য সরবরাহ করা।
৩) খামারে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা।
২) খাদ্য উপকরণগুলোর পুষ্টিমানের তালিকা।
৩) নির্বাচিত খাদ্য উপকরণসমূহ।
৪) ক্যালকুলেটর, কাগজ, পেন্সিল, কলম ।
৫) পলিথিন শীট।
৬) ওজন মাপার যন্ত্র।
৭) বেলচা, বস্তা ইত্যাদি

কাজের ধারা :

১) বয়স ও উৎপাদন অনুযায়ী ব্রয়লার রেশনের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা সংগ্রহ কর।
২) বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপানের পুষ্টি তালিকা সংগ্রহ কর।
৩) সকল ধরনের পুষ্টি উপাদানযুক্ত খাদ্য উপকরণসমূহ ব্যবহার করে সুষম রেশন ফরমুলেশন কর।
৪) ফরমুলেশনকৃত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য উপাদানসমূহ মেপে পৃথক পৃথক পাত্রে রাখ।
৫) কম পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমূহ একত্রে ভালোভাবে মিশাও।
৬) এরপর কম পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বেশি পরিমাণে উপাদানসমূহের সাথে মিশাও।
৭) খাদ্য উপাদান মিশানো শেষ হলে পুনরায় ভালোভাবে উল্টেপাল্টে মিশিয়ে দেও যাতে সকল উপাদান সমভাবে মিশ্রিত হয়।
৮) তৈরিকৃত খাদ্য ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় বস্তায় সংরক্ষণ কর । মিশ্রিত খাদ্য ঋতু ভেদে ৭-১০ দিন সংরক্ষণ করা যাবে।
৯) নিম্নে ব্রয়লার মুরগির নমুনা খাদ্য অনুযায়ী রেশন তৈরি কর।

২০২০

ব্রয়লার খাদ্য তালিকা:

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	প্রিস্টারটার (০-১৪ দিন)	স্টারটার (১৫-২৮ দিন)	ফিনিশার (২৮-বিক্রি পর্যন্ত)
১	ভুট্টা ভাঙ্গা (কেজি)	৫৪	৫৭	৫৪
২	সয়াবিন মিল (কেজি)	২৭	২৮	২৬.৫
৩	রাইস পলিশ (কেজি)	১২	০৭	১০
৪	প্রোটিন কনসেনট্রে ৬০%(কেজি)	০২	-	-
৫	বোনমিল মিটমিল ৫০% (কেজি)	০২	০৫	০৫
৬	সয়াবিন তেল (কেজি)	১.৭৮	১.৫৮	২.৮
৭	ডিসিপি(কেজি)	-	০.১৮	০.১০
৮	ক্যালসিয়াম প্রিমিক্স (কেজি)	০.২৯	০.৪১	০.৩৫
৯	লবণ (কেজি)	০.৩২	০.৩৪	০.৩৪
১০	সোডিয়াম বাই কার্বনেট (কেজি)	০.০৫	-	০.২১
১১	ভিটামিন প্রিমিক্স (কেজি)	০.২৫	০.২৫	০.২৫
১২	এনজাইম (কেজি)	০.১০	০.১০	০.১০
১৩	কক্সিডিওস্ট্যাট (কেজি)	০.০৫	০.০৫	০.০৫
১৪	সালকিন/সালষ্টপ (কেজি)	০.১০	০.১০	০.১০
১৫	সর্বাটক্স/মল্ডষ্টপ (কেজি)	০.০৫	০.০৫	০.০৫
১৬	মিথিওনিন	০.১৮	০.২৪	০.১৬
১৭	লাইসিন	-	০.০৮	-
	মোট	১০০	১০০	১০০

সতর্কতা :

১) কম পরিমাণে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ খুবই সাবধানতার সাথে মাপতে হবে ও মিশাতে হবে যাতে সকল খাদ্যের সাথে সমভাবে মিশে যায়।

২) রেশন ফরমুলেশনের সময় হিসাব বারবার যাচাই করতে হবে যেন ভুল না হয় ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) আদর্শ রেশন তৈরিতে কেন ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ব্যবহার করা হয়?

২) অল্প পরিমাণে ব্যবহার খাদ্য উপাদনসমূহ কীভাবে মিশানো হয়?

৩) ব্রয়লার রেশনে সয়াবিন তেল মিশানো হয় কেন?

জব নং-১২
জবের নাম : ব্রয়লার পালনে প্রতিষেধক টিকা প্রদান

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ব্রয়লার খামারে রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে খামারে রোগ প্রতিরোধ করে লাভজনক ব্রয়লার পালন নিশ্চিত করা যায়। ব্রয়লার খামারে সাধারণত রানীক্ষেত ও গামবোরো রোগের টিকা প্রদান করা হয় এবং হ্যাচারি কর্তৃক মারেক্স রোগের টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। খামারে সরকারি বা বেসরকারি উৎস থেকে টিকা সংগ্রহ করে প্রস্তুতকারকের নির্দেশ মোতাবেক টিকা প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) খামার রোগমুক্ত রাখতে পারবে।
২) খামারে মৃত্যু হার কমিয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবে।
৩) চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) সিরিঞ্জ

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) বিসিআরডিভি (রানীক্ষেত) রোগের টিকা
২) গামবোরো রোগের টিকা
৩) পাতিত পানি/ডায়লুয়েন্ট
৪) বীকার
৫) ড্রপার
৬) মাপ চোঙ

কাজের ধারা :

১) বিশ্বস্ত উৎস থেকে রানীক্ষেত ও গামবোরো রোগের টিকা সংগ্রহ কর
২) নিরাপত্তামূলক পোশাক যেমন- অ্যাপ্রোন, দস্তানা ও গামবুট পরিধান কর।
৩) টিকা প্রদানে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নাও।
৪) সূচি মোতাবেক ব্রয়লার শেডে যাও।
৫) দিনে ঠান্ডা অংশে (সকাল বা সন্ধ্যা) ছায়াযুক্ত স্থানে টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ মোতাবেক পাতিত পানির সাথে মিশ্রিত কর।
৬) এরপর বাচ্চা মুরগিকে সঠিকভাবে ধরে আয়ত্বে এনে নিম্নলিখিতভাবে টিকা প্রদান করি।

রানীক্ষেত টিকা প্রদান পদ্ধতি :

ক) ১০০ মাত্রার ভায়াল ৬ সিসি পাতিত পানিতে মেশাও। বেসরকারি টিকা হলে প্রস্তুতকারক কর্তৃক ডায়লুয়েন্ট সাথে মিশাও। খ) প্রতি বাচ্চাকে ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোঁটা করে টিকা দাও। গ) এই ভ্যাকসিন ৩-৭ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ কর।	

চিত্রঃ রানীক্ষেত টিকা

২০২০

গামবোরো টিকা প্রদান

ক) টিকাবীজ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়ালুয়েন্টের সাথে মিশাও।

খ) ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোটা করে প্রয়োগ কর।

গ) সাধারণত: ৩-১১ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৮-২১ দিন বয়সে ২য় ডোজ প্রয়োগ কর।

চিত্র : গামবোরো টিকা

৭) টিকাদানকৃত বাচ্চাকে পৃথক করে রাখ।
৮) গরমকালে ১ ঘন্টা ও শীত কালে ২ ঘন্টার মধ্যে টিকাদান শেষ কর।
৯) অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল পুঁতে ফেল।

সতর্কতা :

১) নির্ধারিত মাত্রার কম বা বেশি টিকা প্রদান করা যাবে না।
২) অসুস্থ মুরগিকে টিকা দেওয়া যাবে না।
৩) টিকা ছায়াযুক্ত স্থানে বসে প্রদান করতে হবে।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) অসুস্থ মুরগিকে টিকা দিলে কী সমস্যা হবে?
২) টিকা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় কেন?
৩) অবশিষ্ট টিকা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হয় কেন?
৪) রানীক্ষেত টিকার প্রয়োগমাত্রা ও সময় লিখ।
৫) বুস্টার ডোজ কি?

জব নং-১৩

জবের নাম : ব্রয়লার ড্রেসিং পদ্ধতি

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

খামারের উৎপাদিত জীবন্ত ব্রয়লারকে খাওয়ার উপযোগী করে বাজারজাত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্রয়লার জবাই করার পর রক্ত ঝরানো, পালক ছড়ানো, নাড়িভুঁড়ি আলাদা করা এবং চাহিদার ভিত্তিতে অঙ্গসমূহ আলাদা করে প্যাকেটজাত করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) উৎপাদিত ব্রয়লার নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় গ্রাহকের নিকট পৌছাতে পারবে।
২) সহজে পরিবহন ও বেশি সময় সংরক্ষণ করতে পারবে।
৩) চাহিদা মোতাবেক প্যাকেটজাত ব্রয়লার গ্রাহকের কাছে পৌছাতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) ইলেট্রিক ডিফিদারিং মেশিন
২) ডিপ ফ্রিজ

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) ব্রয়লার
২) অ্যাপ্রন, দস্তানা ও গামবুট
৩) পানি গরম করার পাত্র
৪) প্যাকেট করার কাগজ
৫) ছুরি, কাচি, চাকু ও অন্যান্য উপকরণ

চিত্র ১৩.১ : ব্রয়লার ড্রেসিং

২০২০

কাজের ধারা :

১) নিরাপত্তামূলক পোশাক পরে নাও।
২) জীবন্ত ব্রয়লার খাঁচায় করে প্লান্টে এনে খাঁচা থেকে বের করে পা দুটি লোহার কড়ায় ঝুলিয়ে দাও।
৩) ঝুলানো ব্রয়লার ধারালো চাকু দিয়ে জবাই কর এবং সম্পূর্ণ রক্ত ঝরা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখ।
৪) লোহার কড়া থেকে নামিয়ে ব্রয়লার গরম পানিতে ২/৩ মিনিট চুবানোর পর তা তুলে আনো।
৫) ইলেকট্রিক ডিফিদারিং মেশিন বা হাতের সাহায্যে পালক ছাড়িয়ে নাও।
৬) ব্রয়লারের শরীরের ছোট পালকসমূহ চাকু বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে উঠিয়ে ফেল ।
৭) বুকের অংশ কেটে নাড়িভুঁড়ি ও পায়ু আলাদা কর।
৮) ফুসফুস, বৃক্ক, প্রজননতন্ত্রসহ অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ আলাদা কর।
৯) মাথা, পালক, শরীর থেকে অপসারণ কর।
১০) অবশিষ্ট অঙ্গসমূহ ধৌত কর।
১১) ড্রামস্টিক, রান, বুকের মাংস, পাখা ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কেটে আলাদা কর।
১২) ওজন করে প্যাকেটজাতকরণ ও প্যাকেটে লেবেল লাগাও।
১৩) বরফজাতকরণ বা ফ্রিজিং করে বাজারজাতকরণের জন্য সংরক্ষণ কর।

সতর্কতা :

১) জবাই করার পর পুরোপুরি রক্ত ঝরার জন্য অপেক্ষা কর।
২) ছোট পালক ভালোভাবে ছাড়াও যাতে পরবর্তীতে দেখা না যায়।
৩) নির্ধারিত তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত মাংস সংরক্ষণ কর যেন নষ্ট না হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) ব্রয়লার জবাই করার পর রক্ত সম্পূর্ণভাবে না ঝরলে কী সমস্যা হবে?
২) পালক ছাড়ানোর পূর্বে গরম পানিতে কেন চুবানো হয়?
৩) প্যাকেটজাত মাংসের মোড়কে কী কী লিখে লেবেল লাগাতে হবে?

জব নং-১৪

জবের নাম : ব্রয়লারের প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

কোনো উৎপাদিত দ্রব্য উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছাতে যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় তাই বাজারজাতকরণ। ব্রয়লার সাধারণত দুইভাবে বাজারজাত করা হয় যথা- জীবন্ত ব্রয়লার ও ড্রেসড ব্রয়লার। এক্ষেত্রে ব্রয়লার ধরে জবাই করা থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছাতে যে সকল ধাপ অনুসরণ করতে হয় তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) ব্রয়লার মানসম্পন্ন অবস্থায় ভোক্তার নিকট পৌঁছাতে পারবে।
২০২০
২) ব্রয়লার বাজারজাত করতে অনুসৃত ধাপসমূহ সঠিকভাবে অনুসরন করতে পারবে।
৩) ব্রয়লার বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সমূহ অনুশীলন করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) নিক্তি
২) ড্রেসিং মেশিন
৩) প্যাকেজিং মেশিন
৪) চিলিং মেশিন
৫) রেফ্রিজারেটর
৬) ছুরি
৭) চাকু

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) ব্রয়লার
২) ব্রয়লার পরিবহনের খাঁচা

৩) ফুড গ্রেড প্যাকেজিং সামগ্রীর তালিকা:

নিম্নে কতগুলো ফুড গ্রেড প্যাকেজিং সামগ্রীর উদাহরণ দেওয়া হলো:

- প্লাস্টিকের ফিল্ম (Plastic film)
- Polythene Terephthdate or PET
- পেপার, পেপার বোর্ড ও ফয়েল (Paper, paper board & foil)
- লেমিনেটেড পেপার (Laminated Paper)
- টেট্রা প্যাক (Tetra Pak)
- প্লাস্টিক টিউব অথবা বোতল (Plastic Tube or Bottle)
- কাঁচের (Glass) জার বা বোতল
- সেলোফেন ও পলিভিনাইল ক্লোরাইড (Cellophane & PVC)
- পলিইথিলিন Polyethylene (PE)
- পলি প্রপাইলিন Polypropylene (PP)
- পলি এমাইড Polyamid (PN) or Nylon
- পলিস্টাইরিন Polystyrene (PS)
- পলিকার্বনেট (Polycarbonate)
- Ethyl vinyl Alcohol (EV-OH)
- Poly vinyl Alcohol (PVAL)
- সেলুলোজ এসিটেট Cellulose Acetate (CA)
- ইথিলিন ভিনাইল এসিটেট (Ethylene vinyl Acetate)

৪) মার্কিং কলম
৫) ঝুড়ি

ব্রয়লার সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বাজারজাত করা হয় :

১) জীবন্ত পদ্ধতিতে বাজারজাতকরণ।
২) ড্রেসড পদ্ধতিতে বাজারজাতকরণ।

জীবন্ত পদ্ধতি বাজারজাত করণ :

জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বাজারজাত করা হয়।
ক) খামার থেকে পাইকারি ক্রেতার নিকট বিক্রি করা।
খ) খামার থেকে সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রি করা।

ক. খামার থেকে পাইকারি ক্রেতার নিকট বিক্রি :

১) ব্রয়লার বিক্রিয় উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পাইকারি ক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য ক্রেতা বাছাই কর।
২) সম্ভব্য ক্রেতার সাথে দর কষাকষি করে উপযুক্ত বাজারমূল্য ও বিক্রির তারিখ নির্ধারণ কর।
৩) নির্ধারিত দিনে ব্রয়লার বিক্রির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত কর।
৪) পাইকারি ক্রেতার উপস্থিতিতে ব্রয়লার ওজন করে গ্রেড ভিত্তিক আলাদা করে পাইকারি ক্রেতাকে বুঝিয়ে দাও।

খ. খামার থেকে সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রি :

১) খামার থেকে ব্রয়লার নিয়ে বাজার বা খুচরা বিক্রির স্থানে মেপে বিক্রি করা অনুশীলন করা।

২. ড্রেস পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ক) বিক্রির জন্য তারিখ নির্ধারণপূর্বক ব্রয়লারগুলোকে একত্রিত করে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আন ।
খ) ব্রয়লারগুলো জবাই করে সম্পূর্ণ রক্ত ঝরা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।
গ) সঠিকভাবে ড্রেসিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ড্রেসিং সম্পন্ন কর।
ঘ) ড্রেসড ব্রয়লারগুলো গ্রেডিং ও ওজন করে প্যাকেজাত করে প্যাকেটে লেবেল লাগাও।
ঙ) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (০-৪ সে তাপমাত্রায়) ড্রেসড করে সংরক্ষণ কর।
চ) চাহিদা মোতাবেক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারি বিক্রেতার নিকট পৌঁছে দাও।

সাবধানতা :

১. ব্রয়লারগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আন যাতে জবাই করা সহজ হয়।
২. রক্ত ঝরা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যাতে মাংসের গুণ ঠিক থাকে।
৩. সংরক্ষণের সময় সঠিক তাপমাত্রা নিশ্চিত কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) জীবন্ত ও ড্রেসড কীভাবে গ্রেডিং করা হয়?
২) ড্রেসড ব্রয়লারের প্যাকেটের লেবেল কী কী বিষয় উল্লেখ করবে?

২০২০

জব নং-১৫

জবের নাম : ব্রয়লার খামার পরিদর্শন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

সুষ্ঠুভাবে খামার পরিচালনা ও নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হবার জন্য বিভিন্ন ধরনের খামার পরিদর্শন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খামারের অভিজ্ঞতা থেকে খামার পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। এজন্য যে খামার পরিদর্শন করা হবে তার পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পূর্বে তৈরিকৃত প্রশ্নোত্তর শীটের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) নতুন প্রযুক্তি ও লাভজনক ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচিত হবে।
২) বিভিন্ন খামারের অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) যাতায়াতের জন্য পরিবহন ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) চেক লিস্ট/প্রশ্নমালা

কাজের ধারা :

১) প্রথমে একটি আদর্শ খামার বাছাই করে তাদের সাথে যোগাযোগ কর।
২) খামার কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিদর্শনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ কর।
৩) নির্দিষ্ট তারিখ সময় অনুযায়ী খামারে হাজির হও।
৪) খামারে প্রবেশের সময় নিজেকে জীবাণুমুক্ত করে নির্ধারিত পোশাক পরে খামারে প্রবেশ কর।
৫) কর্তৃপক্ষের গাইডলাইন মোতাবেক খামার পরিদর্শন কর।
৬) খামার পরিদর্শনকালে নিচের চেক লিস্ট অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ কর।

নিম্নে খামার পরিদর্শনের নমুনা প্রশ্নোত্তর শীট তৈরি করে সে মোতাবেক তথ্য সংগ্রহ কর :

খামার পরিদর্শনের তথ্যাবলি:

১. খামারের নাম :
২. খামারের ঠিকানা
৩. মালিকের নাম :
৪. খামারের প্রকার : বাণিজ্যিক/পারিবারিক :
৫. অর্থ জোগানের উৎস :
৬. খামারে মুরগির ধরণ :
৭. জাত/হাইব্রিডের নাম :
৮. পালন পদ্ধতি :
৯. মুরগির বয়স:

২০২০

১০. মুরগির সংখ্যা
১১. ঘরের সংখ্যা ও আকার :
১২. বর্তমান উৎপাদন অবস্থা :
১৩. খাদ্য ও পানি পাত্রের সংখ্যা :
১৪. দৈনিক খাদ্য প্রদানের তথ্যাবলি :

নাম	পরিমাণ
শক্তি	
আমিষ	
ক্যালসিয়াম	
ফসফরাস	
লাইসিন	
মিথিওনিন	

১৫. পানি, আলো, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :
১৬. লিটারের অবস্থা :
১৭. মুরগির স্বাস্থ্যগত অবস্থা :
১৮. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথ্যাবলি :
১৯. খামারের রোগ নিয়ন্ত্রণ (জীব নিরাপত্তা) ব্যবস্থা :
২০. খামারের কৃমি মুক্তকরণ, ওষুধ প্রয়োগ ও টিকাদান ব্যবস্থাপনা :
২১. মুরগির মৃত্যুহার :
২২. খামারের রেকর্ডপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ ব্যবস্থা :
২৩. উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা :
২৪. খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব :
২৫. লিটারের ব্যবস্থাপনা :
২৬. মৃত মুরগির সৎকার ব্যবস্থা :

৭) খামার পরিদর্শন শেষে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে খামার ত্যাগ কর।

সতর্কতা :

১) খামারে প্রবেশের সময় অবশ্যই নিজেকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
২) সাবধানে খামার পরিদর্শন করতে হবে যাতে খামারের কোনো ক্ষতি না হয়।
৩) খামার পরিদর্শনকালে কোনো বিব্রতকর প্রশ্ন করা যাবে না।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১) খামার পরিদর্শনপূর্বক কেন খামার মালিকের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন?
২) পরিদর্শনকৃত খামারের কোন বিষয়টি তোমার নিকট নতুন ও ইতিবাচক বলে মনে হয়েছে?
৩) পরিদর্শনকৃত খামারের সীমবদ্ধতা বা দুর্বল দিক কী কী?

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

দ্বিতীয় পত্র (বিষয় কোড-৮০২৩)

দশম শ্রেণি

২০২০

দ্বিতীয় পত্র
প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশে প্রাপ্ত লেয়ার হাইব্রিড পরিচিতি

বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প দ্রুত বর্ধনশীল একটি সেক্টর। আমাদের দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৩৮ ভাগ আসে মুরগির মাংস ও ডিম থেকে। লেয়ার ডিম উৎপাদনকারী একটি মুরগির বিশেষ জাত যা পোল্ট্রি শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। সঠিকভাবে লেয়ার পালন করে মূলধন লগ্নিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়ে জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে পায়। লেয়ার মুরগি পালনে অধিক জায়গার প্রয়োজন হয় না। তাই লেয়ার পালন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হতে পারে ও জীবিকা নির্বাহের একটি উপায় হিসেবে দেশে বেকার যুবক ও নারীদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎসের পাশাপাশি তাদের পরিবারে প্রাণিজ আমিষের অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই লেয়ার পালন শুরুর আগে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত লেয়ার পালনের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.১ লেয়ার কী :

ডিম উৎপাদনের জন্য যেসব মুরগি পালন করা হয় সেগুলোকে ডিম পাড়া মুরগি বা লেয়ার বলে। অধিক ডিম উৎপাদনশীল বিশুদ্ধ জাতের মোরগ-মোরগির মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রজননের মাধ্যমে লেয়ার হাইব্রিড তৈরি করা হয়, যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ডিম উৎপাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে নতুন লেয়ার হাইব্রিড সোনালি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। যা এখনো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যায়নি। বিদেশ থেকে প্যারেন্ট স্টকের একদিনের বাচ্চা এনে বড় করে তাদের পাড়া ডিম ফুটিয়ে বিভিন্ন স্ট্রেইনের লেয়ার হাইব্রিড বাচ্চা উৎপাদন করা হয় এবং খামারিদের মাঝে বিক্রি করা হয়। এই প্যারেন্ট স্টকের মুরগি ডিমপাড়া শেষে বাতিল হয় এবং নতুন করে আবার প্যারেন্ট স্টক এর একদিনের বাচ্চা আনতে হয়। তবে বর্তমানে কিছু হ্যাচারি বা ব্রিডার ফার্ম গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক বাইরে থেকে নিয়ে এসে এদেশে পালন করায় প্যারেন্ট স্টকের একদিনের বাচ্চা কমমূল্যে তাদের কাছ থেকে অন্যান্য হ্যাচারি কিনতে পারছে।

১.২ লেয়ার হাইব্রিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

১. ডিম উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে বছরে ২৮০-৩২০টি।
২. ১৮-২০ সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সবগুলো মুরগি একই সাথে ডিম উৎপাদন শুরু করে।
৩. এদের ডিমের ওজন দেশি মুরগির চেয়ে ১০-১৫ গ্রাম বেশি (৫০-৬০g)
৪. কুঁচে ভাব কম থাকে।
৫. ডিম উৎপাদনের সময়কালে পালক ছাড়ে না।

চিত্র : -১.১ হাই সেক্স ব্রাউন　　হাই লাইন　　হাই সেক্স ব্রাউন

২০২০

ডিমের খোসার রঙের উপর ভিত্তি করে লেয়ারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১) সাদা ডিম উৎপাদানকারী জাত : পালকের রং সাদা ও ৪ মাস বয়সের পুলেটের ওজন ১-১.২৫ কেজি।

২) রঙিন ডিম উৎপাদনকারী জাত : পালকের রং বাদামি ও ৪ মাস বয়সের পুলেটের ওজন ১-১.২ কেজি।

১.৩ বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাইব্রিড লেয়ার ও এদের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম :

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	লেয়ার হাইব্রিড-এর নাম
আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	স্টার ক্রস ৫৭৯
কাজী হ্যাচারি	স্টার ক্রস ৫৭৯
প্যারাগন পোল্ট্রি লিঃ, গাজীপুর	স্টার ক্রস ৫৭৯
সি.পি বাংলাদেশ কোং লিঃ	হাই সেক্স ব্রাউন
নারিশ পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিঃ, গাজীপুর	হাই সেক্স ব্রাউন
ভিক্টর ব্রিডার, ফরিদপুর	হাই সেক্স ব্রাউন
ব্র্যাক হ্যাচারি	ব্রাউন নিক
এস এম পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম	বোভানস এভিয়ান
ঢাকা হ্যাচারি লিঃ	হাই লাইন
ফিনিক্স হ্যাচারি লিঃ	বিভি-৩৮০ ব্রাউন
মডান হ্যাচারি	স্টার ক্রস ৫৭৯
সিলভার কার্প লিঃ	ইসা ব্রাউন
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	স্টার ক্রস ব্রাউন
উষা পোল্ট্রি লিঃ	ইসা ব্রাউন
কাজলী খামার লিঃ	স্টার ক্রস ব্রাউন
এগস্ অ্যান্ড হেনস্	হাই সেক্স
ইউনাইটেড ফুড কমপ্লেক্স লিঃ	ইসা ব্রাউন
গাচিহাটা একোয়া কমপ্লেক্স	ব্যাবোলনা টেট্রা এস এম
মেসার্স গোয়ালন্দ হ্যাচারিজ	নিক চিক

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল মুরগির বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	উৎপাদনশীল মুরগি	কম উৎপাদনশীল মুরগি
শৌর্যবীর্য	সতেজ ও সবল	দুর্বল ও ভীরু
জাতের বৈশিষ্ট্য	শরীরের আকার চারকোণাকার	ত্রিকোণাকার
ঝুঁটি ও ফুল	বড়, লাল, মসৃণ ও নরম	লম্বা, পাতলা ও খসখসে
ঠোঁট	মোটা ও বাঁকা	লাল,হালকা ও সরু
চোখ	বড়, উজ্জ্বল ও সজাগ	ছোট ও ঝিমিয়ে পড়া
কানের লতি	বড়, তেলতেলে ও নরম	সংকুচিত ও খসখসে
গলা	মোটা ও খাটো	লম্বা ও পাতলা
দেহ	বড় ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন	ছোট ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ
পিঠ	আয়তনে বড় ও সোজা	আয়তন কম ও বাঁকা
পার্শ্ব	প্রস্থে বড় বা গভীর	প্রস্থে কম বা লম্বা
বুকের হাড়	লম্বা ও স্বাভাবিকভাবে ক্রমশ বাঁকা	খাটো ও বেশি বাঁকা
বস্তির হাড়	ছড়ানো ও পাতলা	খুব কাছাকাছি ও মোটা
চামড়া	পাতলা, নরম ও তেলতেলে	মোটা শুকনো ও খসখসে
পেট	বড়, নরম ও চর্বিহীন	ছোট, শক্ত ও চর্বিযুক্ত

মল ও মূত্রদ্বার	বড়, পুরু ও ভেজা ছোট,	শুকনো ও চর্বিযুক্ত
পালক	ময়লাযুক্ত, ভাঙা ও উসকোখুসকো	পরিষ্কার ও আস্ত
পা	মজবুত, খাটো, দুইপায়ের মাঝে ফাঁক বেশি	লম্বা, সরু, দুইপা খুব কাছাকাছি
স্বভাব	তৎপর,সজাগ ও বন্ধুভাবাপন্ন	লাজুক ও ভীরু
পালক বদলানো	দেরিতে এবং দ্রুত পালক বদলায়	আগে এবং ধীরে পালক বদলায়
কুঁচে হওয়া	মোটেই কুঁচে হয় না বা খুব কম হয়	বছরে দুই বা ততোধিকবার কুঁচে হয়
বছরে ডিম দেওয়ার সময়	বছরের শেষ দিন পর্যন্ত ডিম দেয়; আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ডিম দেয়	আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের আগে ডিম দেওয়া বন্ধ করে দেয়

১.৪ লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগির বৈশিষ্ট্য :

লেয়ার মুরগির বৈশিষ্ট্য:-

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য	লেয়ার মুরগি
১	আকৃতি	বড়
২	মাথার ঝুঁটি	বড়, লাল, পুরু, উজ্জ্বল
৩	চোখ	উজ্জ্বল, বড়
৪	খাদ্যথলি	পূর্ণ
৫	পেট	ভরাট ও নরম
৬	চামড়া	পাতলা, নমনীয়
৭	পালক	উজ্জ্বল, চকচকে
৮	ডানা	শক্তভাবে শরীরের সাথে মিশে থাকে
৯	গলার ফুল	বিশেষ প্রবর্ধিত, মোমের মতো মসৃণ

ননলেয়ার মুরগির বৈশিষ্ট্য :

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য	ননলেয়ার মুরগি
১	আকৃতি	ছোট
২	মাথার ঝুঁটি	ছোট, ফ্যাকাসে, খসখসে
৩	চোখ	ছোট, ঘোলাটে, অনুজ্জ্বল
৪	খাদ্যথলি	খালি
৫	পেট	শক্ত ও অপ্রশস্ত
৬	চামড়া	মোটা, গোলাকার, শুকনা ও খসখসে
৭	পালক	অনুজ্জ্বল
৮	ডানা	আলতোভাবে মিশে থাকে
৯	গলার ফুল	সংকুচিত ও শুষ্ক
১০	সতর্কতা	কম সতর্ক
১১	মলদ্বার ছোট	গোলাকার, শুষ্ক
১২	বুকের হাড় ও পাছার হাড়ের দূরত্ব	দুই আঙুলের কম

২০২০

১.৫ লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগির পার্থক্য :

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য	লেয়ার মুরগি	ননলেয়ার মুরগি
১	আকৃতি	বড়	ছোট
২	মাথার ঝুঁটি	বড়, লাল, পুরু, উজ্জ্বল	ছোট, ফ্যাঁকাসে, খসখসে
৩	চোখ	উজ্জ্বল, বড়	ছোট, ঘোলাটে, অনুজ্জ্বল
৪	খাদ্যথলি	পূর্ণ	খালি
৫	পেট	ভরাট ও নরম	শক্ত ও অপ্রশস্ত
৬	চামড়া	পাতলা, নমনীয়	মোটা, গোলাকার, শুকনা ও খসখসে
৭	পালক	উজ্জ্বল, চকচকে	অনুজ্জ্বল
৮	ডানা	শক্তভাবে শরীরের সাথে মিশে থাকে	আলতোভাবে মিশে থাকে
৯	গলার ফুল	বিশেষ প্রবর্ধিত,	মোমের মত মসৃণ সংকুচিত ও শুষ্ক
১০	বুকের হাড় ও পাছার হাড়ের দূরত্ব	দুই আঙুলের বেশি	দুই আঙুলের কম

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লেয়ার কী?
২. প্রাণিজ আমিষের শতকরা কত ভাগ ডিম ও মুরগির মাংস থেকে আসে?
৩. লেয়ার বছরে কতটি ডিম পাড়ে?
৪. চার মাস বয়সী পুলেটের ওজন কত?
৫. লেয়ারের ডিমের ওজন কত?
৬. লেয়ার কত সপ্তাহে বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে?
৭. পাঁচটি লেয়ার হাইব্রিডের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লেয়ার হাইব্রিডের সাধারণ বৈশিষ্টগুলো কী?
২. উৎপাদনশীল মুরগির বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩. অনুৎপাদনশীল মুরগির বৈশিষ্ট্য লিখ।
৪. লেয়ার মুরগির বৈশিষ্ট্য লিখ।
৫. ননলেয়ার মুরগির বৈশিষ্ট্য লিখ।
৬. বাংলাদেশে প্রাপ্ত লেয়ার হাইব্রিডগুলোর নাম লিখ?
৭. ডিমের খোসার রঙের উপর ভিত্তি করে লেয়ারকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে লেয়ার বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা হ্যাচারির নাম লিখ।
২. লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগির পার্থক্য লিখ।

২০২০

দ্বিতীয় অধ্যায়
লেয়ার খামার স্থাপন

২.১ লেয়ার খামারের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় :

- খামার তৈরির নির্বাচিত স্থান লোকালয় বা আবাসিক ঘনবসতি এলাকা থেকে দূরে শুষ্ক, উঁচু ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন থেকে হবে।
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অন্য মুরগির খামার বা প্রাণীর ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আশপাশে পচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত থেকে হবে।
- পানি ও বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ডিম উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।
- ডিম বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে।
- ভবিষ্যতে খামারটি সম্প্রসারণ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জমি নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে।
- বন্য জন্তু বা অবাঞ্ছিত লোকজন দ্বারা খামার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন স্থান হবে।
- বিষ্ঠা ও লিটার সরিয়ে ফেলার সুযোগ থাকতে হবে।
- খামার ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাওয়ার সুবিধা থাকতে হবে।
- বেলে দোআঁশ মাটির যুক্ত হবে।

২.২ খামারের অবকাঠামো নির্মাণ

মুরগির ঘর নির্মাণে কোনো ভুল বা ত্রুটি করা চলবে না। মুরগিকে আরামদায়ক পরিবেশ নিরাপদ ও রোগমুক্ত রাখার জন্য ঘরের প্রয়োজন। খোলামেলা উঁচু জায়গায় প্রচুর আলো ও বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের ঘরে মুরগি পালা হয়। যথা :

(১) খোলামেলা ঘর ;

(২) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত ঘর।

লেয়ার খামারের খোলামেলা ঘর তৈরির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

১. ঘরের অবস্থান ও প্রকৃতি :

- এই ঘর দক্ষিণে খোলা থাকে।
- প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘরের খোলামেলা স্থানে পর্দা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
- ঘরের মধ্যে মুরগি আবদ্ধ রাখার জন্য খোলা স্থান জাল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়।
- ঘরে লিটার ধরে রাখার জন্য খোলা স্থানের নিচের অংশ ১-১.৫ ফুট দেয়াল দ্বারা ঘিরে দেওয়া থাকে।
- নিরাপত্তার জন্য সম্পূর্ণ অংশ তারের জাল দ্বারা ঘেরা থাকে।

২. ঘরের প্রশস্ততা :

- সাধারণত ছোট খামার ঘরের প্রশস্ততা খাঁচার আকার অনুসারে করতে হয়।
- লিটার পদ্ধতিতে ঘরের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ১০ ফুট এবং উর্ধ্বে ২৫ ফুট করা যায়।

- বাণিজ্যিক খামার সর্বনিম্ন ৩০ ফুট এবং সর্বাধিক ৪০ ফুট করা যায়।
- ৪০ ফুটের অধিক প্রশস্ত হলে ঘরে ভেন্টিলেশন সমস্যা হয়।
- অধিক প্রশস্ত ঘরে অতিরিক্ত খুঁটি ও পিলার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।
- ঘরের মধ্যে অতিরিক্ত পিলার মুরগির জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম রাখতে অসুবিধা হয় এবং ময়লা পরিষ্কার করতে সমস্যা হয়।
- ঘরের এই প্রশস্ততা বাড়ন্ত মুরগি, লেয়ার মুরগি ও ব্রয়লার মুরগি পালনের উপযোগী।

৩. ঘরের দৈর্ঘ্য :

- যে কোনো পরিমাপের সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য থাকতে হবে।
- স্বয়ংক্রিয় খাদ্যপাত্র স্থাপন করতে হলে খাদ্য সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হয়।
- বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ডিজাইন ও পরিমাপের স্বয়ংক্রিয় খাদ্যপাত্র তৈরি করে।
- স্বয়ংক্রিয় খাদ্যপাত্র ঘরের মাঝ বরাবর স্থাপন করা হয়।

৪. ঘরের উচ্চতা :

- ছোট চালা ঘরের উচ্চতা মেঝে থেকে চালের ছাঁচ সর্বনিম্ন ৬ (ছয়) ফুট এবং ঘরের মেঝের মধ্য বরাবর চালের উচ্চতা ১০ ফুট হওয়া উচিত।
- বাণিজ্যিক খামারে সিলিং বা চালার তল পর্যন্ত সর্বনিম্ন ৮ (আট) ফুট, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য ১০ (দশ) ফুট করা ভালো।
- খাঁচা বা মাচার নিচে ময়লা জমা হওয়ার ব্যবস্থা থাকলে হাইরাইজ ঘর তৈরি করতে হয়। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত হাইরাইজ ঘরের দেয়ালের উচ্চতা ১০ ফুট এবং ঘরের মাঝ বরাবর চালের শীর্ষদেশ ২০ ফুট।

৫. ঘরের চালা :

- ব্যবহারিকভাবে বেশির ভাগ মুরগির জন্য দোচালা টিন বা এসবেসটস্ শিট দ্বারা তৈরি করা হয়। চালের শীর্ষদেশের চাল এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হয়।
- চালের ছাঁচ বাড়ন্ত ও ঝুলন্ত রাখতে হয় (২.৫-৩ ফুট), যেন বৃষ্টির ছাঁট ভিতরে প্রবেশ না করে।
- মুরগির ঘর কংক্রিট ছাদযুক্ত করা যায়।

৬. তাপ নির্গমন :

- ঘরের ভিতর উৎপাদিত দূষিত বাতাস গরম বাতাস ও তাপ নির্গমনের জন্য চালের উপর ব্যবস্থা রাখা হয়।
- গরম বাতাস চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ এগজস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৭. তাপ নিরোধক :

- টিন বা এসবেসটস্ চালাযুক্ত ঘরের তাপ নিরোধক সিলিং ব্যবহার করতে হয়।
- সমস্ত ঘরের এক প্রান্তে সম্ভব বিশেষ তাপ নিরোধক শিট, কাঠ, হার্ডবোর্ড ইত্যাদির সাহায্যে ঠাণ্ডা

স্থান তৈরি করা যায়। এই স্থানের সাথে গম্বুজাকৃতির ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা থাকে। গরমের সময় এখানে মুরগি আশ্রয় নিতে পারে।

৮. ঘরের মেঝে :

- যখন খামারে কোনো বিশেষ রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তখন ঘরের মেঝে অবশ্যই পাকা করা প্রয়োজন।
- যে সমস্ত এলাকায় মাটি ভিজা অথবা দ্রুত আর্দ্রতা শোষণ করে এবং পরিবেশ দ্রুত আর্দ্র হওয়ার আশঙ্কা সেখানে ঘরের মেঝে অবশ্যই পাকা করতে হয়।
- বালু ও কাঁকর মিশ্রিত স্থানে নির্মিত ঘরে কাঁচা মেঝের উপর ব্রয়লার, লেয়ার ও ব্রিডার মুরগি পালন করা যায়।
- খাঁচা বা মাচার নিচে ময়লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে কাঁচা বা পাকা মেঝে নির্মাণ করা যায়।

৯. ঘরের দরজা :

- ঘরের এক প্রান্তে দরজা থাকে।
- বাণিজ্যিক খামারে ঘরের দরজা বড় ও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন।
- বড় ও প্রশস্ত দরজার ভেতর দিয়ে ঘর পরিষ্কার করার সময় ট্রাক্টর ঢুকে ময়লা বের করে নিতে সুবিধা হয়।
- ছোট ঘরে ট্রলির সাহায্যে ময়লা পরিষ্কার করার উপযোগী দরজা থাকে।

১০. ঘরের অবস্থান :

- বাতাস প্রবাহ গতিবেগের বিপরীতে বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগির ঘর থাকবে।
- প্রচুর আলো বাতাস চলাচলের জন্য ঘরগুলো পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হলে ভালো।
- দুই শেডের মধ্যে কমপক্ষে ৩০-৪০ ফুট ফাঁকা স্থান থাকতে হয়।

১১. পরিবেশ :

- খোলামেলা ঘর স্থাপনের জন্য চারিদিকে পর্যাপ্ত ফাঁকা ও খোলামেলা স্থানের প্রয়োজন।
- আবহাওয়া অবস্থা ও মুরগির প্রকৃতি অনুসারে ঘরের আকৃতি ও এবং স্থান নির্বাচন করতে হয়।
- বিষ্ঠা ও লিটার নিষ্কাশনের সুবিধাজনক স্থান প্রয়োজন।

১২. বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুরগি প্রতি মেঝেতে স্থান :

পদ্ধতি	সাদা হালকা জাত		রঙিন ভারী জাত	
	৬-২০ সপ্তাহ	২১ সপ্তাহের উর্ধ্বে	৬-২০ সপ্তাহ	২১ সপ্তাহের উর্ধ্বে
লিটার পদ্ধতি	১ বর্গ ফুট	১.৫৮ বর্গ ফুট	১.২ বর্গ ফুট	১.৭৫ বর্গ ফুট
মাচা পদ্ধতি	০.৭ বর্গ ফুট	১.০ বর্গ ফুট	০.৮৪ বর্গ ফুট	১.২৫ বর্গ ফুট
খাঁচা পদ্ধতি		৭২ বর্গ ইঞ্চি	-	৭৮ বর্গ ইঞ্চি

২.৩ ছাদের নকশার উপর ভিত্তি করে ঘরের শ্রেণিবিন্যাস

মোটামুটি আয়তাকার ঘর মুরগি পালনের জন্য বিশেষ উপযোগী। ছাদের তারতম্য অনুসারে নানা রকম মুরগির ঘর তৈরি করা যায় যেমন :

১) শেড টাইপ
২) গ্যাবল টাইপ
৩) সেমি গ্যাবল টাইপ
৪) মনিটর টাইপ
৫) সেমি মনিটর টাইপ
৬) গোল টাইপ

চিত্র:-২.১. শেড টাইপ

চিত্র:২.২ গ্যাবল টাইপ

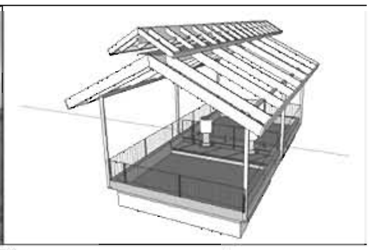
চিত্র:২.৩ মনিটর টাইপ

চিত্র:২.৪ সেমি গ্যাবল টাইপ

চিত্র:২.৫ গোল টাইপ

১. শেড টাইপ :
এ ধরনের মুরগির ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। সাধারণত খোলা অবস্থায় বা অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।

২. গ্যাবল টাইপ :
এ ধরনের ঘর তৈরিতে খরচ বেশি লাগে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয় সেখানকার জন্য গ্যাবল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী। এ ধরনের ঘরের ছাদ ঢালু হয়ে থাকে।

৩. কম্বিনেশন টাইপ :
এ ধরনের ঘরের ছাদ দুইদিকেই ঢালু থাকে। বেশিরভাগ ঘরেরই উপরের দিকে বেশি ঢালু থাকে। এক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও বেশি হয়।

৪. মনিটর বা সেমি মনিটর টাইপ :
যেসব ঘর বেশি প্রশস্ত করার দরকার হয় এবং ঘরের ভেতর উভয়দিকে মুরগির খোপ রাখতে হয় সেক্ষেত্রে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়ে থাকে। ব্রুডার ঘর এ ধরনের ডিজাইনে তৈরি করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লেয়ার খামার স্থাপনের জমির বৈশিষ্ট্য কী হবে?
২. কয় ধরনের ঘরে মুরগি পালা হয়?
৩. লিটার পদ্ধতিতে লিটার ধরে রাখার জন্য মেঝে থেকে কত উঁচু করে দেয়াল দেওয়া হয়?
৪. লেয়ার ঘরের প্রশস্ততা বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত ফুট?
৫. লিটার পদ্ধতিতে ঘরের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত ফুট?
৬. স্বয়ংক্রিয় খাদ্যপাত্র ঘরের কোথায় স্থাপন করতে হয়?
৭. ছোট চালা ঘরের ক্ষেত্রে মেঝের মধ্য বরাবর চালের উচ্চতা কত ফুট?
৮. চালের ছাপ কত ফুট বাইরে ঝুলন্ত রাখতে হয়?
৯. চালা হিসাবে কী দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়?
১০. দুই শেডের মধ্যে কতটুকু ফাঁকা স্থান থাকে?
১১. ঘর কোন দিকে লম্বা হওয়া ভালো?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সাদা হালকা জাতের ক্ষেত্রে লিটার, মেঝে ও খাঁচা পদ্ধতিতে কতটুকু জায়গায় প্রয়োজন হয়?
২. রঙিন ভারী জাতের ক্ষেত্রে লিটার মেঝে ও খাঁচা পদ্ধতিতে কতটুকু জায়গার প্রয়োজন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লেয়ার খামারের স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।
২. লেয়ার খামারের খোলামেলা ঘর তৈরির সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩. ছাদের নকশার উপর ভিত্তি করে লেয়ার ঘরের শ্রেণিবিন্যাস কর এবং ঘরগুলোর চিত্র আঁক।

২০২০

তৃতীয় অধ্যায়
লেয়ার মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

৩.১ লেয়ার মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

মোরগ-মুরগির সঠিক উৎপাদন পেতে হলে অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে। মুরগির বাসস্থান যে এলাকায় তৈরি করা হবে, সে এলাকায় প্রাপ্ত উপকরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত। এতে নির্মাণ ব্যয় অনেক কম হবে এবং খামারিরা অতি সহজেই নির্মাণ করতে পারবেন। আমাদের দেশে খামারিরা ৩টি পদ্ধতিতে ডিমপাড়া মুরগি পালন করে থাকে। যথা–

১) লিটার পদ্ধতি
২) মাচা পদ্ধতি
৩) খাঁচা পদ্ধতি

তবে সার্বিক ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী খরচ ও স্বাস্থ্যসম্মত দিক বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে মাচা ও খাঁচা পদ্ধতিতে ডিমপাড়া মুরগি পালন অধিক লাভজনক।

১. লিটার পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে ঘরের মেঝের উপর বিছানা হিসাবে কাঠের গুঁড়া, তুষ, খড়ের ছোট ছোট টুকরা ইত্যাদি ব্যবহার করে মুরগি পালন করা যায়। লিটারের সহজলভ্যতা ও দামের উপর নির্ভর করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম লিটার ব্যবহার করা হয়।

লিটার পদ্ধতি আবার দুই প্রকার :

(ক) লিটার পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে ঘরের মেঝেতে ২-৩ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছানো থাকে।

(খ) ডিপ লিটার পদ্ধতি : ঘরের মেঝেতে পুরু বা মোটা করে লিটার দেওয়া হয়। সাধারণত ৪-৮ ইঞ্চি, পুরু করে লিটার দেওয়া হয়।

লিটার পদ্ধতিতে বাচ্চা মুরগির জন্য ২-৩ ইঞ্চি, বাড়ন্ত মুরগির জন্য ৩-৪ ইঞ্চি ও ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জন্য ৪-৮ ইঞ্চি পুরু করা উচিত। মুরগি ঘরে উঠানোর ১ সপ্তাহে পূর্বে লিটার সরবরাহ করতে হবে।

চিত্র:-৩.১ লিটার পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি পালন

এই পদ্ধতিতে সুবিধা :

- নির্মাণ ব্যয় কম।
- লিটার ব্যবহার করলে মুরগির পায়খানা ঘরের মেঝের সাথে লেপ্টে থাকে না।
- ঘর শুকনা ও দুর্গন্ধমুক্ত থাকে।
- ঘরে মুরগির অবস্থানকাল পর্যন্ত পরিষ্কার করতে হয় না।
- ডিম পাড়া শেষে বাতিল মুরগি বিক্রির পর লিটার পরিষ্কার করতে হয়।
- ডিমের গুণগুণ ভালো হয় ও ডিম কম ভাঙে।
- ডিম উৎপাদন বেশি হয়।
- মুরগির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- মুরগি বেশি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
- তুলনামূলক সহজ ব্যবস্থাপনা।
- লিটারের মধ্যে একপ্রকার ভিটামিন ও আমিষ তৈরি হয় যা মুরগি লিটার থেকে খুঁটে খায়।
- লিটার জৈব সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা যায় এবং জৈব খাদ্য হিসাবে মাছের জন্য ব্যবহার করা যায়।

এই পদ্ধতিতে অসুবিধা :

- শ্রমিক খরচ বেশি।
- ডিম ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিক জায়গা প্রয়োজন হয়।
- রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- মেঝেতে ডিম পাড়ার প্রবণতা হতে পারে।
- ভিজা লিটার মুরগির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।
- লিটারের আর্দ্রতা বেশি থাকলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় যা মুরগির জন্য ক্ষতিকর।

২. মাচা পদ্ধতি :

ঘরের মধ্যে সমস্ত মেঝেজুড়ে মেঝের উপর ২৭ ইঞ্চি উঁচুতে মাচা তৈরি করা হয়। অনেক সময় পরিবেশ অনুসারে আরও উঁচু মাচা যুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। মাচার ফাঁক দিয়ে মুরগির পায়খানা মাচার নিচে জমা হলে নিচে ঢুকে পরিষ্কার করতে হয়। ডিম পাড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘরের নিচে পায়খানা জমা হয়। এই পদ্ধতিতে মাচার নিচে মাছির উপদ্রব হয় এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, ফলে মাঝে মাঝে বিষ্টা পরিষ্কার করে ফেলা হয়। বড় বাণিজ্যিক খামারে এ পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয় নয়। সেখানে মাচার নিচে বাতাস প্রবাহ বাড়িয়ে পায়খানা শুকানো ব্যবস্থা থাকে।

চত্র:৩.২ মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন

২০২০

এই পদ্ধতির সুবিধা :

- রোগব্যধি কম হয়।
- লিটার পদ্ধতির তুলনায় বেশি মুরগি রাখা যায়।
- বিছানার দরকার হয় না।
- মুরগির বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসেবে বেশি উপযোগী।

এই পদ্ধতিতে অসুবিধা :

- নির্মাণ ব্যয় বেশি।
- ডিম ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেশি।
- প্রজননের জন্য অসুবিধা।
- মুরগির বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে অসুবিধা।
- মাছির উপদ্রব বেশি।

৩. খাঁচা পদ্ধতি :

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে খাঁচা পদ্ধতিতে দক্ষভাবে ডিমপাড়া মুরগি পালন করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি খাঁচার খোপের মাপ দৈর্ঘ্য ১৮"× প্রস্থ ১২"× উচ্চতা ১৯" হলে, সেখানে অনায়াসে ৩টি ডিম পাড়া মুরগি রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের খাঁচা বাজারে পাওয়া যায়।

(ক) একক ডেক খাঁচা :

ঘরের মধ্যে একক সারিতে স্থাপন করা হয়। প্রতি খাঁচা ঘরের মধ্যে একই সমতলে থাকে। মুরগির পায়খানা সরাসরি খাঁচায় নিচে ঘরের মেঝেতে পড়ে। খাঁচা ঘরের সিলিং-এর সাথে ঝুলিয়ে বা পিলারের উপর স্থাপন করা যায়।

চিত্র:৩.৩ একক ডেক খাঁচা

(খ) দুই ডেক খাঁচা;

খাঁচা সিড়ির আকারে একটির উপর অপরটি দুই সারিতে স্থাপন করা যায়। প্রতি সারিতে খাঁচায় অবস্থিত মুরগির পায়খানা সরাসরি খাঁচার নিচে মেঝের উপর পড়ে। খোলামেলা ঘরের জন্য এই খাঁচা উপযোগী।

২০২০

চিত্র:৩.৪ দুই ডেক খাঁচা

(গ) তিন ডেক খাঁচাঃ

এই প্রকৃতির খাঁচা একটির উপর অপরটি দুইভাবে সারিবদ্ধ করে স্থাপন করা যায়।

প্রথমত, সরাসরি একটি উপর অপর সারির খাঁচা স্থাপন করা যায়। প্রতি সারিতে খাঁচার নিচে মুরগির পায়খানা জমা হওয়ার জন্য ট্রে দেওয়া থাকে। প্রতিদিন ট্রে পরিষ্কার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, তিন সারিতে পরস্পরের উপর সিঁড়ির আকারে খাঁচা সাজানো হয়। প্রতি তলার খাঁচার মুরগির পায়খানা সরাসরি খাঁচার নিচে মেঝেতে পড়ে। লোহার অ্যাঙ্গেল দ্বারা তৈরি করে এক সারিতে সিঁড়ির আকারে প্রতিটি অবকাঠামোর উপর ২৪টি খাঁচা স্থাপন করা যায়। প্রতি খাঁচায় ৩টি মুরগি হিসাবে ২৪টি খাঁচায় ৭২টি মুরগি পালন করা যায়। অনুরূপভাবে স্থাপিত খাঁচায় প্রচলন বেশি। প্রতি অবকাঠামো ৬ ফুট ৭ ফুট এবং পায়াসহ উচ্চতা ৪.৫-৫ ফুট। এভাবে ৪ বা ৫ ডেক স্থাপন করা যায়।

চিত্র : ৩.৫ তিন ডেক খাঁচা

(ঘ) ফ্ল্যাট ডেক টাইপ :

একই সারিতে একই সমতলে ঘরের মধ্যে খাঁচা স্থাপন করা হয়। প্রতি সারিতে খাঁচা খুব কাছাকাছি স্থাপন করা হয়। পরিচর্যা করার জন্য সারির মধ্যভাগে যাতায়াতের রাস্তা থাকে না। প্রতি সারির নিচ দিয়ে মটর চালিত চওড়া বেল্ট চালু থাকে। যেখানে মুরগির পায়খানা পড়ে। এই চলন্ত বেল্ট পায়খানা টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। ডিম সংগ্রহের জন্য চওড়া কনভেয়র বেল্ট মটরের সাহায্যে চালু করা হয়।

চিত্র: ৩.৬ ফ্ল্যাট ডেক টাইপ

(ঙ) পিরামিড টাইপ বহুতল খাঁচা :

তিন সারিতে পরস্পরের উপর সিঁড়ির আকারে খাঁচা সাজানো হয়। এভাবে উভয় পাশে যখন ৩ সারিতে পরস্পরের উপর সিঁড়ির আকারে খাঁচা সাজানো হয়, তখন এতে পিরামিডের মতো মনে হয়। প্রতি তলার খাঁচার মুরগির পায়খানা সরাসরি খাঁচার নিচে মেঝেতে পড়ে। লোহার অ্যাঙ্গেল দ্বারা তৈরি করে এক সারিতে সিঁড়ির আকারে প্রতি অবকাঠামোর উপর ২৪টি হিসাবে উভয় পাশে মোট ৪৮টি খাঁচা স্থাপন করা যায়। প্রতি খাঁচায় ৩টি মুরগি হিসাবে ৪৮টি খাঁচায় ১৪৪টি মুরগি পালন করা যায়।

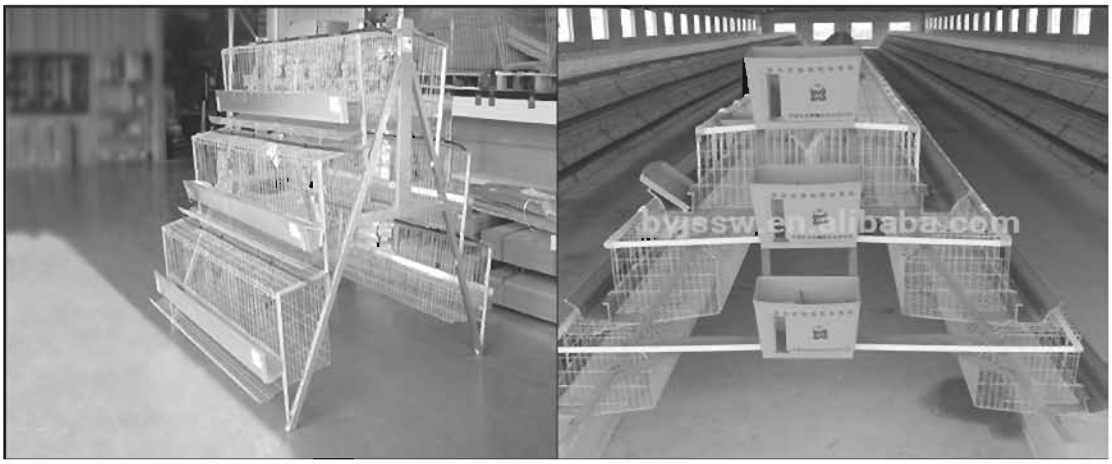

চিত্রঃ৩.৭ পিরামিড টাইপ বহুতল খাঁচা

(ঘ) এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া টাইপের বহুতল খাঁচায়ও মুরগি পালন করা হয়।

চিত্রঃ-৩.৮ ক্যালিফোর্নিয়া টাইপের বহুতল খাঁচা

এই পদ্ধতির সুবিধা :

- অল্প জায়গায় বেশি মুরগি পালন করা যায়।
- পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়া সহজ।
- রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম।
- খাঁচার মধ্যে মুরগি কখনও কুঁচে হয় না।
- ডিম পাড়ার সাথে সাথে গড়িয়ে খাঁচার বাইরে চলে আসে।

২০২০

- মুরগির ডিম খাওয়া অভ্যাস জন্মাতে পারে না।
- ডিম ময়লা হয় না।
- মুরগির কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম।
- বিষ্ঠা দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়।

এই পদ্ধতিতে অসুবিধা :

- খাঁচার নিচে মুরগির পায়খানা জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় ও মাছির উপদ্রব হয়।
- নিয়মিত পায়খানা পরিষ্কার করা বিরক্তিকর।
- দুর্গন্ধে পার্শ্ববর্তী পরিবেশ দূষিত হয়।
- খাঁচা তৈরিতে প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি।
- ডিমে রক্তজমা সৃষ্টির হার বেশি।
- পায়ের নিচে খাঁচার ঘর্ষণে কড়া পড়ে। একে 'বাম্বল ফুট' বলে।
- খাঁচায় পালিত মুরগির হাড় অত্যন্ত ভঙ্গুর হয় এবং বাতিল মুরগির দাম কম পাওয়া যায়।
- মুরগির ভিটামিন বি গ্রুপের অভাব বেশি হয়।

প্রশ্নমালা

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কয়টি পদ্ধতিতে লেয়ার পালন করা যায়?
২. লিটার পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী ?
৩. লিটার পদ্ধতিতে বাচ্চা, বাড়ন্ত মুরগি ও ডিমপাড়া মুরগির জন্য লিটারের পুরুত্ব কত?
৪. সাধারণত মেঝে থেকে কত উঁচুতে মাচা তৈরি করা হয়?
৫. কত মাপের একটি খাচায় ৩টি ডিম পাড়া মুরগি রাখা যায়?
৬. ফ্লাট ডেক টাইপ খাঁচা কী?
৭. পিরামিড টাইপ খাঁচা কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লিটার পদ্ধতির সুবিধা কী কী?
২. লিটার পদ্ধতির অসুবিধা কী কী?
৩. মাচা পদ্ধতিতে সুবিধা কী?
৪. মাচা পদ্ধতির অসুবিধা কী?
৫. খাঁচা কত প্রকার ও কী কী?
৬. খাঁচা পদ্ধতির সুবিধা কী?
৭. খাঁচা পদ্ধতির অসুবিধা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

৮. লেয়ার পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা কর।
৯. লেয়ার পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

লেয়ার পালনের বাসস্থান প্রস্তুতকরণ

৪.১ লেয়ার বাচ্চা পালনের জন্য কক্ষ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্তকরণ কৌশল:

নতুন বা পুরাতন যে ঘর হোক না কেন, 'অল ইন অল আউট' পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ঘরে এক ব্যাচ লেয়ার বাচ্চার পালন করে পুলেট হিসেবে বিক্রি করার কমপক্ষে ১৪ দিন পর অন্য ব্যাচ ওঠাতে হবে। এ পদ্ধতি শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধই করে না রোগের জীবাণুকেও ধ্বংস করতে সহায়তা করে।
লেয়ার বাচ্চা পালনের জন্য ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

(ক) ব্রুডার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা

১) ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত সরঞ্জাম, হোভার, ব্রুডার গার্ড, লিটার, খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হবে।

২) পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩) ঘরের দেয়াল, দরজা, জানালা, নেট, পর্দা, ভেন্টিলেটর, ফ্যান, বাল্ব ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

৪) ঘরে কোন মেরামত, সংস্কার ইত্যাদি প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫) পরিষ্কার পানি দিয়ে দেয়াল, মেঝে, খাদ্য ও পানির পাত্র ধুতে হবে। পাইপ দিয়ে উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার উত্তম।

(খ) ঘরের মেঝে, খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ :

১) জীবাণুনাশক যেমন-(পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, আয়োসান) দিয়ে খাবার ও পানির পাত্র, হোভার, ব্রুডার গার্ড, ব্রুডার হিটার, দেয়াল, মেঝে, ছাদ, পর্দা ও খামারের আশপাশে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২) ভেজা মেঝের উপর ১০০ বর্গফুট স্থানে ১ কেজি হারে শুকনা কস্টিক সোডা ছড়াতে হবে এবং ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর মেঝে শুকিয়ে গেলে কস্টিক সোডার উপর হালকা পানি স্প্রে করতে হবে।

৩) পরে সমস্ত ঘর পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪) বাচ্চা উঠানোর ৬ দিন পূর্বে বাচ্চার সমস্ত জিনিসপত্র আবার জীবাণুমুক্ত করে শুষ্ক করে ভিতরে রাখতে হবে।

চিত্র : ৪.১ মুরগির ঘর পরিষ্কার করার কৌশল

(গ) ঘরের ভিতর লিটার বিছানোর ও অন্যান্য সরঞ্জাম স্থাপন :

১) বাচ্চা ব্রুডিং-এর ১ (এক) দিন পূর্বে ঘর ভালোভাবে শুকানোর পর লিটার বিছাতে হবে।

২) লিটারের উপর গোল করে চিকগার্ড স্থাপন করে তার মাঝামাঝি স্থানে হোভার সিলিং-এর সাথে ঝুলিয়ে দিতে হয়।

৩) ব্রুডার গার্ডের ভেতর হোভারের নিচে লিটারের উপর কাগজ, চিক বক্সের ঢাকনি বা প্লাস্টিক শিট বিছাতে হবে।

৪) হোভারের সাথে হিটার (বাল্ব, ব্রুডার স্টোভ, গ্যাস বার্নার) সংযুক্ত করতে হবে।

(ঘ) ফিউমিগেশন :

১) ব্রুডার ঘরে বাচ্চা গ্রহণের ১২ ঘন্টা পূর্বে সম্পূর্ণ ঘর চট বা পলিথিন দিয়ে ঘিরে ফিউগেশন উপকরণ ব্যবহার করে ঘরের ফিউমিগেশন করা হয়।

২) ব্রুডার ফিউমিগেশন করার জন্য ৩ গুণ ঘনত্বের ফিউমিগেশন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৩) প্রতি ১০০ ঘন ফুট স্থানের জন্য ৬০ গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ১২০ মি.লি. ফরমালডিহাইড ব্যবহার করতে হবে।

৪) ব্রুডিং স্থানের পরিমাণ হিসাব করে মোট পরিমাণ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ৪/৫ টি মাটি, কাচ বা পোরসেলিন পাত্রে ভাগ করে বিভিন্ন স্থানে সমদূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

৫) পরিমাণমতো ফরমালডিহাইড সমপরিমাণে খুব দ্রুত সবগুলো পাত্রে ঢেলে দিতে হবে এবং ঘর বন্ধ করে বের হয়ে আসতে হবে।

৬) ফিউমিগেশন করার সময় সমস্ত ঘর ও সরঞ্জাম একই সাথে জীবাণুমুক্ত হয়।

৭) ফিউমিগেশন করার ২০-৩০ মিনিট পর পর্দা সরিয়ে সম্পূর্ণ গ্যাস বেরিয়ে যেতে দিতে হবে।

৮) ফিউমিগেশনের পর বাচ্চা প্রদানের ২/৩ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত ঘর তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

চিত্রঃ ৪.২ ফিউমিগেশন

(ঙ) ঘরের চারিদিকে পরিষ্কারকরণ :

১) ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

২) পুরাতন মুরগি ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৩) বাচ্চা উঠানোর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই ঘরের ফুটবাথে জীবাণুনাশক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন ১ (এক) বার করে ঘরের বাইরের চতুর্পার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

৫) নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরের আশেপাশে কোনো প্রাণী বা লোক চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

২০২০

৪.২ লেয়ার-এর বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার কৌশল :

নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাসস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকবে–

(১) মুরগির জাত ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাপের ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে তৈরি করতে হবে, যাতে মুরগি পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পায়।

(২) খামারে পানি জমে স্যাঁতসেঁতে না হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৩) মুরগির খামারের উপরিভাগের তারের জাল দিয়ে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) ঘরে যাতে বৃষ্টির ছাঁট পড়ে লিটার ভিজে না যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৫) গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য–
   ক) ঘরের চালে পানি ছিটানো হয়
   খ) ঘরের চারিদিকে পানি ছড়ানো হয়
   গ) ঘরের মধ্যে ফগিং মেশিণ দিয়ে পানি স্প্রে করে কুয়াশা তৈরি করা হয়
   ঘ) ঘরের ভিতরে ও বাইরে ফ্যান ব্যবহার চালানো হয়

(৬) খামারে নতুন বাচ্চা উঠানোর আগে খামার সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রথমে পানি দ্বারা পরিষ্কার করে পরে পানির সাথে জীবাণুনাশক মিশিয়ে খামার জীবনাণুমুক্ত করা হয়।

(৭) খামারে ভালো খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।

(৮) হ্যাচারি থেকে সুস্থ সবল লেয়ার বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে সালমোনেলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি রোগ হ্যাচারি থেকে খামারে আসতে পারে ।

(৯) খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

(১০) বর্জ্য পদার্থ, বিষ্ঠা, লিটার নিয়মিত পরিষ্কারসহ মুরগির ঘরের ভেতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

(১১) খামারে যাতে বন্যপ্রাণী ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা বন্যপ্রাণী ও ইঁদুর দ্বারা রানীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সালমোনেলাসহ গুরুত্বপূর্ণ রোগ খামারে আসতে পারে।

(১২) খামারে কোনো মুরগি অসুস্থ হলে দ্রুত সম্ভব পৃথক করে ফেলতে হবে। মারা গেলে তা সাথে সাথে সরিয়ে নিয়ে অবশ্যই মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

(১৩) খামারে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.অল ইন অল আউট পদ্ধতি কী?
২.এক ব্যাচ বাচ্চা পালন করার কত দিন পর অন্য ব্যাচে বাচ্চা উঠাতে হবে।
৩.পুরাতন লিটার ফার্ম থেকে কত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।
৪.পাঁচটি জীবানুনাশক ওষুধের নাম লিখ।
৫. ফিউমিগেশন কী ?
৬. ফিউমিগেশনে কী কী রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে তাপ কমানোর জন্য কী করতে হয়?
২. ঘরের মেঝে, খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ কীভাবে করতে হয়?
৩. ঘরের ভেতর লিটার বিছানো ও অন্যান্য সরঞ্জাম স্থাপনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রুডার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. ঘরে ফিউমিগশন করার প্রক্রিয়া আলোচনা কর।
৩. লেয়ার বাচ্চা পালনের জন্য কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্তকরণ কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৪. বাসস্থানের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার কৌশল আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়
লিটারের প্রকারভেদ ও ব্যবস্থাপনা

পোল্ট্রি পালনে লিটারের ভূমিকা খুবই গুরত্বপর্ণ। আবদ্ধ অবস্থায় পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে লিটার পদ্ধতিতে মুরগির বিছানা হিসাবে লিটার ব্যবহার করা হয়। পোল্ট্রি লিটার অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। লিটার এক দিকে যেমন পোল্ট্রি উৎপাদনে সহায়তা করে ঠিক তেমনি সঠিকভাবে লিটারের যত্ন না নিলে এ থেকে বিভিন্ন রোগেরও সৃষ্টি হতে পারে। তাই লিটার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৯.১ লিটারের সংজ্ঞা :

পশুপাখির বিছানাকেই ইংরেজিতে লিটার (Litter) বলে অর্থাৎ লিটার বলতে পোল্ট্রির ঘরে শয্যা হিসেবে ব্যবহৃত নানাবিধ বস্তুকেই বোঝায়। এক কথায় বাসস্থান আরামদায়ক করার জন্য পোল্ট্রির ঘরে যে বিছানা ব্যবহার করা হয় তাকে লিটার বলে।

৫.১ ব্যবহৃত উপকরণের ভিত্তিতে লিটারের শ্রেণিবিন্যাস

মুরগির ঘরে লিটার বা বিছানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম অনুযায়ী লিটারকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা–

(ক) তুষের লিটার
(খ) কাঠের গুঁড়ার লিটার
(গ) খড়ের ছোট টুকরার লিটার
(ঘ) আখের ছোবড়ার লিটার
(ঙ) বালির লিটার
(চ) ভুট্টার মোঁচার ছোবড়ার লিটার

চিত্র : ৫.১ বিভিন্ন ধরনের লিটার

৫.২ ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে লিটারের শ্রেণিবিন্যাস-

ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে লিটারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

(১) কম পুরু লিটার : এ ধরনের লিটারের পুরুত্ব হবে ২-৩ ইঞ্চি।

(২) পুরু লিটার বা ডিপ লিটার : এ ধরনের লিটারের পুরুত্ব হবে ৪-৮ ইঞ্চি। লিটার একবারে বা ধাপে ধাপে বিছানো যেতে পারে। প্রথমে ৩ ইঞ্চি পুরু করে লিটার বিছিয়ে ধাপে নতুন করে লিটার যোগ করে এর পুরুত্ব বাড়ানো হলে একে বিল্ট আপ (Built up) লিটার বলা হয়।

৫.৩ মুরগির ঘরে লিটার স্থাপনের কৌশল

মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন :

১. লেয়ার ঘরে ওঠানোর ১ সপ্তাহ পূর্বে লিটার দ্রব্য স্থাপন করতে হবে।
২. লিটার বিছানোর পূর্বে ভালোভাবে ঘরের মেঝে শুকাতে হবে।
৩. লিটার দ্রব্য অবশ্যই নরম ও আরামদায়ক হবে।
৪. লিটার ভেজা থাকলে রোদে শুকিয়ে ১০ % আর্দ্রতায় আনতে হবে। কারণ বেশি আর্দ্র হলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।
৫. লিটার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে খুব জোরে চাপ দিলে যদি জমাট না বাঁধে বা ঝরে না যায় তাহলে লিটারের অবস্থা ভালো হিসাবে ধরে নিতে হবে।
৬. শুকনা লিটার ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করে ঘরের মেঝেতে লিটার বিছিয়ে রাখতে হবে।
৭. বিছানা বা লিটার যাতে বৃষ্টির ছাপে ভিজে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

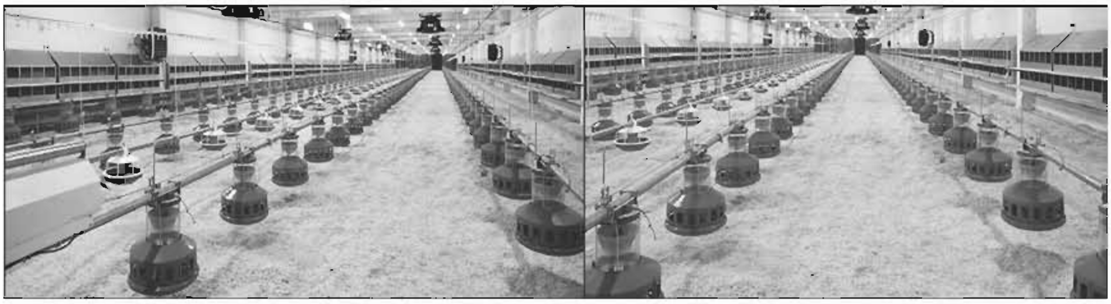

চিত্র:৫.২ লিটার স্থাপন কৌশল

৫.৪ মুরগির ঘরে লিটার ব্যবস্থাপনা

লিটার ব্যবস্থাপনা :

- লিটার যাতে মলমূত্রাদি বা খাবার পানির মাধ্যমে ভিজে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে ছত্রাক যাতে জন্মাতে না পারে সেজন্য লিটার আচড়া ভালোভাবে ওলট পালট করে দিতে হবে।

চিত্র ৫.২ : লিটার ভালোভাবে ওলটপালট করা

- দুই মাস পর লিটারের কার্যকারিতা শুরু হয়। এ সময়ের লিটারকে বিল্টআপ লিটার বলে।
- দুই মাস পর থেকে মুরগি নিজেরাই লিটার উল্টেপাল্টে নেয় বলে এই সময় মাসে একবার পরিচর্যা করতে হয়।

- দুই মাস পর লিটারের মধ্যে প্রতি ১০০ মুরগির জন্য ২২৫ গ্রাম কাঁকর ছড়িয়ে দিতে হয়। আর্দ্রতা কম থাকলে পানি স্প্রে করতে হবে।
- লিটার ভিজে গেলে এর আর্দ্রতা কমানোর জন্য ঘরের মধ্যে বাতাসের প্রবাহ বাড়াতে হয়। এতে কাজ না হলে পুরোনো লিটারে সাথে নতুন শুকনা লিটার মেশাতে হয় বা ভিজা লিটার ফেলে দিয়ে নতুন লিটার দিতে হবে।
- লিটারের আর্দ্রতা দূর করার জন্য মাঝে মাঝে সুপার ফসফেট প্রতি ১ ঘন মিটারের জন্য ২২৫ গ্রাম হিসাবে মেশাতে হবে।
- লিটার কেক হলে ভেঙে দিতে হবে।
- পুরু বিছানা যাতে জমাট না বাঁধে সে জন্য তাতে শুষ্ক চুন (১০ বর্গ মিটারে ৭-১০ কেজি চুন) সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে বিছানা নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ব্যবহার শেষে লিটার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে প্রতি ১ ঘন মিটার লিটারে ১ কেজি চুনের গুঁড়া মিশিয়ে ১ সপ্তাহ স্তূপ করে রাখলে পরিশুদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে এই লিটার ব্যবহার করা যায়।
- তবে মুরগির পালে যদি রোগ-ব্যাধি না থাকে তবে তাদের ব্যবহৃত লিটার পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কিন্তু পুরোনো লিটার ব্যবহার না করাই উত্তম।
- সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পালের ব্যবহৃত লিটার পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

৫.৫ মুরগির ঘরের ব্যবহৃত লিটার-এর ব্যবহার

প্রতিটি বয়স্ক মুরগি দৈনিক গড়ে ১১৩-১২০ গ্রাম বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে যার মধ্যে ২২-২৫ গ্রাম শুষ্ক বস্তু থাকে। এই ২২-২৫ গ্রাম দৈনিক লিটারের সাথে সংযুক্ত হয়। এ ছাড়া লিটার পরিচর্যার সময় চুন ও সুপার ফসফেট লিটারের মধ্যে মেশানো হয়। বিভিন্ন পোকা, ছত্রাক, রোগজীবাণু লিটারের মধ্যে জন্মে, যা লিটারের গাজন প্রক্রিয়ায় মারা যেয়ে লিটারের গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

১০০০ মুরগির খামারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বিষ্ঠা উৎপাদনের পরিমাণ :

সময়	মুরগি প্রতি বিষ্ঠা উৎপাদন (গ্রাম)	১০০০ মুরগি থেকে মোট বিষ্ঠা উৎপাদন (টন)
দৈনিক	১১৩	১১৩ কেজি-০.১১৩ টন
সাপ্তাহিক	৭৯১	০.৭৯১
মাসিক	৩৩৯০	৩,৩৯
বার্ষিক	৪০৬৮০	৪০.৬৮

এই লিটার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়, যথা-

(ক) জৈব সার হিসাবে :

ডিপ লিটার এ নাইট্রোজেনের পরিমাণ গোবর সার অপেক্ষা ১০ গুণ বেশি। ২৫টি মুরগি বছরে ১ টন জৈব সার তৈরি করতে পারে। ডিপ লিটার খোলা স্থানে না রেখে একটি একক চালা ঘর করে চারিদিকে বেড় দিয়ে এর মধ্যে জমা করতে হবে।

২০২০

তবে লিটার পরিচয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরি করলে গুণাগুণ আরও বৃদ্ধি পায়। মাটিতে গর্ত করে পচনশীল আবর্জনার স্তর তৈরি করে তার উপর লিটার দিয়ে ভরতে হবে। এর উপর কচুরিপানা, ঘাস, লতা পাতা দিয়ে ভরাট করে গর্তটি মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। এ অবস্থায় দুই সপ্তাহ রেখে গর্ত থেকে তুলে সরাসারি জমিতে ব্যবহার করা যায় লিটার সরাসরি চারাগাছে।

(খ) মাছের খাদ্যে হিসেবে :

ডিপ লিটার মাছের জন্য সুষম খাদ্য। এ খাদ্য দিলে মাছের জন্য অন্য কোনো সম্পূরক বা পরিপূর্ণ খাবার এর প্রয়োজন হয় না। এছাড়া খরচও কম হয়। লিটার পানিতে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইটোপ্লাংটন ও জুপ্লাংটন জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদনে সাহায্য করে যা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি হেক্টরে ৪৫.৫ কেজি লিটার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে লিটার বা বর্জ্য পদার্থ পুকুরে সরাসারি মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করে পচানোর পর ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) বায়োগ্যাস হিসাবে :

পারিবারিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়। লিটার থেকে বাতি জ্বালানো ও রান্নার কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে :

কিছু খাদ্য উপাদান মুরগির পরিপাকতন্ত্রের অপরিপাক অবস্থায় থাকে এবং মলের সাথে বেরিয়ে আসে। মুরগির পারিপাকতন্ত্রে বিপাকীয় কার্যক্রমে সংঘটনের ফলে অনেক উপজাত খাদ্য গবাদিপশুর খাদ্য উপযোগী মূল্যবান পুষ্টি উপাদানে রূপান্তরিত হয়। হাঁস মুরগির মলে দুর্গন্ধ, রোগজীবাণু ও ক্ষতিকর কিছু পদার্থ থাকে। এই সমস্ত প্রতিকারের জন্য এনরোবিক পদ্ধতিতে ফারমেনটেশন করতে হয়। গবদিপশুর দানাদার খাদ্যের পরিবর্তে শতকরা ৮০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

(ঙ) লিটার-সামগ্রী পরিশুদ্ধ করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়ঃ

প্রতি এক ঘনমিটার লিটারে এক কেজি চুনের গুঁড়া মিশিয়ে এক সপ্তাহ স্তূপ করে রাখলে লিটার পরিশুদ্ধ হয়। এই পরিশুদ্ধ লিটার পুনরায় লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

(চ) লিটার মৃত হাঁস-মুরগির সাথে কম্পোস্ট করে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

লিটারের সাথে মৃত হাঁস-মুরগি কম্পোষ্ট বিন পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পোস্ট করে সার তৈরি করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লিটার কাকে বলে।
২.ব্যবহৃত উপকরণের উপর ভিত্তি করে লিটারকে শ্রেণিবিভাগ কর।
৩. ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে লিটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৪. বিল্ট আপ লিটার কাকে বলে?
৫. মুরগির ঘরে লিটার কীভাবে স্থাপন করা হয়?
৬. লিটারের আর্দ্রতা দূর করতে লিটারে সুপার ফসফেট মেশানোর মাত্রা কত?
৭. লিটারের চুন ছিটানোর মাত্রা কী?
৮. একটি বয়স্ক মুরগি দৈনিক কতটুক বিষ্ঠা ত্যাগ করে?
৯. ডিপ লিটারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ গোবর সার অপেক্ষা কতগুণ বেশী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যবহৃত লিটার পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি কী?
২. ১০০০ মুরগির খামারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক বিষ্ঠা উৎপাদনের পরিমাণ লেখ।
৩. মাছের খাদ্যে হিসেবে লিটারের ব্যবহার লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন কৌশল আলোচনা কর।
২. লিটার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং

৬.১ ব্রুডিং ঘরে লেয়ার বাচ্চা তোলার পূর্বে ব্রুডিং ঘর প্রস্তুতকরণ :-

লেয়ার-এর বাচ্চা ঘরে তোলার পূর্বে ব্রুডিং ঘর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কাজগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

- বাচ্চা তোলার ১ সপ্তাহ আগে সমস্ত পুরাতন লিটার ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ঘরের পর্দা, ভেতর ও বাইরের মাকড়সার জাল ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরের চারপাশে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে।
- পুরাতন মুরগির ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার বিছানো ব্যবস্থা করতে হবে।
- এরপর জীবাণুনাশক যেমন- পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, আয়োসোন দিয়ে খাবার ও পানির পাত্র, হোভার, ব্রুডার গার্ড, ব্রুডার হিটার, দেয়াল, মেঝে, ছাদ, পর্দা ও খামারের আশপাশে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- সম্ভব হলে পাটের চট বা পলিথিন দ্বারা ঘিরে ফিউমিগেশন করতে হবে।
- বাচ্চা আনার ১ দিন পূর্বে ব্রুডারে ২-৪" পুরু করে রোদে শুকানো লিটার বিছাতে হবে ও জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করে নিতে হবে। ঘরের পর্দার অংশ অবস্থা বুঝে ৬" বা ১২" পরিমাণ খোলা রাখতে হবে।
- চিকগার্ডের ভেতর লিটারের উপর পাটের চট বিছাতে হবে বা খবরের কাগজ বিছাতে হয় যাতে বাচ্চা তুষ বা কাঠের গুঁড়া খেতে না পারে।
- চিকগার্ড গোলাকার করে তৈরি করতে হবে, তা না হলে বাচ্চা একদিকে থাকবে। চাটাই বা হার্ড বোর্ডের বা তারের জালের তৈরি চিক গার্ডের উচ্চতা হবে ১.৫ ফুট। তবে শীতের সময় ২.৫ ফুট থাকতেপারে। চিক গার্ড ব্রুডার থেকে ২.৫-৩ ফুট দূরত্বে গোলাকার বসাতে হয়। ১২ ফুট ব্যাসের একটি চিক গার্ডে ৫০০ বাচ্চা ব্রুডিং করা যায়।
- পাঁচ ফুট ব্যাসের হোভারের নিচে ৫০০ বাচ্চা রাখা যায়।
- হোভারের নিচের দিকে গ্রীষ্মকালে ১০০ ওয়াটের ২টি ও ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব ও শীতকালে ২০০ ওয়াটের ২টি ও ১০০ ওয়াটের ২টি বাল্ব লাগালে ৫০০ বাচ্চাকে ভালোভাবে তাপ দেওয়া যায়।
- ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য দেয়ালের চারদিকে চটের পর্দা দিয়ে ঘিরে দিতে হয়।
- প্লাস্টিক পর্দার উপরিভাগে গ্যাস অপসারণের জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।
- ঘরে আর্দ্রতার পরিমাণ ৭০-৮০ ভাগ রাখতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডারের ছাড়ার ৬ ঘণ্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করে উপযুক্ত তাপমাত্রায় অর্থাৎ ৯৫° ফারেনহাইট এ আনতে হবে।
- হোভারের বাইরে পানির ও খাদ্যের পাত্রগুলো সমান দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।
- ব্রুডার ঘর প্রস্তুত হলে বাচ্চা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- ঘরের প্রবেশ মুখে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ঘরে প্রবেশের পূর্বে এই পানিতে হাত ও পা জীবাণুমুক্ত করতে পারে।
- অসুস্থ কোনো ব্যক্তির দ্বারা ব্রুডার ঘরে কাজ করানো যাবে না।
- ঘরে ইঁদুর চিকা বা অন্য কোনো পশু পাখি প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- খামারে হ্যাচারির ট্রাক প্রবেশের সময় জীবানুনাশক মিশ্রিত পানিতে চাকা ডিপিং করতে হবে।

- খামারে লেয়ার বাচ্চা পৌঁছানোর সাথে সাথে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করতে হবে।
- বাচ্চা ওঠানোর পর প্রতিদিন ১ বার করে ঘরের বাইরের চতুর্পার্শ্বে ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

চিত্র ৬.১ : ফুটবাথে পা জীবাণুমুক্তকরণ

৬.২ ব্রুডার হাউজের তাপমাত্রা :

মুরগির বাচ্চাকে কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলে। সাধারণত ১ দিন থেকে৩/৫ সপ্তাহ পর্যন্ত মুরগির বাচ্চাকে ব্রুডিং করা হয়।

উৎপাদিত বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা ১০৩° ফারেনহাইট, যেখানে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগির শরীরের তাপমাত্রা ১০৭° ফারেনহাইট। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর তারা তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাচ্চার দেহের এই তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিপালন করতে হয়। তাই পীড়নের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্যই ব্রুডিং করা হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাকে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার বলে।

ব্রুডার হাউজে ব্রুডিং শুরুর প্রথম সপ্তাহে সাধারণত তাপমাত্রা ৯৫° ফারেনহাইট থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। হোভার ও চিকগার্ডের মাঝখানে মেঝে থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচুতে থার্মোমিটার দিয়ে নিরূপণকৃত তাপমাত্রাকে ব্রুডারের তাপমাত্রা বলে।

ব্রুডিং ঘরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা :

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা		মন্তব্য
	ডিগ্রি (ফারেনহাইট)	ডিগ্রি (সেলসিয়াস)	
১	৯৫	৩৫	ভ্যাকসিন দেওয়ার-পর তাপমাত্রা ১ সেন্টিগ্রেড বাড়িয়ে রাখলে ভ্যাকসিন ভালো সাড়া দেয়।
২	৯০	৩২	
৩	৮৫	২৯	
৪	৮০	২৭	
৫	৭৫	২৪	
৬	৭০	২১	

২০২০

৬.৩ ব্রুডিং ঘরের ব্যবস্থাপনা

লেয়ার বাচ্চা গ্রহণ :

- লেয়ার বাচ্চা গ্রহণের পূর্বে খামারের প্রস্তুতি বিষয়ে নিশ্চিত থাকেতে হবে।
- ব্রুডার ঘরের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হবে।
- ব্রুডার ও ব্রুডারে পানির পাত্রে সরবরাহকৃত পানির তাপমাত্রা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ব্রুডার ঘরের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ব্রুডার ও ব্রুডারে পানির পাত্রে সরবরাকৃত পানির তাপমাত্রা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- বাচ্চা পরিবহনকারীকে শেডে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।
- পূর্ব থেকে নির্বাচিত কর্মচারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে ও বাচ্চা পালন ঘরে রাখবে।
- সাধারণত সকাল বেলায় ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাচ্চা গ্রহণ করা উচিত, এতে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে এবং বাচ্চা পানি ও খাদ্য চিনে খাওয়ার সুযোগ পাবে।
- বাচ্চাগ্রহণের সময় চিক বাক্সের মধ্যে মৃত বাচ্চার সংখ্যা পরীক্ষা করতে হবে।
- বাচ্চার আচরণ ও গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবে।
- বাচ্চার সংখ্যা ও নমুনা ওজনের হিসাব রাখতে হবে।
- বাচ্চা গ্রহণের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রুডারে ছাড়তে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা :

- প্রতি লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন সি ও ২ গ্রাম ভিটামিন ডাব্লিউ.এস মিশিয়ে নতুন আনা লেয়ার বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। তবে পরিবহন ধকল কমানোর জন্য ৮০ গ্রাম গ্লুকোজ ব্যবহার করতে হয়।
- প্রথম ২-৩ দিন এই পানি খাওয়াতে হবে।
- তবে কোনো বাচ্চা এই পানি না খেলে হাত দিয়ে ধরে খাওয়াতে হবে।
- ভিটামিন মিশ্রিত পানি খাওয়ার ৩ ঘণ্টা পরে বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্য বা গম বা ভুট্টার দানা অল্প পরিমাণে ট্রেতে সরবরাহ করতে হবে।
- প্রথম ১-২ দিন লিটারের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে এবং পরবর্তীতে ১-২ সপ্তাহ ফ্লাট ট্রেতে খাবার দেওয়া হয়।
- ব্রুডারের নিচে কখনই খাবার ছিটানো উচিত নয়।
- ৩য় সপ্তাহ থেকে হপার বা টিউব ফিডারে খাদ্য সরবরাহ করা যায়।১০০ বাচ্চার জন্য (দৈর্ঘ্য ২ ফুট × প্রস্থ ১-৩ ইঞ্চি × উচ্চতা ১.৫ ইঞ্চি মাপের হিসাবে ৫০০ বাচ্চার জন্য ৫টি ফিডার দিতে হবে। অতিরিক্ত ১টি ফিডার দেওয়া ভালো।
- দুই সপ্তাহ পর্যন্ত খাবার শেষ হওয়ার আগেই খাবার দেওয়া উচিত। তা না হলে কিছু বাচ্চা বড় হয়ে যাবে এবং কিছু বাচ্চা ছোট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে খাবার থাকা অবস্থাতেই খাবার দিতে হবে।
- চার সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩-৪ বার খাবার দেওয়া উচিত। এর পর দৈনিক ২ বার খাবার দিলেই চলবে। খাবার দেওয়ার সময় পাত্র কখনও পরিপূর্ণ করে দেয়া যাবে না। পাত্রের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ খালি রাখতে হবে।
- চিক গার্ডের জায়গা বাড়ানোর সাথে সাথে ফিডারের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হয়।

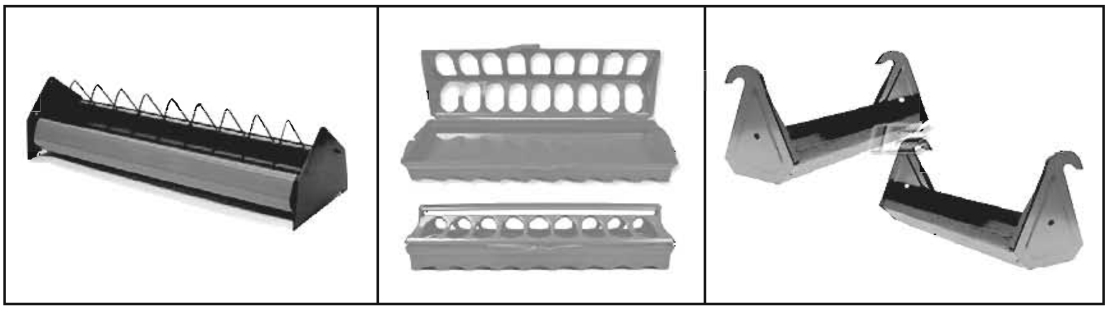

চিত্র ৬.২ : ট্রে ফিডার

পানি ব্যবস্থাপনা :

- ব্রুডারে পূর্ব থেকে পাত্রে পানি প্রদান করা হয়।
- বাচ্চার প্রথম পানি কখনই ঠান্ডা হওয়া উচিত নয়।
- খাবার পানির তাপমাত্রা প্রথমদিকে ২৫-৩০^{0} সে. রাখতে হবে।
- প্রথম অবস্থায় কখনই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে পানি তিতা হয়, ফলে বাচ্চা পানি গ্রহণ করতে চায় না, তাই গ্লুকোজ পানি খাওয়ানোর পর প্রয়োজনে ১ ঘণ্টা পর ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রথম অবস্থায় প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য ১ (এক) লিটারের ৬-৮টি ড্রিংকার (ছোট প্লাস্টিকের পাত্র) দিতে হয়।

চিত্র ৬.৩ : চিক ড্রিংকার

- প্রতি ড্রিংকারে পানি ০.৫ লিটার করে দিতে হবে ও প্রতিবার পানি দেওয়ার পূর্বে ড্রিংকার ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খাবার পানিতে ক্লোরিন ৩ পিপি এম মাত্রায় ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে, তবে ভ্যাকসিন বা ঔষধ পানিতে মিশিয়ে খাওয়ানোর সময় ক্লোরিন ব্যবহার করা উচিত নয়।
- চিক ড্রিংকার ৮-১০ দিন রাখতে হবে।
- এরপর জায়গা বাড়ানোর সাথে নিপল ড্রিংকার বা অন্য কোনো ড্রিংকার দিতে হবে।
- প্রতিটি মুরগির বাচ্চার পানি পান করার জন্য ২.৫ সে.মি. জায়গা দিতে হবে।
- আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানি পান করার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা :

ব্রুডারের তাপের উৎস থেকে উৎপন্ন কার্বন মনো-অক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ব্রুডার ঘরে জমা হয়ে বাচ্চার বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ছাড়া মলমূত্র থেকেসৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাই ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ ও দূষিত বায়ু নিষ্কাশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই–

- ঘরের প্লাস্টিক পর্দার উপরিভাগে অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য গ্যাস অপসারণের জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।
- ঘরের পরিবেশ বার বার পরীক্ষা করতে হয় ও দূষিত বায়ু অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পর্দা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- গরমের সময় দিনে পর্দা তুলে দিয়ে রাতে ঢেকে দিতে হবে।
- শীতের সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য ২ পর্দা প্লাস্টিকের পর্দা ব্যবহার করতে হবে।
- ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ু বের করার জন্য এগজস্ট ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

তাপ ব্যবস্থাপনা :

১) যদি লেয়ার বাচ্চা চিক গার্ডের মধ্যে সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকে ও চলাফেরা করে, খাদ্য ও পানি গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে এবং বাচ্চাগুলোর চলাফেরায় চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝতে হবে ব্রুডারে কাম্য তাপমাত্রা বজায় আছে।

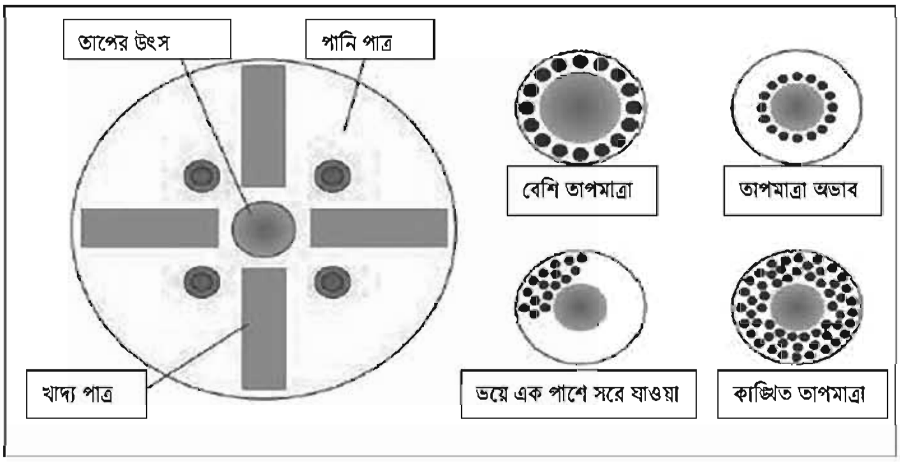

চিত্র:-৬.৪ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

২) যদি লেয়ার বাচ্চা ব্রুডারে নিচে তাপের উৎসের কাছে সমস্ত জড়ো হয়, চিঁ চিঁ শব্দ করে ঘাড় ছোট করে গুটিসুটি মেরে থাকে ও একটির উপর আরেকটি ওঠার প্রবণতা দেখায়, তখন-

- ব্রুডার পর্যাপ্ত তাপ উৎপাদনে সক্ষম কীনা তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ উৎপাদনে সক্ষম ব্রুডার ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনে,
- অতিরিক্ত বাল্বের তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ঘরে যাতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ঘরের নেট অংশে চট দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। পলিথিনের পর্দা ব্যবহার করা যাবে না।

৩) যদি লেয়ার বাচ্চাগুলো তাপের উৎস থেকে দূরে সরে গিয়ে চিকগার্ডের কাছাকাছি অবস্থান করে, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকে, খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়, পানি গ্রহণের মাত্রা কমে যায়, তবে-

- তাপের উৎসের সুইচ বন্ধ করতে হবে।
- ঘর ঠান্ডা করার জন্য বেড়া দেওয়া পর্দা তুলে দিতে হবে।
- চিক গার্ডের চারিদিকে চট ভিজিয়ে রাখলে ব্রুডিং তাপমাত্রা কিছুটা কমে।

আলো ব্যবস্থাপনা :

লেয়ার বাচ্চার ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাচ্চা খাবার ও পানির পাত্র দেখতে পারে। একদিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত মুরগির বাচ্চার জন্য আলোক সময়কাল ও আলোর তীব্রতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে বাচ্চা আলোর সাহায্যে পানি ও খাদ্য চিনতে পারে। দিনে আলো থাকলে আলাদা আলো প্রদানের প্রয়োজন নেই, তবে রাতে বাল্ব জ্বালিয়ে আলো দিতে হবে।

চিত্র:-৬.৫ নিয়ন্ত্রিত ঘরে লেয়ার বাচ্চার আলোর ব্যবস্থাপনা

- ১ম ও ২য় সপ্তাহে ২৪ ঘন্টাই আলো রাখা প্রয়োজন।
- তবে প্রথম থেকেই প্রতি রাতে আধা ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচয় করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হলে বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে পাইলিং (চাপাচাপি) করে মারা যেতে পারে।
- ৩য় সপ্তাহে ২৩ ঘন্টা আলো ও ১ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন।
- ৪র্থ সপ্তাহে ২২ ঘন্টা আলো ও ২ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন।
- কৃত্রিম আলোর উৎস প্রধানত বৈদ্যুতিক বাল্ব, তবে বিকল্প হিসাবে কেরোসিন বাতি ব্যবহার করা যায়।
- প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে।
- তার বা কর্ডের সাহায্যে বাল্ব ঝুলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বাতাসে বাল্ব দুলতে থাকলে ঘরে বা খাঁচায় ভৌতিক ভাব সৃষ্টি হয়।
- প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৬০০ ওয়াটের ১টি বাল্ব ব্যবহার করতে হবে এবং ১০ ফুট দূরত্বে একটি বাল্ব থাকবে।

২০২০

- আবার বিদ্যুৎ চলে গেলে আলো দেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা, যেমন চার্জার লাইট, হ্যাজাক লাইট, ছোট জেনারেটর, আইপিএস ইত্যাদি রাখতে হবে।
- বাল্বের সাথে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ।
- সপ্তাহে একবার বাল্ব পরিষ্কার করলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ।

বয়স অনুযায়ী মেঝেতে স্থান :

বয়স (দিন)	জায়গা/মুরগির বাচ্চা (র্বগ ফুট)	
	শীতকালে	গ্রীষ্মকালে
১-৩	০.২০	০.৩০
৪-৭	০.৩৫	০.৪৫
৮-১১	০.৪৫	০.৬০
১২-১৪	০.৫০	০.৮৫
১৫-২০	০.৬০	১.০০
২১ দিনের উপর	১.০০	১.০০

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিক গার্ডের উচ্চতা কত?
২. ব্রুডার থেকে কত দূরে চিক গার্ড বসাতে হয়?
৩. ১২ ফুট ব্যাসের চিকগার্ডে কত বাচ্চা ব্রুডিং করা যায়?
৪. ৫ ফুট ব্যাসের একটি হোভারের নিচে কতটি বাচ্চা রাখা যায়?
৫. ৫০০ বাচ্চাকে ভালোভাবে তাপ দেওয়ার জন্য কয়টি বাল্বের প্রয়োজন?
৬. প্রতি লিটার পানিতে কতটুকু গ্লুকোজ মেশাতে হয়?
৭. কতদিন পর্যন্ত বাচ্চাকে ব্রুডিং করা হয়?
৮. প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগির শরীরের তাপমাত্রা কত?
৯. ব্রুডার কাকে বলে?
১০. ১ম সপ্তাহে ব্রুডারের তাপমাত্রা কত?
১১. পরিবহন ধকল কমানোর জন্য পানিতে কতটুকু গ্লুকোজ মেশাতে হয়?
১২. কত দিন পর্যন্ত খাবার শেষ হওয়ার আগেই খাবার দিতে হবে?
১৩. পানির তাপমাত্রা প্রথমদিকে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাখা উচিত?
১৪. ব্রুডার ঘরে সাধারণত কোন গ্যাস বেশি উৎপন্ন হয়?
১৫. বাচ্চাকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক কত ঘণ্টা আলো দিতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হোভারের বাইরে পানি ও খাদ্যপাত্র কীভাবে স্থাপন করা হয়?
২. খাবার পানি কীভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়?
৩. ব্রুডারের তাপমাত্রা কীভাবে পরিমাপ করা হয়?

৪. বাল্ব তারের সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে কী অসুবিধা দেখা যায়?
৫. বাল্বের সাথে রিফ্লেক্টর ব্যবহারের সুবিধা কী?
৬. শীত ও গ্রীষ্মকালে বাচ্চার জন্য বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ কত?
৭. ব্রুডারে কাম্য তাপমাত্রা থাকলে বাচ্চারা কী আচরণ করে?
৮. ব্রুডারে বেশি তাপমাত্রা থাকলে বাচ্চার আচরণ কেমন হবে?
৯. ব্রুডারে কম তাপমাত্রা থাকলে বাচ্চার আচরণ কেমন হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রুডিং ঘরে বাচ্চা তোলার পূর্বে ব্রুডিং ঘর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে বর্ণনা কর।
২. বাচ্চার আচরণ দেখে কীভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়? বর্ণনা কর।
৩. ব্রুডিং হাউজে বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৪. ব্রুডিং ঘরের খাদ্য পানি বায়ু চলাচল তাপ ও আলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

সপ্তম অধ্যায়

লেয়ার ঘরে আলোক কর্মসূচি

৭.১ লেয়ার ঘরে আলোর গুরুত্ব

ডিম পাড়া মুরগিকে খোলা ঘরে প্রাকৃতিক আলো প্রদানের মাধ্যমে ১-৮ সপ্তাহ পালন করলে প্রথম ডিম পাড়ার বয়সের উপর খুব সামান্য প্রভাব পড়ে। তবে ৯-২০ সপ্তাহ বয়সে যদি প্রাকৃতিক আলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তবে মুরগি কম বয়সেই ডিম দেওয়া শুরু করে, ডিম দেওয়ার ধারাবাহিকতার দৈর্ঘ্য ও প্রথম পর্যায়ের ডিমগুলোর ওজন কম হয়। যার ফলে মুরগি পালন করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না।

তাই মুরগির বাচ্চা যদি এমন সময়ে ফোটে যখন প্রাকৃতিক আলো বাড়তে থাকে। তখন ব্রুডিং পর্যায়ে কৃত্রিম আলো ব্যবহার করা উচিত। তাতে মুরগি সঠিক সময়ে ডিম পাড়া শুরু করবে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ডিম দেবে। ফলে মুরগি পালনকারী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।

ডিমপাড়া মুরগির জন্য সঠিক আলোক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। আলোক ব্যবস্থাপনা–

(ক) সঠিক বয়সে এবং নির্দিষ্ট শারীরিক ওজনে মুরগিকে ডিম উৎপাদনে নিয়ে আসে।
(খ) অধিক হারে ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে।
(গ) বাজারের চাহিদা অনুযায়ী লাভজনকভাবে ডিমের আকার এবং ডিম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।
(ঘ) কাঙ্খিত মাত্রায় ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে।

লেয়ার আলোক কর্মসূচি কিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করে :

(ক) বাড়ন্ত অবস্থায় মুরগির ঘরে আলোক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা যাবে না।
(খ) ডিম পাড়া শুরু হলে আলোক দৈর্ঘ্য কমানো যাবে না।
(গ) মুরগির কাঙ্ক্ষিত ওজন ও বয়সের সাথে মিল রেখে ডিম উৎপাদনের প্রাথমিক ধাপে ধাপে আলো প্রদানের সময়কাল বাড়ানো।

ডিম পাড়া মুরগির জন্য দৈনিক ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। দিনের বেলায় আলো যদি ১৪-১৬ ঘণ্টার কম হয় তবে কৃত্রিমভাবে আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (২০ × ১২) ২৪০ বর্গ ফুটের ১টি ঘরের জন্য ৭ ফুট উঁচুতে ৬০ ওয়াটের ১টি বাল্ব ১০ লাক্স উজ্জ্বলতায় আলোক প্রদানের জন্য যথেষ্ট।

তিন সময়ে মুরগির ঘরে আলো প্রদান করা যেতে পারে–

১. সকালে
২. সন্ধ্যায়
৩. সকালে ও সন্ধ্যায়

১. সকালে :

প্রাকৃতিক আলোক দৈর্ঘ্য যখন স্বল্পমেয়াদি হয় তখন সকালে কৃত্রিম আলো প্রদান করা যেতে পারে। এটি গ্রীষ্মের গরমে ভোরের কয়েক ঘণ্টা দিনের সবচেয়ে ঠাণ্ডা এবং এই সময়ে কৃত্রিম আলো প্রদানের মাধ্যমে মুরগির খাদ্য গ্রহণ করানো হয়। যার ফলে সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন হার ধরে রাখা যায়।

২. সন্ধ্যায় :

সূর্যাস্তের সময়ের সাথে সন্ধ্যায় আলোক প্রদান সম্পর্কযুক্ত। শীত মৌসুমে সকালে খুব ঠাণ্ডা থাকে বিধায় মুরগির চলাচল সবচেয়ে কম হয়। তাই এ অবস্থায় উৎপাদনের ভালো ফলাফল পেতে সন্ধ্যায় আলোক প্রদান করা ভালো।

৩. সকালে ও সন্ধ্যায় :

যদি দিনের আলো ১০ ঘণ্টা হয় তবে সকালে সূর্য ওঠার আগে ৩ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে ৩ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালিয়ে আলো প্রদান করতে হবে।

বয়স অনুযায়ী মুরগির ঘরের আলোক কর্মসূচি :

বয়স (সপ্তাহ)	আলোক সময়কাল (ঘন্টা) (প্রাকৃতিক+কৃত্রিম) আলো	আলোর প্রখরতা
১-২	২৪	২০-৩০ লাক্স
৩	২৩	
৪	২২	
৫	২১	১০-২০ লাক্স
৬	২০	
৭	১৯	
৮	১৮	
৯	১৭	
১০	১৬	
১১	১৫	
১২	১৪	
১৩	১৩	২০-৩০ লাক্স
১৪-১৮	১২	
১৯	১৩	২০-৩০ লাক্স
২০	১৩.৫	
২১	১৪	
২২	১৪.৫	
২৩	১৫	
২৪	১৫.৫	
২৫ ও এর উপরে	১৬	

তবে ১৮ সপ্তাহ শেষে কাঙ্ক্ষিত ওজন না এলে সেক্ষেত্রে ওজন না আসা বা ১০% ডিম উৎপাদন না হওয়া পর্যন্ত আলোক সময়কাল বাড়ানো যাবে না।

মুরগির ঘরে ব্যবহৃত বাল্বসমূহ :

ক) সাধারণ আলোক বাল্ব

- দামে সস্তা ও সহজে লাগানো যায়।
- স্থায়িত্ব ৭৫০-১০০০ ঘণ্টা।

২০২০

খ) ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব

- বেশি দামি।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে দক্ষতা সাধারণ আলোর বাল্বের তুলনায় ৩-৪ গুণ বেশি।
- স্থায়িত্ব সাধারণ আলোর বাল্বের তুলনায় ৯ গুণ বেশি।

গ) মারকারি বাল্ব

- খুব ব্যয়বহুল
- স্থায়িত্ব ২৪,০০০ ঘণ্টা।

বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো :
বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

১.বাল্ব থেকে বাল্বের দূরত্ব :
মুরগি থেকে বাল্বের যে দূরত্ব, বাল্ব থেকে বাল্বের দূরত্ব হবে তার ১.৫ গুণ এবং জায়গা সমভাবে আলোকিত করার জন্য এক বাল্ব থেকে আরেক বাল্বের দূরত্ব ১২ ফুটের বেশি হবে না এবং পাশের দেয়াল থেকে বাল্বের দূরত্ব ৬ ফুট হবে।

২. **প্রতিফলক :**
প্রতিফলক ব্যবহার করলে আলোর উজ্জ্বলতা ৫০% বৃদ্ধি পায়।

৩. **বাল্ব লাগানোর উচ্চতা :**
মুরগির ঘরে বাল্ব সাধারণত ৭-৮ ফুট উঁচুতে লাগানো উচিত এবং বাল্বের শেড ব্যবহার করতে হবে।

৪. **বাল্বের আলোক উজ্জ্বলতা :**
১০ লাক্স আলোক উজ্জ্বলতার জন্য ৭-৮ ফুট উচ্চতায় ১টি ৬০ ওয়াট বিশিষ্ট বাল্ব প্রতি ২৪০ বর্গফুট জায়গার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডিমপাড়া মুরগির জন্য দৈনিক কত ঘণ্টা আলো প্রয়োজন?
২. কোনো কোনো সময়ে মুরগির ঘরে আলো প্রদান করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৩. লেয়ারের আলোক কর্মসূচি কী কী মৌলিক নীতি অনুসরণ করে?
৪. বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানোর ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে?
৫. মুরগির ঘরে ব্যবহৃত বাল্বসমূহ কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

৬. বিভিন্ন সময়ে আলো প্রদান পদ্ধতি উল্লেখ কর।
৭. বয়স অনুযায়ী মুরগির ঘরের আলোক কর্মসূচি বর্ণনা কর।
৮. লেয়ার ঘরে আলোর গুরুত্ব লিখ।

২০২০

অষ্টম অধ্যায়
লেয়ারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৮.১ লেয়ারের জন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ

মুরগির খাদ্য :

যে সমস্ত দ্রব্য আহার্য মুরগির শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, উৎপাদন, প্রজনন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে তাকে খাদ্য বলা হয়। একটি মুরগির খামারে মোট খরচের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগই খাদ্য বাবদ খরচ হয়।

লেয়ারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। যে উপকরণের মধ্যে যে উপাদান বেশি মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাকে সেই উপাদান যুক্ত খাদ্য বলা হয়।

সুষম খাদ্য :

মুরগির দেহের নির্বাহী কার্য পরিচালনা, শারীরিক বৃদ্ধি, উৎপাদন, পালক গঠন ও দেহের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

হাঁস-মুরগির খাদ্যের পুষ্টি উপাদান :

১. শর্করা বা কার্বহাইড্রেট
২. আমিষ বা প্রোটিন
৩. চর্বি বা স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
৪. ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
৫. খনিজ পদার্থ বা মিনারেল ও
৬. পানি

৮.২ লেয়ারের পুষ্টি উপকরণসমূহের নাম :

খাদ্য উপকরণে পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের ভিত্তিতে খাদ্য উপাদান মোট ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

(১) শর্করা জাতীয় উপাদান
(২) আমিষ জাতীয় উপাদান
(৩) চর্বি বা তেল জাতীয় উপাদান
(৪) খনিজ পদার্থ জাতীয় উপাদান
(৫) ভিটামিন জাতীয় উপাদান

হাঁস-মুরগির খাদ্যের ৭৫-৮০% ই শর্করা জাতীয় খাদ্য। সাধারণত যে দ্রব্যে ২০% এর কম আমিষ থাকে তাদের শর্করা জাতীয় খাদ্য হিসেব গণ্য করা হয়। সব ধরনের দানা শস্যই শর্করা প্রধান খাদ্য।

শর্করা জাতীয় উপকরণ আবার দুইভাগে বিভক্ত, যেমন-

(ক) দানা জাতীয় খাদ্য
(খ) আঁশ জাতীয় খাদ্য

দানা জাতীয় খাদ্য	আঁশ জাতীয় খাদ্য
গম	চালের মিহি কুঁড়া বা পোলিশ
ভুট্টা	গমের ভুসি
কাউন	গমের দানা মিশ্রিত ভুসি
চাল	বিভিন্ন শাকসবজি
চালের খুদ	
সরগম বা জোয়ার	
যব	

চাল : চাল এবং চালের উপজাত দ্রব্যাদি মুরগির জন্য সহজপাচ্য ও সহজলভ্য শর্করা জাতীয় খাবার। খুদ বা ভাঙা চালের মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। তাই বাচ্চা মুরগি ও ডিমপাড়া মুরগির জন্য খুদ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। খুদের মধ্যে আমিষ এবং ভিটামিন বি$_2$ থাকে। খুদে ১০-১২% আমিষ, ১৩% চর্বি এবং গড়ে ১১-১২% আঁশ থাকে।

ভুট্টা : ভুট্টা সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হওয়ায় মুরগি বেশ পছন্দ করে। মুরগির খাদ্য হিসেবে ভুট্টা খুবই জনপ্রিয়। হলুদ ভুট্টার মধ্যে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ অধিক থাকে। ভুট্টা ছোট ছোট করে ভেঙে বা গুঁড়া করেও হাঁস-মুরগির খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গম : গমকে অনেকে হাঁস-মুরগির আদর্শ খাদ্য বলে মনে করেন। গম সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য। তদুপরি অন্যান্য দানাদার খাদ্যের তুলনায় আমিষের পরিমাণ অধিক। গমে সন্তোষজনক পরিমাণ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে। গম ভাঙা ও গমের ভুসি হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

যব : অন্যান্য দানা শস্যের সাথে মিশিয়ে যবকে মুরগির খাদ্য হিসেবে দেওয়া যায়। যবে আঁশের পরিমাণ অধিক। অতিরিক্ত যব খাওয়ালে মুরগির চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়।

শাকসবজি : বেগুন, মিষ্টি আলু, লাউ, কুমড়া এবং অন্যান্য সবজির খোসা ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ সিদ্ধ করে মুরগিকে খেতে দেওয়া যায়। এসব খাদ্য ভিটামিন সমৃদ্ধ। বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, বীট, পালং শাক, পুঁইশাক, নটেশাক, মূলা প্রভৃতির পাতা কুঁচি কুঁচি করে কেটেও মুরগিকে খেতে দেওয়া যায়। এসব খাদ্য ক্যারোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ।

চালের মিহি কুঁড়া : চালের কুঁড়া মুরগির একটি উৎকৃষ্ট খাবার। এতে চালের গুঁড়া থাকার ফলে শর্করার পরিমাণ অধিক। কুঁড়া সহজপাচ্য। কুঁড়া খাওয়ানোর আগে দেখে নিতে হবে তা ভেজা বা ছত্রাক আক্রান্ত কীনা।

গমের ভুসি : গমের দানার মোটা অংশই ব্যবহৃত হয় ভুসি হিসেবে। গমের ভুসির মধ্যে গড়ে ১৬% আমিষ থাকে। গম ও ভুট্টা তুলনায় গমের ভুসির আমিষ উন্নতমানের। এতে নিয়াসিন ও থায়ামিনের পরিমাণ অধিক। ডিমপাড়া মুরগির ক্ষেত্রে ১৫% গমের ভুসি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আমিষ জাতীয় উপকরণ দুইভাগে বিভক্ত, যেমন–
(ক) প্রাণিজ আমিষ খাদ্য
(খ) উদ্ভিজ্জ আমিষ খাদ্য

প্রাণিজ আমিষ খাদ্য	উদ্ভিজ্জ আমিষ খাদ্য
বিভিন্ন মাছের শুঁটকি	সয়াবিন খৈল/সয়াবিন
মৎস্য উপজাত	তিল খৈল
চিংড়ি মাছ ও তার উপজাত	নারিকেল খৈল
পশুর নাড়িভুঁড়ি ও হাড়ের গুঁড়া	বাদাম খৈল
প্রোটিন কনসেনট্রেট	তিসি খৈল
ইপিল ইপিল পাতা	তুলাবীজের খৈল
শুকনা রক্তের গুঁড়া	ডাল ভাঙা
হাঁস-মুরগির উপজাত	
হ্যাচারি উপজাত	
ঝিনুক ও শামুকের মাংস	
কেঁচো মিল	
ননীযুক্ত গুঁড়া দুধ	

ফিশ মিল বা শুটকি মাছের গুঁড়া : মাছ এবং তার বর্জ্য পদার্থকে শুকিয়ে চূর্ণ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে প্রাপ্ত দ্রব্যই ফিশ মিল। এতে আমিষের পরিমাণ ৪৫-৫৫%। মুরগির জন্য ফিশ মিল একটি আদর্শ খাদ্য। বাচ্চা মুরগিতে মাছের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য অল্প পরিমাণে ফিশ মিল ব্যবহার করতে হবে।

মিট মিল : মিট মিল হলো শুকানো চূর্ণীকৃত মাংস বা মাংসের অংশ। এতে আমিষের পরিমাণ ৫০-৫৫%। মিট মিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও থাকে।
কেঁচো মিল : কেঁচো থেকে তৈরি খাদ্যকেই বলা হয় কেঁচো মিল। ফিস মিল, মিট মিল, বোন মিল প্রভৃতির বিকল্প হিসেবে কেঁচো মিল ব্যবহার করা যায়। এতে অশোধিত আমিষের পরিমাণ ৫৯.৪৭%।

হাড়ের গুঁড়া ও মাংসের অবশিষ্টাংশ : খুর, শিং ও হাড় ব্যতীত প্রাণীর দেহের মাংসের অবশিষ্টাংশ শুকিয়ে ও গুঁড়ো করে এ খাদ্য পাওয়া যায়। এতে আমিষের পরিমাণ ৫৫%, খনিজ পদার্থের পরিমাণ ৪%। হাড়ের গুঁড়া ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসসমৃদ্ধ। উত্তমরূপে পরিশোধন করার পর এগুলো মুরগির খাদ্যের সাথে মেশানো হয়।

রক্তের গুঁড়া বা ব্লাড মিল : কসাইখানা থেকে পশুর রক্ত সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে চূর্ণ করা হয়। তবে এদেশে পর্যাপ্ত পশু রক্ত পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আমিষের পরিমাণ প্রায় ৭৫-৮০%। এতে সামান্য পরিমাণে খনিজ পদার্থও থাকে। বাচ্চা মুরগির খাদ্যের ব্লাড মিল দেওয়া অনুচিত।

পোল্ট্রির শুকনা বিষ্ঠা : এতে অশোধিত আমিষ থাকার ফলে এটি চালের কুঁড়ার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির ক্ষেত্রে রেশনে যথাক্রমে ৫-১০% এবং ২০% হারে এটি ব্যবহার করা যায়।

২০২০

সয়াবিন মিল : সয়াবিন ভালো করে সিদ্ধ করে শুকানোর পর গুঁড়ো করে বা তেল বের করে নেয়ার পর মিল হিসেবে মুরগিকে খাওয়ানো যায়। এতে প্রায় ৪৫% আমিষ ব্যতীতও সামান্য পরিমাণে চর্বি ও পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন থাকে।

তিলের খৈল : এতে আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫% ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ২.৩%। তিলের খৈল মুরগির জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। চীনা বাদামের খৈল ও তিলের খৈল অর্ধেক পরিমাণে মিশিয়ে মুরগির খাদ্য তৈরি করা যায়।

সরিষার খৈল : সরিষা থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে অংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সরিষার খৈল। এতে ৩৭-৪০% আমিষ, ০.৬% ক্যালসিয়াম এবং ১.০% ফসফরাস থাকে। বিশেষ স্বাদ ও সুগন্ধের কারণে মুরগি এ খৈল পছন্দ করে।

চীনা বাদামের খৈল : চীনা বাদামের খৈল সুস্বাদু। অন্যান্য খাদ্যের সাথে চীনা বাদামের খৈল মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়। এতে আমিষ ৪৬.৫%, চর্বি বা স্নেহ পদার্থ ৪%, ক্যালসিয়াম ০.২৮% এবং ফসফরাস ১.২৮% থাকে।

নারকেলে খৈল : এ খৈলে আমিষের পরিমাণ ২০-২৫%। তবে বেশি দিনের পুরাতন খৈল মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ কিছুদিন রেখে দিলেই খৈলে ছত্রাক জন্মায় এবং খাবারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

চর্বি জাতীয় উপকরণ :

সয়াবিন	সূর্যমুখী ও তুলা বীজের তেল	মাছের তেল
তিল	সূর্যমুখী ও তুলা বীজের খৈল	গবাদি পশুর চর্বি (তাল্লু)
নারকেল	চর্বি জাতীয় খাদ্য	হাঁস-মুরগি তেল

খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণ :

ঝিনুক চূর্ণ	ডিমের খোসা চূর্ণ	শামুক চূর্ণ
সাধারণ লবণ	ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	ফিশ মিল
ডিমের খোসা চূর্ণ	চুনা পাথর ক্যালসিয়াম কার্বনেট	ম্যাঙ্গানিজ লবণ

শামুক ও ঝিনুক খোসাঃ
শামুক ও ঝিনুকের খোসা গুঁড়ো করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।। তবে এ খাদ্য সর্বোচ্চ ১-৩% মুরগির খাদ্যের সাথে মেশানো উচিত। ঝিনুকের গুঁড়ায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩৭-৩৮%।

চুনা পাথর : ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস হলো চুনা পাথর। মুরগির খাদ্যে ২-৪% হারে ব্যবহার করা যায়। এতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩৮%। এটি মুরগির হাড় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বোন মিল : এটি একটি শুষ্ক খাদ্য। হাড়কে বায়ু চাপের উপস্থিতিতে বাষ্প ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়। মুরগির খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

সাধারণ খাদ্য লবণ : মুরগির খাদ্যে অল্প পরিমাণে লবণ যোগ করা হলে মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি ও খাদ্য ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এটি সোডিয়াম ও ক্লোরাইডের প্রধান উৎস। তবে মুরগির খাদ্যে অধিক মাত্রায় লবণ যোগ করা ঠিক নয়। খাবারের সাথে ০.৫% মাত্রায় লবণ যোগ করতে হয়। লবণ মুরগির পানি গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া লবণ মুরগির খাদ্যকে সুস্বাদু করে ও হজমে সাহায্য করে।

ভিটামিন জাতীয় উপকরণ :
শাকসবজি, মাছের তেল, অঙ্কুরিত গম ও ছোলা, হলুদ ভুট্টা, সবুজ ঘাস চালের মিহি কুঁড়া ইত্যাদিতে কম বেশি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন থাকে। তারপরও খাদ্যের সাথে কৃত্রিম ভিটামিন প্রিমিক্স হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।

৮.৩ লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সুষম খাদ্য কী?
মুরগির দেহের নির্বাহী কার্য পরিচালনা, শারীরিক বৃদ্ধি, উৎপাদন, পালক গঠন ও দেহের মধ্যে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্যকে সুষম খাদ্য বা রেশন বলে। সুষম খাদ্যে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও পানি সঠিক অনুপাত অনুযায়ী বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে এ সকল উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে থাকে।

সুষম খাদ্যের গুরুত্ব :
মুরগিকে সুষম খাদ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সুষম খাদ্য মুরগিকে সরবরাহ না করা হয় তবে যে খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকে তার কারণে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

মুরগিকে সুষম খাদ্য প্রদান করলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

- উৎপাদন (ডিম, মাংস, বাচ্চা ফোটার হার, সুস্থ সবল বাচ্চা) বৃদ্ধি পায়।
- অপুষ্টিজনিত রোগ এবং অন্যান্য রোগ কম হয়।
- সম্পদ ও শ্রমিকের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।
- খামারে লাভ বেশি হয়।
- খামারের ব্যবহারিক মান বৃদ্ধি পেয়ে বাজারের প্রসার ঘটে।
- উৎপাদন বাড়ায়, খামারি লাভবান হয়।
- ডিম এবং মাংসের গুণগতমান ভালো হয়।
- অল্প জায়গায় অধিক ঘনত্বে মুরগি পালন করা যায়।
- অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থ সবল মুরগি পাওয়া যায়।
- মুরগির বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়।
- মুরগির মৃত্যু হার হ্রাস পায়।

পুষ্টির উৎস অনুসারে সুষম খাদ্যে উপকরণ যোগ করার নিয়ম :

১. শক্তির জন্য : দানাশস্য ও এর উপজাত ৬০-৬৫ %

২. আমিষের জন্য : প্রাণিজ উৎস = ৫-১৫%, উদ্ভিজ্জ উৎস = ১৮-২২%

৩. খনিজ মিশ্রণ : ২-৯ %

৪. ভিটামিন : ভিটামিন প্রিমিক্স প্রতি ১০০ কেজিতে ২৫০-৩০০ গ্রাম। ২০২০

লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়–

১. খাদ্যসামগ্রী বা উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা :
সুষম খাবার তৈরিতে পরিচিত ও সহজলভ্য উপকরণ নির্বাচন করা উচিত। পরিচিত উপকরণের গুণগতমান সহজে জানা যায়। স্থানীয় মূল্য যাচাই করা যায়। কোনো উপকরণের ঘাটতি পড়লে সহজে সংগ্রহ করা যায়। সহজলভ্য উপকরণের পরিবহন খরচ কম হয়। বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও মজুদ করা যায়। উপকরণের গুণগতমান খারাপ হলে পরিবর্তন করা যায়।

২. উপকরণের মূল্য :
খাদ্য উপকরণ যত সস্তায় সংগ্রহ করা যায়, খাদ্য প্রস্তুতে খরচের তত সাশ্রয়। ফলে ডিম উৎপাদনে খরচ কমে যায়। খামারে মোট খাদ্য খরচের ৬৫-৭৫ ভাগ পর্যন্ত খরচ হয় খাদ্যের জন্য। মানুষের খাদ্য উপকরণের সাথে প্রতিযোগিতা কমাতে যতদূর সম্ভব সস্তায় বিকল্প খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা উচিত।

৩. খাদ্যের গুণগতমান :
প্রস্তুত খাদ্য অবশ্যই গুণগতমানের হওয়া উচিত, খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বে প্রতি উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) পরীক্ষা করতে হয়। কোনো প্রকার পচা, ছত্রাক যুক্ত অথবা গন্ধযুক্ত খাবার ব্যবহার করা যাবে না। যে সমস্ত কারণে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়, তা হলো-

- উপকরণে আর্দ্রতা (১২% এর উপরে হলে) বেশি থাকলে
- বেশি পুরোনো হলে
- সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে
- ঘরের মেঝে ভিজা ও আর্দ্র থাকলে
- তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকলে
- সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত না করার ফলে
- পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ হলে ভেজাল থাকলে
- খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় কীটনাশক ব্যবহার করলে
- ছত্রাক ও মোল্ডযুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করলে

৪. খাদ্যের পরিপাচ্যতা ও সুস্বাদুতা :
রুচিসম্মত খাদ্য না হলে মুরগি খায় না। দানা জাতীয় খাদ্য বেশি মিহি হলে মুরগি কম খায়। কোনো উপকরণের দানা বড় থাকলে মুরগি বেছে বড় দানা আগে খায়, ফলে অন্যান্য উপাদান তলে পড়ে থাকে। বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। উপকরণের মিশ্রণ সুষম হতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের দানা যতদূর সম্ভব সুষম হতে হবে। খাদ্যের ভেজাল মিশ্রিত থাকলে এবং খাদ্য পচা ও ছত্রাকযুক্ত হলে মুরগি খাদ্য পছন্দ করবে না। ক্রাম্বল ও পিলেট খাদ্য মুরগি বেশি পছন্দ করে।

৫. জাত :
হালকা জাতের লেয়ারের তুলনায় ভারী জাতের লেয়ার বেশি খাদ্য খায়। সাদা জাতের লেয়ারের তুলনায় রঙিন জাতের লেয়ার বেশি খাদ্য খায়।

৬. বয়স :
২০২০ বয়স অনুসারে বিভিন্ন পুষ্টিমানের খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বাচ্চা অবস্থায় বেশি শক্তি ও আমিষের প্রয়োজন, ডিম পাড়া মুরগির খাদ্যে শক্তি ও আমিষের প্রয়োজন পরিমাণ বাচ্চার তুলনায় কম লাগে।

৭. লিঙ্গ :
মোরগ-মুরগির তুলনায় বেশি খাদ্য খায় এবং দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পায়।

৮. ওজন :
লেয়ার মুরগির ওজন বৃদ্ধি সমানুপাতে না হলে, কম ওজনের মুরগিকে আলাদাভাবে খাদ্যে আমিষের হার বৃদ্ধি করে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

৯. আবহাওয়া :
পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফলে শরীরের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যে পুষ্টিমান পুনর্বিন্যস্ত করতে হয়।

১০. বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার পরিমাণ বা মাত্রা :

উপাদান	সর্বোচ্চ ব্যবহার মাত্রা (%)
ভূট্টা	৬০
গম	৫০
চালের কুঁড়া	১৫-২০
গমের ভুসি	১০
সয়াবিন মিল	৪০
তিলের খৈল	১০
সরিষার খৈল	৫
সূর্যমুখী খৈল	২০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১০
রক্তের গুঁড়া	৩
পোল্ট্রির উপজাত	৫
লবণ	০.৩-০.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	১-২
ঝিনুক	১-৩
লাইম স্টোন	১-৩
অ্যান্টিবায়োটিক	০.১-০.৫
ভিটামিন৬০	উৎপাদনকারীর পরামর্শ মতো

৮.৪ লেয়ারের খাদ্য উপকরণসমূহ মিশ্রণের নিয়মাবলী

লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির ধাপ :

- প্রথমে ঘরের মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- যে সকল খাদ্য উপাদান অধিক পরিমাণে লাগে যেমন- ভুট্টা, গম, কুঁড়া, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট সেগুলো ওজন করতে হবে ও মেঝেতে ঢালতে হবে।
- খাদ্য উপাদান প্রতিটি ঢালার পর হাত দিয়ে সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- পরিমাণে কম লাগে এমন উপাদান (ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, লবণ, খনিজ মিশ্রণ) ওজন করে এক সঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- এ মিশ্রণকে পূর্বের খাদ্য উপাদানের স্তূপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ২০২০

- এর পর হাত দিয়ে বা মেশিনের সাহায্যে ৩-৪ বার খাদ্য ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- সমস্ত মিশ্রণকে বস্তায় ভরে মজুদ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।
- এ ধরনের মিশ্রিত খাদ্যকে ম্যাশ খাদ্য বলে।

ভালো খাদ্যের গুণাগুণ সঠিক আছে কীনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন-

- খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহ অবশ্যই প্রয়োজনীয় পুষ্টি মাত্রার অধিকারী হতে হবে।
- খাদ্য অবশ্যই ফাংগাস বা আফলা টক্সিন মুক্ত হতে হবে।
- খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহ যেন কোনো অবস্থাতেই চাকা লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- খাদ্যের আর্দ্রতা ১২% এর বেশি হওয়া উচিত নয় এবং এটি অবশ্যই দুর্গন্ধমুক্ত ও পোকামুক্ত হতে হবে।
- ম্যাশ ফিডে গুঁড়া বা পাউডার থাকে। তবে এটি ২৫-৩০% এর বেশি যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত।

৮.৬ তৈরিকৃত খাদ্যের প্রকারভেদ :

তৈরিকৃত খাদ্য ৩ প্রকার

১. ম্যাশ খাদ্য

২. পিলেট খাদ্য

৩. ক্রাম্বল খাদ্য

৮.৭ লেয়ারের বয়স অনুযায়ী ব্যবহৃত সুষম খাদ্য

ডিমপাড়া মুরগির প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টির চাহিদা মেটাতে যতটা সম্ভব বেশি প্রকারের খাদ্য উপাদান দিয়ে মিশ্রিত খাদ্য তৈরি করতে হবে, এতে খাদ্য সুস্বাদু ও সুষম হবে। লেয়ারের খাদ্যকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা হয়। যথা—

১. স্টার্টার রেশন (০-৮ সপ্তাহ)

২. গ্রোয়ার রেশন (৯-১৭ সপ্তাহ)

৩. লেয়ার রেশন (১৮-৭২ সপ্তাহ)

বিভিন্ন পর্বে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ

পুষ্টি উপাদান	লেয়ার স্টার্টার (০-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার গ্রোয়ার (৯-১৭ সপ্তাহ)	লেয়ার (১৮-৭২ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কি. ক্যালরি/কেজি খাদ্য)	২৯০০	২৮০০	২৮০০
আমিষ (%)	১৮-১৯	১৬-১৭	১৬-১৭
আঁশ (%)	৩.০	৫.০	৪.০
ক্যালসিয়াম (%)	১.০	১.০	৩.৫
প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম (%)	০.৫	০.৫	০.৫
চর্বি (%)	৩.৫০-৪.০	৪.৫	৩-৩.৫
লাইসিন (%)	১.০	০.৭	০.৫
মিথিওনিন (%)	০.৪০	০.৩০	০.৩৫
জলীয় অংশ (%)	১০	১০	১০

ভিটামিন এ (ইউ এস পি)	১৪০০	১৪০০	৪০০০
ভিটামিন-ডি ৩ (আই চিক ইউ)	২০০	২০০	৫০০
ভিটামিন ই (আই ইউ)	৫	৪	৪
থায়ামিন (বি-১ মিলিগ্রাম)	১.৮	১.৮	১.৮
রাইবোফ্লোবিন (বি-২) (মি.গ্রাম)	০.৬	১.৮	১.৮
পেন্টোথিনিক অ্যাসিড(মি. গ্রাম)	১০.০	১০.০	২.২
নিকোটিনিক অ্যাসিড (মি. গ্রাম)	৫	১১	১১
পাইরোডক্সি (মি. গ্রাম)	৩	৩	৩
বায়োটিন (মি. গ্রাম)	০.০৯	০.১০	০.১০
কলিন (মি. গ্রাম)	৯০০	৯৮০	৫০০

লেয়ার মুরগির বিভিন্ন পর্বের জন্য খাদ্য তালিকা :

পুষ্টি উপাদান	লেয়ার স্টার্টার (০-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার গ্রোয়ার (৯-১৭ সপ্তাহ)	লেয়ার (১৮-৭২ সপ্তাহ)
ভুট্টা (কেজি)	৫৪.২৫	৫২	৪৪
চালের কুঁড়া (কেজি)	১৭	২২	২৪
সয়াবিন মিল (কেজি)	১৭	১১	১৩
প্রোটিন কনসেনট্রেট (কেজি)	১০	১০	১০
ঝিনুকের গুঁড়া (কেজি)	১.০	৪.২৫	৭.৫
লবন (সর্বোচ্চ) (গ্রাম)	৪৫০	৪৫০	৪৫০
ভিটামিন মিনারাল প্রিমিক্স (গ্রাম)	২২৫	২২৫	২২৫
লাইসিন (গ্রাম)	৫০	৫০	৫০
মিথিওনিন (গ্রাম)	৫০	৫০	-
টক্সিন বাইন্ডার (গ্রাম)	-	-	৫০
কোলিন ক্লোরাইড (গ্রাম)	১০০	১০০	১০০
মোট =	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি

উপরের উপাদানগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়, যেখানে মুরগির বয়স ও উৎপাদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপস্থিত থাকবে।

বাচ্চা মোরগ-মুরগির সুষম রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন (%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. গম ভাঙা	৪৬	৪৬x৩২৫০=১৪৯৫০০	৪৬x১২/১০০=৫.৫২	৪৬x০.০৪/১০০=০.০১৮৪	৪৬x০.১৩/১০০=০.০৫৯৮
২. চালের কুড়া	১৫	৪২৯০০	১.৮০	০.০০৬০	০.০২৪০
৩. চালের ক্ষুদ	১০	১৬৩০০	১.১০	০.০১২০	০.০২১০
৪. তিলের খুদ	১২	২২৯২০	৪.২০	০.২৪০০	০.০৩৬০
৫. শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৫	৩৯৬০০	৭.৫০	০.৬০০০	০.৪২০০
৬. হাড়ের গুঁড়া	১.০			০.২৪০০	০.১২০০
৭. ঝিনুক চূর্ণ	০.৫			০.১৮৫০	
৮. লবণ	০.৫				
মোট	=১০০.০	=২৭১২০০/১০০	=২০.১২	=১.৩০১৪	=০.৬৮০৮
এম্বাভিট-জি.এস	০.২৫গ্রাম				

তৈরিকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৭১২.২০কিলোক্যালোরি/কেজি	২০১২%	১.৩০১৪%	০.৬৮০৮%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা	১০০	২৭০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	২০%	১%	০.৫%

বাড়ন্ত বয়সের মোরগ-মুরগির সুষম রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন(%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. গম ভাঙা	৪৬	৪৬x৩২৫০=১৪৯৫০০	৪৬x১২/১০০=৫.৫২	৪৬x০.০৪/১০০=০.০১৮৪	৪৬x০.১৩/১০০=০.০৫৯৮
২. চালের কুঁড়া	২০	৫৭২০০	২.৪০	০.০০৮০	০.০৩২০
৩. চালের খুদ	১০	১৬৩০০	১.১০	০.০১২০	০.০২১০
৪. তিলের খুদ	১২	২২৯২০	৩.৬০	০.২৪০০	০.০৩৬০
৫. শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১০	২৬৪০০	৫.০০	০.৪০০০	০.২৮০০
৬. হাড়ের গুঁড়া	১.০	-	-	০.২৪০০	০.১২০০
৭. ঝিনুক চূর্ণ	০.৫	-	-	০.১৮৫০	-
৮. লবণ	০.৫	-	-	-	-
মোট (কেজি)	১০০	=২৭২৩২০/১০০	=১৭.৬২	=১.১০৩৪	=০.৫৪৮৮
এম্বাভিট-জি.এস	২.২৫				
তৈরিকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৭২৩.২০ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৭.৬২%	১.১০৩৪%	০.৫৪৮৮%
রেশনের পুষ্টি উপাদানেরচাহিদা	১০০	২৭০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৬%	১%	০.৫%

লেয়ার রেশন মুরগির সুষম রেশন তৈরির হিসাব

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্রুড প্রোটিন(%)	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)
১. গম ভাঙা	২৪	২৪x৩২৫০=৭৮০০০	২৪x১২/১০০=২.৮৮	২৪x০.০৪/১০০=০.০০৮৯৬	২৪x০.১৩/১০০=০.০৩১২
২.ভুট্টা ভাঙা	২০	৬৭৪০০	১.৮০	০.০৪০	০.০২০০
৩. চালের কুঁড়া	২০	৫৭২০০	২.৪০	০.০০৮০	০.০৩২০
৪. তিলের খৈল	১২	২২৯২০	৪.২০	০.২৪০০	০.০৩৬০
৫. শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৪	৩৬৯৬০	৭.০০	০.৫৬০০	০.৩৯২০
৬. হাড়ের গুঁড়া	৫.৫	-	-	২.০৩৫০	-
৭. ঝিনুক চূর্ণ	৩.০	-	-	০.২০০	০.৩৬০০
৮.সয়াবিন তেল	১.০	৮৮০০	-	-	-
৯. লবণ	০.৫	-	-	-	-
মোট (কেজি)	১০০	২৭১২৮০	১৮.২৮	৩.৫৭৬৬	০.৭১২
এম্বাভিট-জি.এস	০.২৫গ্রাম				
তৈরিকৃত রেশনের পুষ্টিমান		২৭১২.৮০ কিলোক্যালোরি/কেজি	২৮%	৩.৫৭৬৬%	০.৭১২%
রেশনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা	১০০	২৭০০ কিলোক্যালোরি/কেজি	১৮%	৩.৫%	০,৫%

৮.৮ লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ

ব্রয়লারের সুষম খাদ্য তৈরি ধাপ :

- প্রথমে ঘরের মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- যে সকল খাদ্য উপাদান অধিক পরিমাণে লাগে যেমন- ভূট্টা, গম, কুঁড়া, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট সেগুলো ওজন করতে হবে ও মেঝেতে ঢালতে হবে।
- খাদ্য উপাদান প্রতিটি ঢালার পর হাত দিয়ে সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- পরিমাণে কম লাগে এমন উপাদান (ভিটামিন, ডিসিপি, লাইসিন, মিথিওনিন, লবণ, খনিজ মিশ্রণ) ওজন করে একসঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- এ মিশ্রণকে পূর্বের খাদ্য উপাদানের স্তূপের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- এর পর হাত দিয়ে বা মেশিনের সাহায্যে ৩-৪ বার খাদ্য ভালোভাবে মেশাতে হবে।
- সমস্ত মিশ্রণকে বস্তায় ভরে মজুদ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।
- এ ধরনের মিশ্রিত খাদ্যকে ম্যাশ খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন :

- রেশন ফর্মুলেশনের পূর্বে অবশ্যই খাদ্য উপকরণের পুষ্টিগত গুণাগুণ এবং ভৌত অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে।
- ভেজা ছত্রাকযুক্ত, দলাপাকা এবং দূষিত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না।
- খাদ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ কখনও ১২ শতাংশের বেশি হওয়া যাবে না।
- ভেজা স্যাঁতসেতে এবং অপরিচ্ছন্ন স্থানে খাদ্য মিশ্রণ করা যাবে না।
- খাদ্য তৈরির পর অধিক সময় ধরে খাদ্য মাটিতে বা মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না।
- খাদ্য প্রস্তুতকারীকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

সুষম খাদ্য সংরক্ষণ :

- খাদ্য সংরক্ষণাগারে/গুদামে সঠিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা খাদ্যকে আর্দ্র হওয়া থেকে মুক্ত করবে।
- খাদ্য বস্তা মেঝে/ মাটিতে না রেখে কিছুটা উঁচুতে তাক বা মাচা করে রাখতে হবে।
- খাদ্য বস্তা দেয়াল ঘেঁষে রাখা উচিত নয়।
- খাদ্য গুদাম বিষাক্ত পোকামাকড়, ইঁদুর এবং কীটপতঙ্গ মুক্ত হতে হবে।
- বৃষ্টির পানি যেন খাদ্য গুদামে না প্রবেশ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সরাসরি রোদের আলো থেকে দূরে শুষ্ক স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাবারের ব্যাগের মুখ খোলা থাকলে বাতাসে বাতাসে অধিক আর্দ্রতার কারণে ফাংগাস জন্মাতে পারে সে জন্য মুখ বন্ধ রাখতে হবে।
- খাবার খোলা অবস্থায় মাটিতে স্তূপ আকারে রাখা সঠিক নয়, কারণ স্তূপে অধিক তাপ উৎপাদন হয়ে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।
- খাদ্যের সাথে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক ব্যবহারের অন্তত ২৪ ঘণ্টা পর সেই খাদ্য ব্যবহার করতে হবে।
- খাবারের পাত্রে মুরগি যাতে পায়খানা করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মিশ্রিত খাদ্য বেশি দিন রাখা যাবে না, তিন দিনের বেশি খাদ্য একবারে তৈরি করা যাবে না।
- মুরগির খাদ্য ও ডিম একত্রে রাখা যাবে না।

লেয়ার মুরগিকে সাধারণত ৩ প্রকৃতির খাদ্য সরবরাহ করা হয়, যথা-

(ক) ম্যাশ খাদ্য :

খাদ্যের সমস্ত উপকরণ গুঁড়া করে একত্রে মিশালোকে ম্যাশ খাদ্য বলে। হাতে মিশ্রণ করলে প্রথমে পরিমাণে অল্প উপকরণসমূহ একত্রে মিশাতে হবে। ক্রমান্বয়ে বেশি উপকরণের সাথে একত্র করতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে মিশালে মিশ্রণ সুষম হয়। লিটার পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগির জন্য এই খাদ্য বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে মুরগি খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে মুরগির ঠোকরা-ঠুকরি করার সম্ভাবনা কমে। পিলেট খাদ্য দিলে তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে ফেলে, ফলে মুরগি ঠোকরা-ঠুকরি করার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

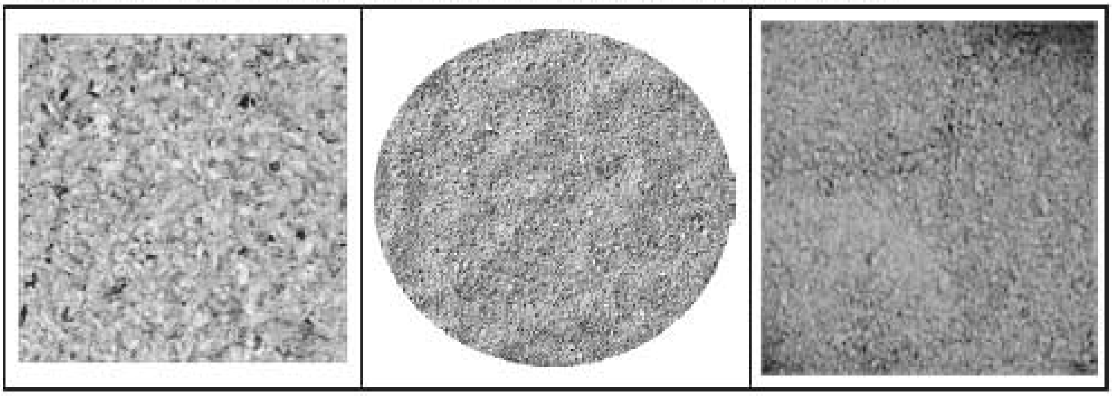

চিত্র : ৮.১ ম্যাশ খাদ্য

(খ) পিলেট খাদ্য :

ম্যাশ খাদ্যকে লোহার জালিযুক্ত ছাঁকনির মধ্য দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করলে পিলেট তৈরি হয়। পিলেট খাদ্য ব্যবহার করলে খাদ্যের অপচয় কমে ও মুরগি বেশি পছন্দ করে। ব্রয়লারের জন্য এ খাদ্য বেশি ব্যবহার করা হয়।

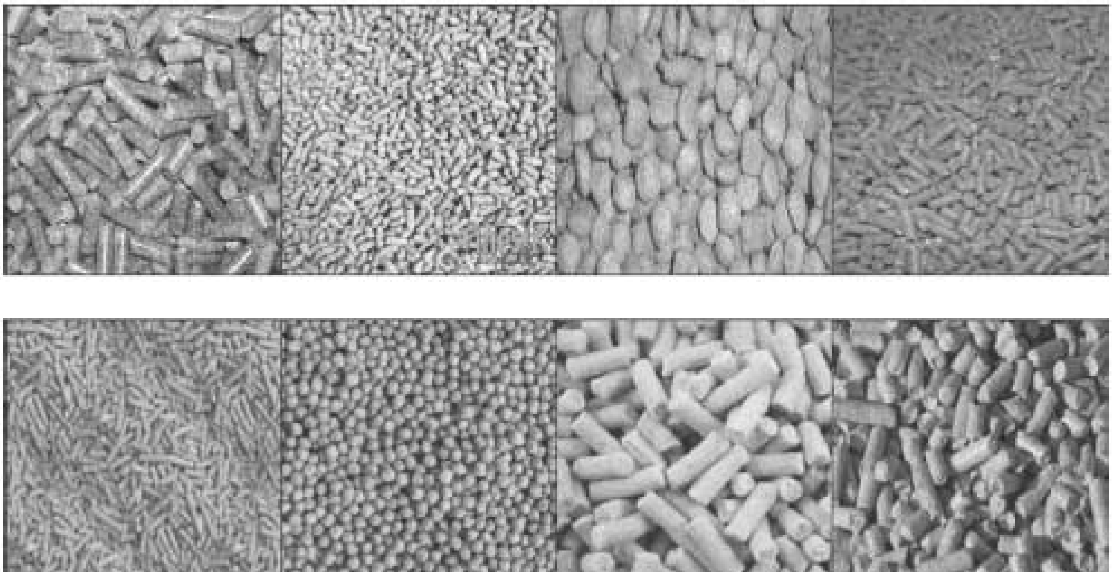

চিত্র : ৮.২ মুরগির বিভিন্ন ধরনের পিলেট খাদ্য

(গ) ক্রাম্বল খাদ্য : ম্যাশ খাদ্যের অন্য প্রকৃতি ক্রাম্বল খাদ্য। ক্রাম্বল খাদ্যের দানা পিলেট দানার চেয়ে ছোট। এ খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যের অপচয় কম হয়। পিলেটের মতোই যন্ত্রের সাহায্যে ক্রাম্বল খাদ্য তৈরি করা হয়। স্টার্টার রেশন হিসেবে এ খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক ফিড মিলগুলোতে পিলেট খাদ্য ও ক্রাম্বল খাদ্য তৈরি করা হয়। বড় লেয়ার খামারগুলোতে ডিম পাড়া মুরগির জন্য পিলেট খাদ্য এবং বাচ্চার জন্য ক্রাম্বল খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : ৮.৩ ক্রাম্বল খাদ্য

লেয়ার মুরগির খাদ্য সরবরাহ :

লেয়ার মুরগির খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়, সরবরাহের পরিমাণ, বয়স অনুযায়ী ওজন, মুরগির জাত ও রং ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়, যা নিচে বর্ণনা করা হলো-

(ক) নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য প্রদান :

- লেয়ার মুরগিকে সুনির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী প্রতিদিন একই সময়ে খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- দিনের খাদ্যকে ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করে সকালে-বিকালে বা সকালে-দুপুরে-বিকালে দেওয়া যায়।
- তবে বর্তমানে ডিমপাড়া মুরগিকে ৪-৫ বারও খাদ্য দিতে দেখা যায়।
- খাদ্য দেওয়ার সময় পাত্রের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখতে হয়।
- পাত্র পূর্ণ করে দিলে মুরগি ঠোঁট দ্বারা খাদ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অপচয় করে।
- মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময় পর পর পাত্রের খাদ্য নাড়াচাড়া করে দিলে খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং মুরগি আগ্রহ নিয়ে খায়।

(খ) বয়স ও ওজন অনুযায়ী খাদ্য প্রদান :

- ১০ বা ১৫ সপ্তাহের পুলেট ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।
- বয়স ও ওজন অনুসারে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পরিমিত খাদ্য প্রদান করতে হয়।
- প্রতি সপ্তাহে পুলেটের ওজন গ্রহণ করতে হয়।
- নির্দিষ্ট বয়সে নির্ধারিত ওজন না হলে খাদ্যের পরিমাণ বা খাদ্যে আমিষের পরিমাণ বাড়াতে হয়।
- ওজন বেশি হলে খাদ্য সরবরাহ বা খাদ্যে আমিষের পরিমাণ কমিয়ে ওজন কমাতে হয়।
- ডিম পাড়ার পূর্বে বা ডিম পাড়া শুরু করলে আনুপাতিক হারে ওজন বেশি থাকলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে ওজন কমানো যাবে না। এতে মুরগি দ্রুত অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারে।
- প্রথম ডিম উৎপাদন শুরু হলে স্বাধীনভাবে খেতে দিতে হয়।

২০২০

(গ) জাত ও বর্ণ অনুসারে খাদ্য প্রদান :

- জাত ও বর্ণ অনুসারে হালকা জাতের মুরগি ভারী জাতের মুরগির তুলনায় কম খাদ্য খায়।
- সাদা হালকা জাতের মুরগি রঙিন ভারী জাতের মুরগির তুলনায় কম খাদ্য খায়।

  জাত ও স্ট্রেইন অনুসারে খাদ্য প্রদান :
- জাত ও স্ট্রেইন অনুসারে খাদ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ পরিবর্তন করা হয়।

(ঙ) খাদ্য সরবরাহের জন্য খাবার পাত্রে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা :

মুরগির জাত	ট্রাফ পাত্রে মুরগি প্রতি স্থান	পানি পাত্রে প্যানপ্রতি মুরগির সংখ্যা	টিউব ফিডার প্রতি পাত্রে মুরগির সংখ্যা
সাদা হালকা জাত	৩.৫ইঞ্চি (৮.৭৫ সে.মি.)	১৪	১৮
রঙিন ভারী জাত	৪.০ ইঞ্চি (১০ সে.মি)	১২	১৫

বাণিজ্যিক লেয়ারের গড় খাদ্য গ্রহণ (হালকা জাতের ক্ষেত্রে) :

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন মুরগি)	সর্বমোট খাদ্য গ্রহণ(গ্রাম/মুরগি)
১	৬০	১০	৬০
২	১০৫	১৫	১৬৫
৩	১৭০	২০	৩০৫
৪	২৪০	২৮	৫০১
৫	৩১০	৩৬	৭৫৩
৬	৩৯০	৪০	১০৩৩
৭	৪৮০	৪৩	১৩৪৪
৮	৫৬৬	৪৫	১৬৫৯
৯	৬৪৬	৪৮	১৯৯৫
১০	৭২৪	৫০	২৩৪৫
১১	৮০৬	৫২	২৭০৯
১২	৮৮১	৫৫	৩০৯৪
১৩	৯৫৬	৫৭	৩৪৯৩
১৪	১০২১	৫৯	৩৯০৬
১৫	১০৮৩	৬২	৪৩৪০
১৬	১১৪৩	৬৫	৪৭৯৫
১৭	১২০১	৬৭	৫২৬৪
১৮	১২৫৭	৭০	৫৭৫৪

জন্ম থেকে ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিটি লেয়ার এর ক্রমপুঞ্জিত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ৪৮ কেজি ও পানি গ্রহণ ১০০-১৩৫ লিটার। ডিম উৎপাদনকালীন সময় প্রতিটি মুরগি গড়ে দৈনিক ১১০-১২০ গ্রাম খাবার ও ৩০০-৫০০ মিলি. পানি খেয়ে থাকে।

২০২০

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লেয়ার খামারের মোট খরচের কত ভাগ খাদ্য খরচ?
২. খাদ্য উপকরণে পুষ্টিমাত্রার আধিক্যের ভিত্তিতে খাদ্য উপকরণকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. মুরগির খাদ্যের কতভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য?
৪. দানা জাতীয় খাদ্যের উপকরণের নাম লিখ।
৫. আঁশ জাতীয় খাদ্যের উপকরণের নাম লিখ।
৬. প্রাণিজ আমিষ খাদ্যের নামগুলো কী কী?
৭. কয়েকটি চর্বি জাতীয় খাদ্যের নাম বল।
৮. কয়েকটি খনিজ পদার্থ জাতীয় উপকরণের নাম লিখ।
৯. ঝিনুকের গুঁড়ায় কত ভাগ ক্যালসিয়াম থাকে?
১০. সুষম খাদ্য কী? খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্যে কত ভাগ যোগ করতে হয়?
১১. লেয়ারের খাদ্যকে কয়টি পর্বে ভাগ করা হয় ও কী কী?
১২. লেয়ার স্টার্টার খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ লিখ।
১৩. লেয়ার গ্রোয়ার খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ লিখ।
১৪. লেয়ার রেশনে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ লিখ।
১৫. খাদ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?
১৬. সোদা হালকা জাত ও রঙিন ভারী জাতের ক্ষেত্রে ট্রাফ পাত্রে কতটুকু জায়গার প্রয়োজন?
১৭. ম্যাশ খাদ্য কী?
১৮. পিলেট খাদ্য কী?
১৯. ক্রাম্বল খাদ্য কী?
২০. খাদ্য কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুষম খাদ্য সরবরাহের সুবিধাগুলো কী কী?
২. রেশনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখ কর।
৩. লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির মিশ্রণ প্রক্রিয়া উল্লেখ কর।
৪. সুষম খাদ্য সংরক্ষণ বর্ননা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত?
২. সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?
৩. ভালো খাদ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কী কী শর্ত বিবেচনা করা হয়?
৪. লেয়ার মুরগিকে খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?
৫. লেয়ারের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত সুষম খাদ্য তৈরি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ আলোচনা কর।
৬. লেয়ারের সুষম খাদ্য তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।
৭. লেয়ারকে সুষম খাদ্য সরবরাহের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

২০২০

নবম অধ্যায়
লেয়ারের বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনা

কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ না করলেও মুরগি কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেলে কিছু সময়ের মধ্যে দৈহিক অবসন্নতা দেখা যায়। পানি খাদ্য পরিপাকের বিশেষ সহায়ক। রক্তকে খাদ্যের সারাংশ গ্রহণ এবং রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও পানি বিশেষ সহায়ক। পানি শরীরের অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রার সামঞ্জস্য বিধান করে। গ্রন্থিসমূহ পিচ্ছিলকরাব জন্য পানি প্রয়োজন।

৯.১ লেয়ারের বিভিন্ন ধরনের পানির পাত্র

ডিমপাড়া মুরগিকে পানি সরবরাহের জন্য লেয়ার মুরগির ঘরে ব্যবহৃত পানির পাত্রগুলো হলো :

(ক) লম্বা ট্রাফ পাত্র :

- এই পাত্র ৬-৮ ফুট লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি গভীর ও ৩-৩.৫ ইঞ্চি প্রশস্ত।
- এই পাত্র সুবিধামতো ঘরের মেঝের উপর ২-১৬ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচুতে স্থাপন করা যায়।
- স্বয়ংক্রিয় ট্রাফ পাত্রের তলা ইংরেজি ভি আকারের মতো। স্বয়ংক্রিয় পাত্রের সাথে ৩ প্রকার বাল্ব ব্যবহার করে পাত্রের উপর পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

চিত্র : ৯.১ লম্বা ট্রাফ পাত্র

(খ) খাঁচার সাথে যুক্ত ট্রাফ পাত্র :

- খাঁচার দৈর্ঘ্য অনুসারে এই পাত্রের দৈর্ঘ্য হয়।
- পাত্রের এক প্রান্ত পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংযুক্ত থাকে। সংযুক্ত স্থানে পানির ট্যাপ থাকে যা ইচ্ছামত হাতের সাহায্যে খুলে পাত্রে পানির প্রবাহ তৈরি করা যায়।
- এই পাত্রে মগ বা অন্য কোনো পাত্রের সাহায্যে হাতে পানি প্রদান করা যায়।
- বর্তমানে প্লাস্টিকের লম্বা পাইপ দৈর্ঘ্য বরাবর কেটে খাঁচায় পানির ট্রাফ পাত্র বা চ্যানেল ড্রিংকার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চত্র : ৯.২ খাচার সাথে যুক্ত লম্বা ট্রাফ পাত্র

(গ) গোলাকার টিউব ড্রিংকার :

- লিটার ও মাচা পদ্ধতিতে এই ড্রিংকার বহুল প্রচলিত।
- প্লাস্টিকের বা টিনের তৈরি গোল থালার উপর পানি ভর্তি অপর একটি ঘটের আকৃতির প্লাস্টিকের বা টিনের পাত্র উপুড় করে বসানো থাকে।
- উপুড়কৃত পাত্রের গলায় ছোট ছিদ্র থাকে। থালার মতো পাত্রের পানি ছিদ্রের উপরে উঠলে উপরের পাত্র থেকে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। পানির উচ্চতা ছিদ্রের নিচে নামলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটের ভেতর থেকে পানি থালার উপর এসে জমা হয় এবং ছিদ্রের উপরে উঠলে পুনরায় প্রবাহ বন্ধ হয়।
- ১-১০ লিটার পানি ধরে এমন ড্রিংকার বাজারে পাওয়া যায়।

চিত্র : ৯.৩ গোলাকার টিউব ড্রিংকার

(ঘ) ঝুলন্ত অটোমেটিক টিউব ড্রিংকার :

- প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি গম্বুজাকৃতির পাত্র ঘরের সিলিং-এর সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।
- পাত্রের নিচের অংশে গোলাকৃত থালার মত পাত্রের উপর পানি জমা হলে চারিদিকে দাঁড়িয়ে মুরগি পানি পান করে।
- পানি সরবরাহের পাইপের সাথে বাল্ব যুক্ত রাবার টিউব দ্বারা সংযোগ তৈরি করা হয়।
- গম্বুজাকৃতি পাইপের গা বেয়ে নিচের পাত্রে পানি জমা হয়।
- পানির ওজন একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌছালে পানি সরবরাহ বন্ধ হয় এবং পাত্রে পানির ওজন কমলে পানি বের হয়ে।
- এই পাত্র ইচ্ছাকৃত উঁচু নিচু করে স্থাপন করতে সুবিধা।

চিত্র : ৯.৪ ঝুলন্ত অটোমেটিক টিউব ড্রিংকার

(ঙ) কাপ পাত্র :

- ১-৩ ইঞ্চি গভীর এবং ২-৬ ইঞ্চি পরিমাপের গোলাকৃতি ছোট প্লাস্টিকের কাপ বা বাটি পাত্র পানি সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- এ ধরনের পাত্র খাঁচা পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়, যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি প্রদানের বদলে মগ দ্বারা কাপ পাত্রে পানি সরবরাহ করা হয়।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাপ পাত্রে পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন বাল্ব থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি সরবরাহ হয়।

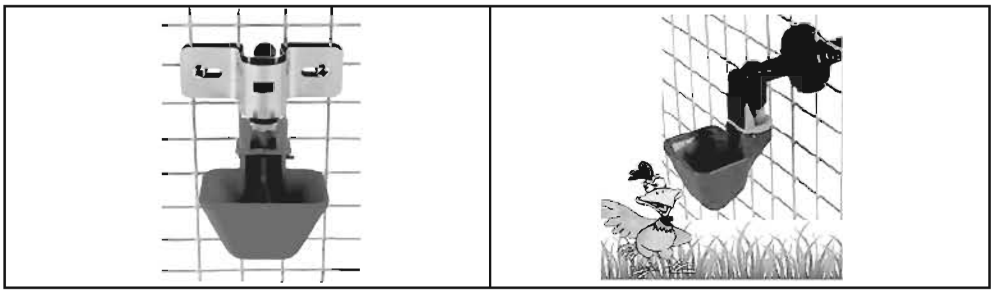

চিত্র : ৯.৫ কাপ পাত্র

(চ) নিপল ড্রিংকার :

- পানিপ্রবাহের পাইপের সাথে এক প্রকার ছোট নিপল সংযুক্ত থাকে। মুরগি গলা উঁচু করে নিপলের দিকে ঠোঁট ছোঁয়ালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ঝরে।
- এটি ডিমপাড়া মুরগির জন্য বেশি উপযোগী।
- ইচ্ছামতো পাইপ উঁচু নিচু করা যায়।

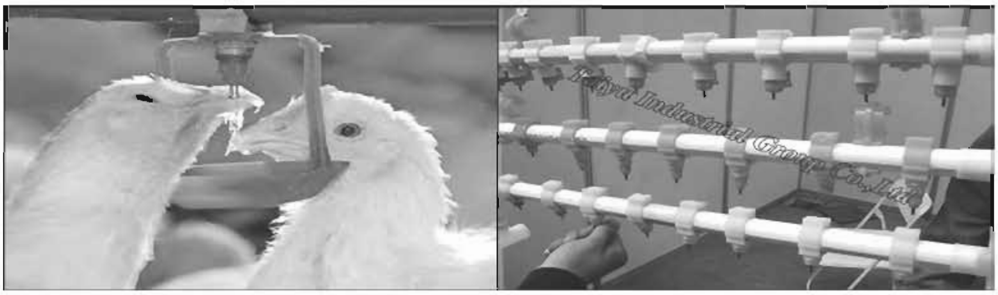

চিত্র ৯. ৬ খাঁচার সাথে যুক্ত নিপল ড্রিংকার

৯.২ প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

লেয়ার-এর ঘরে সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১) ডিমপাড়া মুরগির সুস্বাস্থ্য, ডিম উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২) খাদ্য ছাড়া মুরগি কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে।

৩) সাধারণভাবে পানি গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের দ্বিগুণ হয়।

৪) পানি গ্রহণের পরিমাণ ঘরে তাপমাত্রা আর্দ্রতা ও পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। গরমের সময়

পানি গ্রহণের পরিমাণ সাধারণ সময়ের দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়

৫) প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি পানি গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ১০% বেড়ে যায়।

৬) প্রতি ১০ ফুট অন্তর অন্তর সমভাবে ঘরের মধ্যে লেয়ার মুরগির জন্য পানির পাত্র স্থাপন করতে হবে।

৭) পানি পাত্র এমনভাবে ঝুলাতে হবে যেন পানি পাত্র মুরগির পিঠের সমান্তরালে থাকে।

৮) লেয়ার মুরগির জন্য পাত্রে সব সময় পানি পরিপূর্ণ রাখতে হবে।

৯) পানি গরম হলে বদল করে ঠাণ্ডা পানি দিতে হবে।

১০) পানি ক্ষার ও লবণমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১) পানি শোধনের জন্য ক্লোরিন ৩ পিপিএম ব্যবহার করা যায় বা যে কোনো পানি বিষোধক ট্যাবলেট মেশানো যেতে পারে।

১২) টিউবওয়েলের পানি খাওয়ানো উত্তম।

১৩) পানিতে P^H কন্ট্রোলার ব্যবহার করে পানির P^H কমিয়ে আনলে পানিতে মেশানো ভিটামিন ও অ্যান্টিবায়োটিক এর কার্যক্রম বৃদ্ধি হয়।

১৪) প্রতিদিন পানি পাত্র জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

পানির পাত্রে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা :

মুরগির জাত	ট্রাফ পাত্রে মুরগি প্রতি স্থান	পানি পাত্রে পাত্র প্রতি মুরগির সংখ্যা	টিউব পাত্রে পাত্রপ্রতি মুরগির সংখ্যা
সাদা হালকা জাত	১ ইঞ্চি (২.৫ সে.মি.)	৮	৮
রঙিন ভারী জাত	১.২৫ ইঞ্চি (৩.১২ সে.মি.)	৬	৬

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডিমপাড়া মুরগিকে পানি সরবরাহের জন্য কী কী পানির পাত্র ব্যবহার করা যায়?

২. প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পানি গ্রহণ কতগুণ বাড়ে?

৩. লেয়ার মুরগির জন্য কত দূরত্বে পানির পাত্র বসাতে হয়?

৪. পানি শোধনের জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পানি P^H কমিয়ে আনলে কী সুবিধা?

২. বিভিন্ন জাতের মুরগির ক্ষেত্রে পানির পাত্রে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ কত?

রচনামূলক প্রশ্ন

৩. বিভিন্ন ধরনের পানির পাত্রের বর্ণনা দিন।

৪. লেয়ারকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা কর। ২০২০

দশম অধ্যায়
লেয়ার খামারের কার্যাবলি

যে কোনো ধরনের খামার হোক না কেন ভালোভাবে চালানোর পূর্ব পরিকল্পনা হলো এর সূচী ভিত্তিক কার্যতালিকা থাকা এবং তা খামারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অর্থাৎ ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে শ্রমিক পর্যন্ত সকলের সুচারুরূপে মেনে চলা। এছাড়া খামারের প্রত্যেকের কাজের মধ্যে অবশ্যই একটি সমন্বয় থাকতে হবে। এতে খামারের উন্নতি হবে এবং যারা কাজ করবেন তারাও নিজ নিজ কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদিত করতে পারবেন।

১০.১ লেয়ার খামারের দৈনন্দিন কার্যাবলি

লেয়ার খামারকে লাভজনক করে তুলতে হলে খামারের নিম্নলিখিত দৈনন্দিন কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হবে–

(১) ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে মুরগির ঘর খুলে ভালোভাবে ঘুরে দেখতে হবে। আলোর অবস্থা নিরীক্ষণ করে প্রয়োজন বাল্ব বন্ধ করতে হবে।

(২) কোনো অসুস্থ বা মৃত মুরগি চোখে পড়লে তা দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।

(৩) ডিমপাড়া বাক্সের ডালাগুলো খুলে দিতে হবে। মেঝেতে ডিম পাড়লে সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) পানি পাত্রগুলো ডিজইনফেকটেন্ট দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বিশুদ্ধ ক্লোরিনযুক্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। অবশ্য স্বয়ংক্রিয় পানির ব্যবস্থা থাকলে শুধুমাত্র যন্ত্রের কার্যকারিতা ঠিক আছে কিনা দেখলেই চলবে।

(৫) খাবার পাত্রগুলো পরিষ্কার করে পাত্রে টাটকা খাবার দিতে হবে। খাদ্য পাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভরে খাদ্য দিতে হবে।

(৬) খাবার দেওয়ার পর মুরগির গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে। সুস্থ মুরগি এ সময় বিশেষ আগ্রহ নিয়ে খেতে আসে। যদি কোনো মুরগি খেতে না আসে এবং চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে সেটা অসুস্থ মুরগি। এ ধরনের মুরগি আলাদা করে যত্ন ও চিকিৎসা দিতে হবে।

(৭) গরমের সময় পানি ও খাদ্য সকাল ৪টায় সরবরাহ করতে হবে। তা না হলে মুরগি সারাদিন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে পারবে না এবং উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে। আবার শীতকালে সকাল ৬টায় পানি ও খাদ্য দিতে হয়।

(৮) ১ম বার সকাল ৮-৯টার মধ্যে ডিম সংগ্রহ করতে হবে। মুরগি সকাল বেলার দিকে বেশি ডিম পাড়ে। তাই এ সময় ডিম সংগ্রহ বেশি হয়।

(৯) ডিমের হিসাব রেজিস্ট্রার এ সংরক্ষণ করতে হবে।

(১০) সকাল ৯টায় পুনরায় খাবার ও পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) সকাল ১১-১২টার মধ্যে আবার ডিম সংগ্রহ করতে হবে এবং নথিভুক্ত করতে হবে।

(১২) বিকাল ৪-৫টায় পুনরায় খাদ্য ও পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ডিম সংগ্রহ করতে হবে। গরমকালে দিনে ৫ বার ডিম সংগ্রহ করতে হয়।

(১৩) মুরগির অবস্থা পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে অসুস্থ মুরগি পাওয়া গেলে আলাদা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

(১৪) সন্ধ্যায় সময় আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে এবং শেষবারের মতো ডিম থাকলে ডিম তুলে ডিমপাড়া বাক্সের দরজা বন্ধ করে দিতে হবে।

(১৫) সন্ধ্যার পর প্রয়োজনমতো আলো প্রদান শেষে ৮-৯টার দিকে মুরগির ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে হয়।

ঘরকে একেবারে অন্ধকার না রেখে প্রতি ৫০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ১৫ ওয়াট বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর ঘর তালাবদ্ধ করতে হবে।

(১৬) আলো প্রদানের ক্ষেত্রে ভোরে, সন্ধ্যা রাতে আলো জ্বালানো, পরবর্তীতে যে কোনো একদিকে একটানা ১৬ ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। হয় সকাল ৬টায় দিনের আলোর ফেটার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অথবা রাত ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলো প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৭) খাঁচা অথবা লিটার পদ্ধতিতে দিনের বেলা ১ ঘণ্টা পর পর পাত্রের খাদ্য নাড়াচাড়া দিলে মুরগি খাদ্য গ্রহণে আগ্রহী হয় এবং খাদ্যের পুষ্টিমান সব জায়গায় সমান হয়।

(১৮) মুরগিকে প্রতিবার খাদ্য দেওয়ার পূর্বেই ডিম সংগ্রহ করতে হবে।

(১৯) ঘরের তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল, লিটারের অবস্থা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাপমাত্রা বেশি হলে ঠোকরা ঠুকরি বেড়ে যায়। খাদ্য গ্রহণ কমে যায়। এ সময় খাদ্যের উপাদানের পুনঃবিন্যাস করে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। ঘরে বায়ু চলাচল নিশ্চিত করতে হবে।

(২০) দুপুরে পানি গরম হয়ে গেলে পানি পাল্টে ঠাণ্ডা পানি দিতে হবে। ঘরের চালে চট বিছিয়ে পানি ছিটিয়ে দিলে এবং ঘরের চারপাশে চটের পর্দা টানিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে ঘর ঠান্ডা থাকে।

(২১) আবার শীতকালে ঘরে যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া না ঢোকে সেজন্য তারের জালের বাইরের দিকে চটটানিয়ে দিতে হবে।

(২২) মাঝে মাঝে লিটার ওলট-পালট করে দিতে হবে, কেক হলে ভেঙে দিতে হবে। খাঁচার ক্ষেত্রে নিয়মিত খাঁচার নিচ থেকে ময়লা অপসারণ করতে হবে।

(২৩) প্রতিদিন সরবরাহকৃত খাদ্যের পরিমাণ, ডিম উৎপাদন , হেন ডে উৎপাদন, মোট মুরগির সংখ্যা, মৃত ও বাতিল মুরগির সংখ্যা ও বাজারজাতকরণের হিসাব রাখতে হবে।

(২৪) ঘরের ভেতর পায়ে চলার পথ, খাদ্য সংগ্রহ কক্ষ ইত্যাদি ঝাড়ু দিতে হবে এবং খামারে প্রবেশ মুখের জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি প্রতিদিন পানি প্রতিদিন পরিবর্তন করে দিতে হবে।

১০.২ লেয়ার খামারের সাপ্তাহিক কাজের বিবরণঃ

(১) সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে শতকরা ৪-৫ ভাগ মুরগির ওজন নিতে হবে। এজন্য কয়েকটি মুরগির পালকে সবুজ রং লাগিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং বারবার সেই মুরগিগুলোর ওজন দেওয়া দরকার। বিভিন্ন স্ট্রেইনের বিভিন্ন বয়সের নির্দিষ্ট ওজন থাকে। বয়স অনুযায়ী ঐ ওজন না আসলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) খাদ্য গ্রহণ কম হলে প্যারাসাইটিক ইনফেকশন আছে কী না খুঁজে দেখতে হবে।

(৩) সপ্তাহের প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ ডিম উৎপাদন, ভাঙা ডিমের সংখ্যা, মৃত পাখির সংখ্যা ইত্যাদি হিসাব রেখে একটি বিবরণী তৈরি করতে হবে।

(৪) বয়স অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ, ডিম উৎপাদন কাম্য মাত্রায় আছে কী না তা পর্যালোচনা করতে হবে।

(৫) পিক প্রোডাকশনের সময় উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া সাধারণত ৯৫% ডিম উৎপাদন ১০-১৫ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। সাপ্তাহিক বিবরণী পর্যালোচনা করলে এ বিষয়গুলো জানা যাবে।

(৬) প্রতি সপ্তাহে লিটার ১-২ বার ওলট-পালট করে দেওয়া দরকার। লিটার ভিজে গেলে তা পাল্টে দিতে হবে। লিটারের উচ্চতা কমে গেলে শুকনা পরিষ্কার লিটার দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

(৭) ডিমপাড়া মুরগির লিটার মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হবে।

(৮) সপ্তাহে একবার খাবার পাত্রগুলো ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানিতে বিশোধন করতে হবে এবং ঘরের ভেতর জমে যাওয়া ধূলা, ঝুল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ২০২০

(৯) খামারে শীতকালে ৭ দিনের এবং বর্ষাকালে ৩ দিনের খাদ্য মজুদ রাখতে হবে।

(১০) মুরগির ধূলি স্নানের বাক্সে শুকনা মিহি ছাইয়ের সঙ্গে গ্যামোক্সিন বা ম্যালথিয়ন পাঁচ শতাংশ মিশিয়ে দেওয়া দরকার।

খামারের মাসিক কাজের বিবরণঃ-

(১) সপ্তাহে একবার মুরগির ওজন দিতে না পারলে মাসে একবার ৪-৫% মুরগির ওজন দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি মাসে একই মুরগির ওজন নিতে হবে। কাম্য ওজন না হলে বা বেশি ওজন হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। ওজন দেওয়া মুরগির পালকে সবুজ রং লাগিয়ে রাখতে হবে এবং প্রতি মাসে একই মুরগির ওজন নিতে হবে।

(২) মাসের গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ, ডিম উৎপাদন, ভাঙা ডিমের সংখ্যা, ডিমের ওজন, মৃত পাখির সংখ্যা, রোগে আক্রান্ত মুরগির সংখ্যা ইত্যাদি হিসাব রেখে একটি মাসিক বিবরণী তৈরি করতে হবে।

(৩) গ্রাফিক্যাল চার্ট তৈরি করে দেখতে হবে স্ট্রেইনের বয়স অনুযায়ী ওজন ও ডিম উৎপাদন ঠিক আছে কী না।

(৪) কোনো বিশেষ রোগের কারণে মুরগি অসুস্থ হচ্ছে কী না বা প্যারাসাইটিক সংক্রমণের কারণে খাদ্য গ্রহণ কমছে কীনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(৫) পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞের সাথে খামার এর অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সম্ভব হলে মাসে একবার পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে মুরগিকে প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা অনুযায়ী কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। লিটার পদ্ধতিতে ৪০ দিন পর পর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। খাঁচায় পালিত মুরগিকে ৬০ দিন পর কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।

(৭) ডিমপাড়া মুরগির লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি কোনো মুরগির মধ্যে তা দেখা না যায়, তাহলে সেগুলোকে বাতিল করে দিতে হবে।

(৮) ডিমপাড়া মুরগির ডিমে আসার পর ঠোঁট বড় হলে কেটে দিতে হয়, যদিও এতে মুরগির উপর পীড়ন হয়। তাই এ সময় ভিটামিন- 'কে' খাওয়াতে হবে।

(৯) মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল মুরগিকে ভ্যাকসিন দিতে হবে। রানীক্ষেত রোগের জন্য ডিম পাড়া অবস্থায় প্রতি ২ মাস পর পর রানীক্ষেত ভ্যাকসিন পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(১০) বিল্ট আপ লিটার বা পুরু লিটারের ক্ষেত্রে মাসে বা কয়েক মাসে একবার করে ধাপে ধাপে লিটারে আরও লিটার যোগ করতে হবে।

(১১) খামারে ১ মাসের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে হবে।

(১২) খামারে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি বুঝিয়ে দেওয়া এবং মাসিক লাভ ক্ষতির বিবরণ তৈরি করা।

খামারের বার্ষিক কার্যাবলি :

(১) একদিনের বাচ্চা সংগ্রহের জন্য হ্যাচারিতে যোগাযোগ করা অথবা পুলেট সংগ্রহের জন্য পুলেট রিয়ারিং খামারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

(২) পশুসম্পদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

(৩) ডিম ও বাতিল মুরগি বিক্রির জন্য বাজার সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) যদি একদিনের বাচ্চা এনে রিপ্লেসমেন্ট স্টক তৈরি করতে হয়, তবে বর্তমান লেয়ার বাতিল করার ১২ সপ্তাহ পূর্বে নতুন বাচ্চা আনতে হবে। বাতিল করার পর ৪ সপ্তাহ শেড ফাঁকা রাখতে হবে। এরপর নতুন স্টক যাদের বয়স হবে (১২+৪=৬) সপ্তাহ, লেয়ার ঘরে তুলতে হবে। বর্তমানে খামারিয়া ৭২ সপ্তাহ এর পরিবর্তে ৮০-৮২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত লেয়ার মুরগি লাভ জনকভাবে পালতে পারে।

২০২০

(৫) বছরে ১ বার সমস্ত শেড ও খামার আঙ্গিনা পরিষ্কার করতে হবে।

(৬) নতুন বাচ্চা উঠানোর পূর্বে ব্রুডিং হাউজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। নতুন পুলেট লেয়ার হাউসে ওঠানোর পূর্বে লেয়ার হাউস ও এর যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ফিউমিগেশন করে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

(৭) প্রয়োজনীয় খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করতে হবে এবং ঘর বা খাঁচা মেরামত করতে হবে।

(৮) লিটার পরিবর্তন করে নতুন লিটার বা পরিশোধিত লিটার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(৯) পরবর্তী ফ্লকের খাদ্য, পানি, ভ্যাকসিনেশন, ডিবিকিং ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(১০) পুরাতন ফ্লক বাতিল শেষে রেজিস্টারে রক্ষিত তথ্য থেকে উক্ত ফ্লকের উৎপাদনের হার , হেন হাউস প্রোডাকশন, ডিমের গড় ওজন, ভাঙা ডিমের সংখ্যা, খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ইত্যাদি বের করতে হবে।

(১১) আয় হিসাবে ডিম, বাতিল মুরগি, লিটার ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয় যোগ দিতে হবে। খরচ হিসাবে খাদ্য ক্রয়, শ্রমিক মজুরি, ডেপ্রিসিয়েশন খরচ, টিকা, ঔষধ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির জন্য খরচ যোগ দিতে হবে। আয় ও ব্যয়ের তারতম্যই হলো নিট আয়, যা থেকে খামারের লাভ-ক্ষতি সম্ভাবনা ইত্যাদি বোঝা যাবে।

(১২) নতুন সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রস্তুত করতে হবে।

(১৩) নতুন বছরের জন্য বাজেট প্রস্তুত ও সেই অনুযায়ী মূলধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) অনেক সময় প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন পাওয়া যায় না। তাই সময়মতো ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বাজারে সহজে প্রাপ্ত গুণগতমান সম্পন্ন ভ্যাকসিন ক্রয় করতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গরমের সময় সকালে কখন খাবার সরবরাহ করতে হয়?
২. পাত্রের খাদ্য ১ ঘণ্টা পর পর নাড়াচাড়া করে দিলে কী লাভ হয়?
৩. প্রতিবার খাদ্য প্রদানের আগে না পরে ডিম তুলতে হয়?
৪. রাতের বেলা ঘর কি একবারেই অন্ধকারে রাখা উচিত?
৫. মুরগির ধুলি স্নানের বাক্সে ছাইয়ের সাথে কোন ওষুধ মেশাতে হয়?
৬. কৃমিনাশক ওষুধ মুরগিকে কতদিন পর পর খাওয়াতে হয়?
৭. ডিমপাড়া অবস্থায় কোন রোগের ভ্যাকসিন নিয়মিত দিয়ে যেতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রতিদিন খামারের কী কী তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়?
২. সপ্তাহে খামারে কী কী তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

৩. লেয়ারের খামারের দৈনন্দিন কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৪. লেয়ারের খামারের সাপ্তাহিক কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৫. লেয়ারের খামারের মাসিক কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৬. লেয়ারের খামারের বাৎসরিক কার্যাবলি বর্ণনা কর। ২০২০

একাদশ অধ্যায়

লেয়ার মুরগির রোগ ব্যবস্থাপনা

মুরগির মৃত্যুর হার খুব বেশি। একজন মুরগি পালনকারি কাছে রোগ একটা বিরাট সমস্যা। মৃত্যুহার দেখে যে কোনো পালনকারীর নিরুৎসাহ বোধ করাই স্বাভাবিক। তবে সতর্ক দৃষ্টিও ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমানো যায়। মাত্র কয়েকটি রোগ ছাড়া অনেক রোগকে ভালো করা যায় না। তাই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা দরকার। রোগাক্রান্ত মুরগিকে সরিয়ে ফেলাই ভালো। কঠিন রোগ-ভোগের পর মুরগি ভালো হয়ে গেলেও আগের বা স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কোনোদিনই ফিরে পায় না এবং ডিমপাড়ার হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। এছাড়া এদের মাধ্যমে ঝাঁকের অন্যান্য মুরগির মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

১১.১ রোগের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ :

রোগ : পর্যাপ্ত খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার পরও যদি শরীরের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তবে তাকে রোগ বলে।

ব্রয়লার মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণিবিভাগ করা যায় :

- সংক্রামক রোগ বা জীবাণুঘটিত রোগ (Contagious Disease) ।
- পরজীবীঘটিত রোগ (Parasitic Disease)।
- অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutritious Disease)।

১. সংক্রামক রোগ :

যেসব রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় ও অসুস্থ পাখি থেকে সুস্থ পাখিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে। এদেরকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যথা–

সংক্রামক রোগ

⇩

ভাইরাস জনিত	ব্যাকটেরিয়া জনিত	মাইকোপ্লাজমা জনিত	ছত্রাক জনিত	প্রটোজোয়া জনিত	অন্যান্য
রানীক্ষেত	সালমোনেলোসিস	মাইকোপ্লাজমোসিস	ব্রুডারনিউমোনিয়া	ককসিডিওসিস	অ্যাসাইটিস
গামবোরা	কলিবেসিলোসিস		আফলাটক্সিকোসিস		
এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা	ইনফেকশাস করাইজা				
	নেক্রেটিকএন্টারাইটি				
	ওম্ফ্যালাইটিস				

পরজীবীজনিত রোগ :

পরজীবী একধরনের জীব যা অন্য জীব দেহে বসবাস করে জীবন ধারণ করে। যে জীবের দেহের উপর এরা জীবন ধারন করে তাদেরকে হোস্ট বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বলে। আবার কিছু

পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাহিরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতি সাধন করে । এদেরকে বহিঃদেহের পরজীবী বলে। উভয় পরজীবী আক্রমণের ফলে পোল্ট্রি শিল্প ব্যপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরা পাখির দেহে বসবাস করে পাখি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পাখি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী পাখির দেহে বসবাস করে রক্ত শুষে নেয় ফলে আক্রান্ত পাখির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

পরজীবী দুই প্রকার :
১.অন্তঃপরজীবী : কৃমি
২.বহি : পরজীবী : উকুন, আটালী, মাইট

অপুষ্টিজনিত রোগ :
গৃহপালিত পাখি পালনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো পাখিকে সুষম খাদ্য প্রদান করা। পাখির মাংস ও ডিম উৎপাদন এবং দৈনিক বৃদ্ধিসাধনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে যে কোনো খাদ্য উপকরণের অভাব হলে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, দৈহিক বৃদ্ধিরব্যাঘাত ঘটে,ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এমনকি পাখির মৃত্যুও হতে পারে।

অপুষ্টিজনিত রোগ : জেরোপথ্যলামিয়া, প্যারালাইসিস, পেরোসিস, ক্যানাবলিজম, রিকেট ।

১১.২:-লেয়ার মুরগির জীবণুঘটিত বিভিন্ন রোগের নাম, কারণ,লক্ষণ, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি :

ভাইরাসজনিত রোগসমূহ
রানীক্ষেত রোগ

রানীক্ষেত মুরগির ভাইরাসজনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কমবেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশের মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রানীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রাণীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি মারাত্বক আক্রন্ত হয়। সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়ায়, যেমন- শীত ও বসন্তকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়েও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে শনাক্ত করা হয়। তাই তাকে নিউক্যাসল ডিজিজ বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রানীক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে এ রোগকে রানীক্ষেত রোগ বলা হয় ।

রোগের কারণ :- প্যারামিক্সোভিরিডি পরিবারের নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস নামক এক প্রজাতির প্যারামিক্সোভাইরাস এ রোগের কারন।

রোগ সংক্রমণ -
নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–
বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।

- অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, হাঁচি-কাশি থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি আমদানির মাধ্যমে।
- মৃত মুরগি বা পাখি যেখানে সেখানে ফেললে।
- বন্য পশুপাখির মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ : রানীক্ষেত রোগের প্রধানত তিন প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–
ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ
খ. মসোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ।
গ. লেন্টোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ।

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ : এ প্রকৃতির রানীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্মক। এতে অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুত জীবাণু সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যেতে পারে। তবে তা না হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যেমন–

* প্রথমদিকে আক্রান্ত পাখি দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
* মাথায় কাঁপুনি হয়, ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করে।
* সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
* মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাক-মুখ দিয়ে শ্লেস্মা ঝরে।
* শরীর শুকিয়ে যায়।
* মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখ-মুখ ফুলে যায়।
* ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়।

খ. মেসোজেনিক প্রকৃতি লক্ষণ:
মেসোজেনিক প্রকৃতিতে আক্রান্ত মুরগিতে রোগ লক্ষণ ততটা তীব্র নয়। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায় :

* ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়।
* ডিম উৎপাদন কমে যায়।
* পাখির কাশি হয় ও মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়।
* হলদে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে।
* জীবাণু আক্রমণের দুই সপ্তাহ পর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে মাথা ঘোরায় ও পা অবশ হয়ে যায়।
* মাথা একপাশে বেকে যেতে পারে, কখনো বা মাথা দুইপায়ের মাঝখানে চলে আসে অথবা সোজা ঘাড় বরাবর পিছন দিকে বেঁকে যেতে পারে।

২০২০

গ. **লেন্টোজেনিক প্রকৃতি :**

* এতে মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা-

* শ্বাসতন্ত্র কম আক্রান্ত হওয়ায় এ তন্ত্রের লক্ষণ কম প্রকাশ পায়।

* সামান্য কাশি থাকে।

* কিছুটা ক্ষুধামন্দা ভাব থাকে।

* ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

চিত্র : ১১.১ রানীক্ষেত রোগের লক্ষণ

রোগ নির্ণয় :

ময়নাতদন্তে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখে।

* শ্বাসনালীতে রক্তাধিক্য ও রক্ত সঞ্চায়ন।

* স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে রক্তাম্বু ।

* প্লীহা বড় হয়ে যায়।

* খাদ্য অন্ত্রে, বিশেষ করে প্রভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে, রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত ।

* অন্ত্রের শেষভাগে পাতলা সাদাটে মল।

চিত্র : ১১.২ রাণীক্ষেত রোগের ময়নাতদন্ত লক্ষণ।

চিকিৎসা :

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত পাখিতে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইডজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ০.০১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত পাখিকে দৈনিক ২/৩ বার খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ :

রানীক্ষেত রোগ প্রতিরোধ দুইধরনের টিকা ব্যবহার করা হয়। যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি এবং আর. ডি. ভি।

বি.সি.আর.ডি.ভি : এ টিকাবীজের প্রতিটি শিশি বা ভায়ালে হিম শুষ্ক অবস্থায় ১ মি. লি. মুল টিকাবীজ থাকে। প্রতিটি শিশির টিকাবীজ ৬ মি.লি. পরিশ্রুত পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হয়। এরপর ৭ দিন ও ২১ দিন বয়সের প্রতিটি বাচ্চা মুরগির এক চোখে এক ফোঁটা করে ড্রপারের সাহায্য নিতে হবে।

আর. ডি. ভি : এ টিকাবীজের প্রতিটি ভায়ালে ০.৩ মি.লি. মূল টিকাবীজ হিমশুষ্ক অবস্থায় থাকে। এ টিকা দুমাসের অধিক বয়সের মুরগির জন্য উপযোগী। প্রথমে ভায়ালেরটিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তা থেকে ১ মি.লি. করে নিয়ে প্রতিটি মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। ছয় মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে। টিকা ছাড়া খামার থেকে রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা-

ক) রানীক্ষেত রোগে মৃত পাখিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটিচাপা দিতে হবে।

খ) খামারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন-আয়োসান, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায়) দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

গামবোরো রোগ

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রমণ রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এ রোগের পাখির রোগ প্রতিরোধক অঙ্গ অর্থাৎ বার্সা ফ্যাব্রিসিয়াস আক্রান্ত হয় বলে প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ রোগকে বার্ড এইডস বা পোল্ট্রি এইডসও বলা হয়। এই রোগটি সর্ব প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ডেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের গামবোরো জেলায় শনাক্ত করা হয় বলে একে গামবোরো রোগ বলে। কিন্তু এর মূল নাম ইনফেকশাস বার্সাইটিস বা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ । এ রোগে সাধারণত ২-৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্তের হার খুব বেশি (১০০% পর্যন্ত), তবে মৃত্যু হার খুব কম (৫-১৫%)। তবে কোনো কোনো সময় আক্রান্ত বাচ্চার ৫০% মারা যেতে পারে। এ রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

রোগের কারণ :

বিরনাভাইরিডি পরিবারের অন্তগর্ত বিরনা ভাইরাসের সেরোটাইপ ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসের দুটো স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন- ক্ল্যাসিকাল ও ভেরিয়েন্ট স্ট্রেইন।

সংক্রমণ :

১. একই ঘরে রাখা অসুস্থ বাচ্চার সংস্পর্শে সুস্থ বাচ্চা এলে।
২. বাতাসের মাধ্যমে।
৩. কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি মাধ্যমে।

৪. খাদ্য, লিটার, পোকামাকড়ের মাধ্যমে।
৫. পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থীর জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে।

গামবোরো রোগে আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায় :

১) ক্ষুধামন্দা
২) পালক উসকোখুশকো হয়ে যায়।
৩) শ্লেষ্মাযুক্ত মল ত্যাগ করে, মলে রক্ত থাকতে পারে। এ মল মলদ্বারের চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে।
৪) প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পরে তা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে আসে।
৫) পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।
৬) পাখি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে যায়।
৭) শরীরের সতেজতা নষ্ট হয়।
৮) তীব্র রোগে পাখির শরীরে কাঁপুনি হয় ও অবশেষে মারা যায়।
৯) বেঁচে যাওয়া পাখির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
১০) বাচ্চাগুলো একসঙ্গে ব্রুডার বা ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে থাকে।
১১) ক্রিম সবুজ রঙের ডায়রিয়া হয়।

চিত্র : ১১.৩ গামবোরো রোগে অক্রান্ত মুরগি

রোগ নির্ণয় :

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায় : -
১. রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
২. মৃত বাচ্চার ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে–
৩. থাইমাস এবং বার্সা ফুলে যায় ও তাতে রক্তের ছিটা পাওয়া যায়।
৪. পা এবং উরুর মাংসে রক্তের বড় বড় ছিটা দেখা দেয়।

চিত্র : ১১.৪ গামবোরো রোগের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ২০২০

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই । তবে আক্রান্ত পাখিগুলোকে ৩-৫ দিন স্যালাইন পানি (৫ লিটার পানি +২৫০ গ্রাম আখের গুড় + ১০০ গ্রাম লবণ) পান করালে এদের পানিশূন্যতা রোধ হয়।

রোগ প্রতিরোধ :

রোগ প্রতিরোধই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা। এজন্য খামারে সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ঘরদোর, খাঁচা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক, যেমন ফরমালিন (ফরমালিনঃ পানি = ১:৯),আয়োসান বা সুপারসেপ্ট দিয়ে ধৌত করতে হবে। বাংলাদেশে গামবোরোর বেশ কয়েক ধরনের টিকা আমদানি করা হয় যেমন :

১. নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ ।
২. ভি১ বার্সা জি
৩. বার ৭০৬
৪. গামবোরাল সিটি ইত্যাদি।

এগুলো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় নির্দিষ্ট বয়সে পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, ১৪-১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪-২৮ দিন বয়সে বুস্টার হিসেবে চোখে ড্রপ বা মুখের মাধ্যমে পান করিয়ে এ টিকা প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মারেক'স রোগ

মারেক'স রোগ পাখির স্নায়ুতন্ত্রের টিউমার সৃষ্টিকারী মারাত্মক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এটি লিম্ফোপ্রলিফারেটিভ রোগ যা পাখির ক্যানসার। এ রোগে পাখির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, যৌন গ্রন্থি, চেখের আইরিস, পেশি ও ত্বক আক্রান্ত হয়। সাধারণত ৬-১০ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা মুরগি এবং বাচ্চা কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম হাঙ্গেরিতে মারেক নামে এক ব্যক্তি এ রোগটি আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে এ রোগের এরূপ নামকরণ করা হয়। অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে একে ফাউল প্যারালাইসিসও বলে।

রোগের কারণ

হারপেসভিরিডি পরিবারের অন্তর্গত হারপেস ভাইরাস ২ বা মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ

১. বাতাসের সাহায্যে জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে।
২. খাদ্যের ব্যাগ বা বস্তা, যন্ত্রপাতি, জামা-জুতা ইত্যাদির মাধ্যমে।
৩. আক্রান্ত পাখির লালা, শ্লেষ্মা, মল, পাখার ফলিকুল ইত্যাদির মাধ্যামে।
৪. কীটপতঙ্গ, বিশেষ করে, ডার্কলিং বিটলের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ

২০২০ অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আক্রান্ত পাখির জাত, বয়স ও ভাইরাসের স্ট্রেইনের ওপর এ রোগের লক্ষণ নির্ভর করে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায় :

১. প্রান্তীয় স্নায়ু আক্রান্তের ফলে এক পা, এক ডানা বা দুই পা, দুই ডানা অবশ হয়ে ঝুলে পড়ে।
২. ঘাড়ের মাংসপেশি আক্রান্ত হলে মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে।
৩. আইরিস বা চোখের উপতারা আক্রান্ত হলে পাখিতে অন্ধত্ব দেখা দেয়।

চিত্র : ১১.৫ মারেক'স রোগে আক্রান্ত মুরগির অবশতা ও হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে-

১. ক্ষুধামান্দ্য দেখা যায়।
২. ফ্যাকাশে দেখায়।
৩. পাতলা পায়খানা হয়।
৪. ডিম উৎপাদন কমে যায়।
৫. পাখি খোঁড়ায়, পা ও ডানা ইত্যাদি অবশ হয়ে যায়।
৬. হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
৭. অনাহার ও পানিশূন্যতার কারণে পাখি মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

ময়নাতদন্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায় : -

১. বার্সা ও থাইমাস ছোট হয়ে যাবে।
২. প্রান্তীয় স্নায়ু যেমন– সায়াটিক স্নায়ু মোটা হবে।
৩. যে কোনো অভ্যন্তরীণ অঙ্গে এবং ফলিফুল বা গোড়ায় টিউমার হবে।
৪. চোখের আইরিসের বর্ণের বিকৃতি ঘটবে

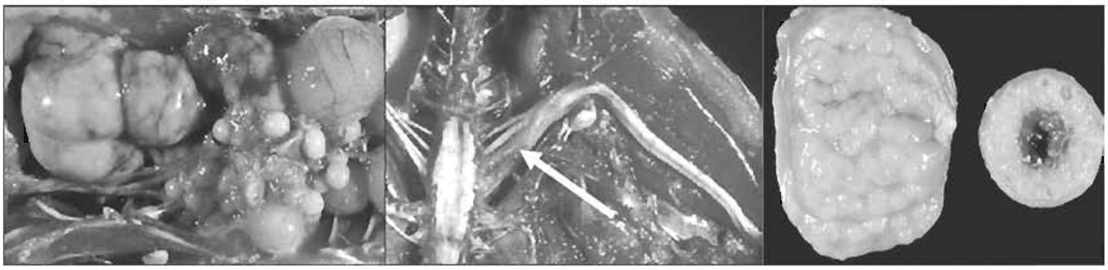

চিত্র : ১১.৬ সায়াটিক স্নায়ু মোটা

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোগপ্রতিরোধ

১. স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থায় খামার পরিচালনা করা।

২. বিভিন্ন বয়সের মুরগি বা কোয়েল আলাদা আলাদা পালন করা।
৩. খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. সুস্থ মুরগির বাচ্চার টিকা প্রদান করা।

মারেক'স রোগ প্রতিরোধের জন্য বাচ্চা মুরগিতে টিকা প্রয়োগ করা সর্বোত্তম পন্থা। যে কোনো ধরনের ক্যানসারের বিরুদ্ধে এটি প্রথম উদ্ভাবিত টিকা। বাংলাদেশে মারেক'স রোগের টিকা প্রস্তুত হয় না। তবে, বাজারে আমদানি করা টিকা কিনতে পাওয়া যায়। মারেক'স রোগের বিভিন্ন ধরনের টিকা রয়েছে। তবে এগুলের মধ্যে এইচ.টি.ভি.-১২৬ অর্থাৎ মারেক্সিন সি এ ভালো কাজ করে। এ টিকা একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগিতে ০.২ মি.লি. মাত্রায় মাংসপেশি বা ত্বকের নিচে প্রয়োগ করা হয়।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza)

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ :

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ। মানুষে ছড়ালে একে বার্ড ফ্লু বলে। মানুষে সংক্রমণের কারণে বার্ড ফ্লু বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত রোগ। এ রোগে ব্রয়লার মুরগির মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার :

রোগাক্রান্ত মুরগির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শ, মুরগির মল, লালা ইত্যাদি ব্যবহৃত খাদ্য, পানি, যন্ত্রপাতি, পাত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে। এছাড়া আক্রান্ত খামারের যানবাহন, ব্যক্তি, পরিদর্শনকারী ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- মুরগির খাবার চাহিদা কমে যায়।
- চোখ, মাথা ও ঝুঁটি ফুলে যায়
- চোখে দিয়ে পানি পড়ে।
- শরীরের পালকবিহীন অংশে রক্ত জমে কালো হয়ে যায়।
- মুরগি দুর্বল হয়ে প্যারাইসিস হয়ে যায়।
- আক্রান্ত মুরগির শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ঘড় ঘড় শব্দ করে।
- ঝুঁটি বেগুনি রং ধারণ করে।
- সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা দেখা যায়।
- আক্রান্তের হার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুর হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

চিত্র : ১১.৭ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

শরীরের বিভিন্ন অংশে ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। চামড়ার নিচে, শ্বাসনালী, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ ও ঘা দেখা যায়। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত ল্যাবে পাঠাতে হবে।

প্রতিরোধের উপায় :

জৈব নিরাপত্তা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়া কোনো খামারে এ রোগ দেখা দিলে সম্মিলিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমস্ত মুরগিকে ধ্বংস করতে হবে। কোনোভাবেই আক্রান্ত মুরগি খামার থেকে বের করা যাবে না।

ফাউল পক্স :

পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সের সব প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। পাখির বসন্ত একটি মারাত্মক রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকতা লাভ করে। তখন মৃত্যু হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও ফাউল পক্স বলতে সব পাখির বসন্ত রোগকেই বুঝায় তথাপি বর্তমানে আলাদা নামেও, যেমন- পিজিয়ন পক্স, টার্কি পক্স, ক্যানারি পক্স প্রভৃতি ডাকা হয়। পৃথিবীর প্রায় পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশেই বসন্ত রোগ দেখা যায়। এ রোগে পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত উন্মুক্ত স্থানে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে নডিউল সৃষ্টি হয় যা বসন্তের গুটি নামে পরিচিত।

রোগের কারণ :

পক্সভিরিডি পরিবারের ফাউল পক্স ভাইরাস নামক ভাইরাস বসন্ত রোগের কারণ।

সংক্রমণ : নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। যথা-

১. রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে সুস্থ পাখিতে এ রোগ ছড়াতে পারে।

২. ত্বকের ক্ষত বা কাটা ছেঁড়ার মাধ্যমে।

৩. কিউলেক্স ও অ্যাডিস মশার মাধ্যমে।

৪. তাছাড়া কখনো কখনো রক্তশোষক মাছি, ফ্লি ও আঠালির মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

২০২০

রোগের লক্ষণ :

বসন্ত রোগ প্রধানত দুইপ্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা–

ক. ত্বকীয় বা হেড ফর্ম : এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত পাখির মুখমন্ডলে বসন্তের গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির ক্ষুধামন্দ, দৈহিক ওজন হ্রাস ও ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটিকে শুষ্ক বসন্তও বলা হয়।

চিত্র : ১১.৮ ত্বকীয় বা হেড ফর্ম ডিপথেরিটিক প্রকৃতির লক্ষণ

খ. ডিপথেরিটিক প্রকৃতি : এ প্রকৃতিতে প্রথমে আক্রান্ত পাখির জিহ্বায় ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষত পরে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণে অবশেষে পাখির মৃত্যু ঘটে। এ প্রকৃতির বসন্ত আর্দ্র বসন্ত নামেও পরিচিত।

এ দুই প্রকৃতির বসন্ত আবার পাখিতে মৃদু ও তীব্র আকারে রোগলক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।

যেমন- মৃদু প্রকৃতির বসন্তে :

১. পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোসকা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২. মুরগির ঝুঁটি, গলকম্বল, পা, পায়ের আঙুল ও পায়ুর চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।

৩. চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়

তীব্র প্রকৃতির বসন্তে :

১. দেহের মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী ও অন্ত্রের দেয়ালেও বসন্তের ক্ষত দেখা দিতে পারে।

২. শ্বাসনালী আক্রান্তের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

৩. এতে ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।

৪. এতে পাখির মৃত্যুহার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়-

১. আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল দাগ হয়।

২. পরবর্তীতে যা বড় হয়ে পুঁজপূর্ণ হয়, পেঁকে ঘা সৃষ্টি করে।

৩. এ ঘায়ে শেষে মামড়ি সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে খসে পড়ে।

চিকিৎসা :

এ রোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত ক্ষত জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন- মারকিউরিকক্রোম) দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে সকেটিল, সালফানিলামাইড বা অন্য কোনো জীবাণুনাশক পাউডার লাগালে সুফল পাওয়া যায়।

২০২০

রোগ নিয়ন্ত্রণ

রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পাখিদের টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা

নিয়ন্ত্রণও জরুরি। বসন্ত প্রতিরোধের জন্য এ দেশে দুইধরনের টিকা প্রয়োগ করা হয়। যথা-

১। পিজিয়ন বক্স টিকা : এটি ৩ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে মিশিয়ে দুসপ্তাহের বাচ্চার ডানার পালকবিহীন অংশে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল বা সুচ দিয়ে খোঁচা মেরে প্রয়োগ করা হয়।

২। ফাউল পক্স টিকা : এ টিকা হিমশুষ্ক অবস্থায় ০.৩ মি.লি. মাত্রায় কাচের অ্যাম্পুলে থাকে। এ পরিমান টিকা পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে দুইশ পাখিতে প্রয়োগ করা যায়। পিজিয়ন পক্স টিকার মতো এ টিকাও এ পদ্ধতিতে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল দিয়ে পাখির ডানার পালকবিহীন স্থানে ৩ বার বিদ্ধ করতে হবে প্রতিবারই পরিশ্রুত পানিতে গুলানো টিকায় নিডল চুবিয়ে নিতে হবে। এ টিকা প্রয়োগের ৫,৭ও ১০তম দিনে টিকাবদ্ধ স্থানে বসন্তের গুটি দেখা গেলে এর কার্যকারিতা প্রমাণ হবে। এ টিকা এক মাসের বেশি বয়সের পাখিকে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও বিদেশে প্রস্তুত বসন্ত রোগের টিকা পাওয়া যায়। যেমন- ওভোডিপথেরিন ফোর্ট (ইন্টারভেট) যা কোম্পানির নির্দেশমতো মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। বছরে একবার পাখিতে এ টিকা প্রয়োগ করা হয়।

ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস (Infectious Bronchitis)

করোনা ভাইরাস এ রোগের কারণ। সাধারণত বাচ্চা মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাদা জাতের মুরগিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। মৃত্যুহার ১০-১৫ % পর্যন্ত হতে পারে। বাচ্চা মৃত্যুর হার ৯০% হতে পারে।

রোগের বিস্তার : বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত মুরগি ও তার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ :

১. খামারে এ রোগের আক্রমণ হঠাৎ করে ঘটে ও প্রায় সকল মুরগি এক সাথে আক্রান্ত হয়।
২. শ্বাসকষ্ট হয় ও মুখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে।
৩. সকালে ও রাতে লক্ষণগুলো প্রকট হয়।
৪. অনেক সময় পানির মতো পাতলা ডায়রিয়া হয়।
৫. চোখের ঝিল্লি লাল হয়।
৬. ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায় ও ডিমের খোসা পাতলা ও অমসৃণ থাকে।

চিত্র : - ১১.৯ ডিমের খোসা পাতলা অমসৃণ

চিত্র : -১১.১০ শ্বাসকষ্ট হয়

২০২০

পোস্টমর্টেম লক্ষণ : শ্বাসনালীতে প্রচুর শ্লেষ্মা ও মৃদু রক্তরক্ষরণ দেখা দেবে। অস্বাভাবিক ডিমের কুসুম দেখা যাবে।

প্রতিরোধ : নিয়মমতো টিকা প্রদান করতে হবে এবং জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

চিকিৎসা :

কার্যকর চিকিৎসা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ এড়াতে অ্যান্টিবায়োটিক (মাইক্রোনিড. ডক্সাসিল ভেট) প্রয়োগ করতে হবে।

ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গোট্রাকিয়াইটিস (Infectious Laryngotracheitis) :

ভাইরাসঘটিত এই রোগটির অপর নাম এভিয়ান ডিপথেরিয়া। ৮-১৬ সপ্তাহ বয়সে এবং ডিমপাড়া অবস্থায় যে কোনো সময় এ রোগের সংক্রমণ হয়। মৃত্যুহার ১০-১৬%।

রোগের বিস্তার :

- আক্রান্ত মুরগির শ্বাস-প্রশ্বাস বা দেহ নিঃসৃত পদার্থের সংস্পর্শের মাধ্যমে খামারে ব্যবহৃত জিনিস পত্রের মাধ্যমে এবং
- এ রোগে আক্রান্ত মুরগি সুস্থ হওয়ার পর তার থেকে রোগ ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- শ্বাসনালীতে রক্তক্ষরণ ও শ্লেষ্মা জমার কারণে শ্বাসকষ্ট হয়।
- নাক ও চোখ দিয়ে পানি গড়াতে থাকে।
- আক্রান্ত মুরগি মুখ খোলা রাখে এবং অনেক সময় দুইপায়ের উপর ভর করে ঘাড় লম্বা করে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে।
- ঘড়ঘড় শব্দ হতে থাকে।
- কোনো লক্ষণ প্রকাশের আগেই আক্রান্ত মুরগির মৃত্যু হতে পারে।

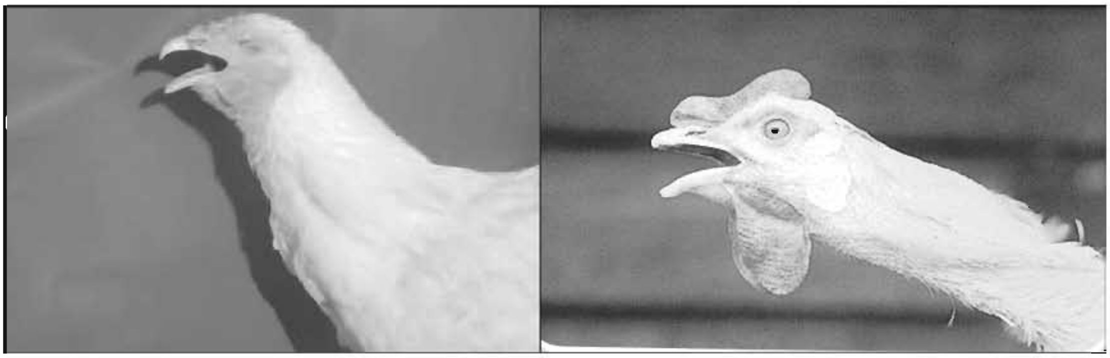

চিত্র : ১১.১১ ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গোট্রাকিয়াইটিস রোগে আক্রান্ত মুরগি ঘাড় লম্বা ও মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

মুরগির শ্বাসনালীতে সাদা আঠালো তরল পদার্থ পাওয়া যায়। ফুসফুস রক্তের মতো লাল হবে।

চিকিৎসা: এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

এগ ড্রপ সিনড্রম (Egg Drop Syndrom) :

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। শুধুমাত্র ডিম পাড়া মুরগিতে এ রোগ ক্ষতিসাধন করে। ডিম পাড়া মুরগি ডিম পাড়ার শুরুতে বা ডিম পাড়ার যে কোনো সময় আক্রান্ত হয়। ডিম পাড়ার সময় হঠাৎ করে ডিম উৎপাদন কমে যায় বলে এ রোগকে এগড্রপ সিনড্রম বলে।

রোগের বিস্তার :
আক্রান্ত মুরগির ডিম পাড়া শুরু করলে ভাইরাস নিঃসৃত হয়
এবং ফ্লোরের অন্য মুরগিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ :

১. সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময় ডিম পাড়া হঠাৎ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
২. ডিমের খোসার গুণগতমান খারাপ হয়।
৩. বাদামি ডিমের রং বিবর্ণ হয়।
৪. আক্রান্ত মুরগির রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
৫. খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়।
৬. ডায়রিয়া দেখা যেতে পারে।
৭. পাতলা খোসা, নরম খোসা বা খোসাবিহীন ডিম পাড়তে দেখা যায়।

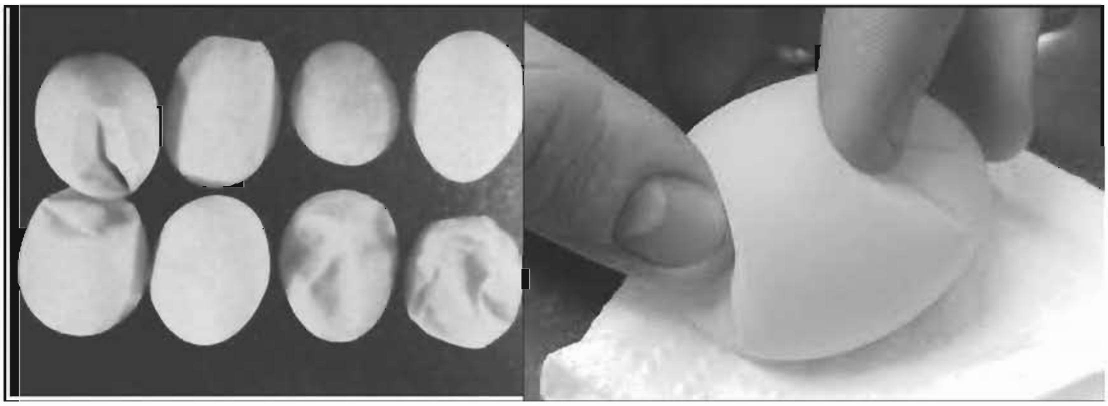

চিত্র ১১.১২ : এগ ড্রপ সিনড্রম রোগে আক্রান্ত মুরগির অগঠিত ও নরম খোসা বিশিষ্ট ডিম

প্রতিরোধ :
ডিমপাড়া শুরুর পূর্বে টিকা প্রদান করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। ডিম সংগ্রহ ও বহনের ট্রে নিয়মিত জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

চিকিৎসা : কোনো কার্যকরি চিকিৎসা নেই। ২০২১

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সমূহ:
সালমোনেলোসিস

সালমোনেলা গোত্রের ব্যকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগগুলোকে সালমোনেলোসিস বলে। যে কোনো বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবে ১ দিন হতে ২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। প্রধানত ডিমের মাধ্যমে বাচ্চাতে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। মৃত্যুহার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। সালমোনেলা পুলোরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হলে একে পুলোরাম রোগ বলে। সালমোনেলা গ্যালিনেরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হলে একে ফাউল টাইফয়েড রোগ বলে।

রোগের লক্ষণ :

১. মুরগির বাচ্চার পাছা ভিজা থাকবে ও হলদে বর্ণের পাতলা পায়খানা করবে।
২. বাচ্চা চিঁ চিঁ শব্দ করবে এবং মাথা একদিকে করে তাপের কাছে জমা হবে।
৩. পাখা এলোমেলো হবে। চুপচাপ বসে ঝিমাবে।
৪. খাবারের প্রতি অনীহা থাকবে।
৫. তীব্র পানিশূন্যতার কারণে মুরগি মারা যায়।
৬. মৃত বাচ্চার উদর গহ্বরে ডিমের কুসুম লেগে থাকে।
৭. বাড়ন্ত মুরগিতে খোঁড়া পা ও হাড়ের জয়েন্ট ফুলে ওঠার কারণে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৮. মুরগির হক জয়েন্ট ফুলে যায় ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।
৯. ঝুঁটি সাদা হয়ে যায়।

চিত্র : -১১.১৩ সালমোনেলোসিস রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

বাচ্চাতে কুসুম অশোধিত অবস্থায় থেকে যায়। বিকৃত ও বিবর্ণ ডিম্ব।

প্রতিরোধ :

১. বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখতে হবে।

২. বাহক মুরগি নিধন করতে হবে সালমোনেলা মুক্ত বাচ্চা দ্বারা খামার শুরু করতে হবে।
৩. নিয়মিত আইওসান মিশ্রিত পানি দ্বারা ঘর, খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার করতে হবে।

চিকিৎসা :
ইএসবি ৩০% পাউডার বা কসুমিক্স প্লাস ১ লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম মিশিয়ে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন স্যালাইন খাওয়াতে হবে। শুধু অ্যান্টিবায়োটিক সালমোনেলা দূর করা সম্ভব নয়। সালমোনেলা কিলার (যেমন : বায়োট্রনিক এস ই) নিয়মিত ব্যবহারে রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সংক্রামক সর্দি বা ইনফেকশাস করাইজা

সংক্রামক সর্দি বা ইনফেকশাস করাইজা মুরগির শ্বাসতন্ত্রের একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। সব বয়সের মুরগি এতে আক্রান্ত হলেও সাধারণত বয়স্ক মুরগি বেশি কারণে মুরগির মুখমণ্ডল ফুলে যাওয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগকে ঠাণ্ডা লাগা, আনকমপ্লিকেটেড করাইজাও বলে। এ রোগ ১০০ পাখি আক্রান্ত হতে পারে, তবে মৃত্যু হার আনুপাতিক হারে অনেক কম।

রোগের কারণ :

হিমোফিলাস গ্যালিনেরাম নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র দণ্ডাকৃতির বা কক্কোব্যাসিলাই ব্যাকটেরিয়ার এ. বি ও সি টাইপ এ রোগ সৃষ্টি করে।

সংক্রমণ পদ্ধতি :
নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হয়। যথা–
১. আক্রান্ত মুরগি সুস্থ মুরগির সংস্পর্শে এলে।
২. কলুষিত শ্লেষ্মার দ্বারা দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
৩. পাশাপাশি অবস্থিত মুরগির ঘরে বাতাসের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ :
করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা :
১. মুখমণ্ডল ও মাথা ফুলে যায়।
২. নাকমুখ দিয়ে পানি ঝরে।
৩. অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ হয়ে চোখ ফুলে যায় ও আঠাযুক্ত হয়।
৪. গলার ফুল বিবর্ণ হয়ে যায় ও ফুলে ওঠে।
৫. খাদ্য ও পানি পান করা বন্ধ হয়ে যায়।
৬. নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
৭. কাঁশি হয়ে ও গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয়।
৮. শ্বাসকষ্ট হয়।
৯. ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।
১০. লক্ষণ প্রকাশের ২-৩ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত পাখি মারা যেতে পারে।

চিত্র : ১১.১৪ করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগির মুখমন্ডল, মাথা, চোখ ফোলা।

রোগ নির্ণয় :

১. রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
২. নাকের ঝিল্লিপর্দা ও সাইনাসের শ্লৈষ্মিক প্রদাহ থাকে।
৩. অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ এবং মুখমণ্ডল ও গলার ফোলা থাকে।

সংক্রামক সর্দি বা ইনফেকশাস করাইজা চিকিৎসা :

১. খাদ্যের সঙ্গে সালফাডাইমিথোক্সিন ও সালফাথায়জল ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে পুনঃচিকিৎসা দিতে হবে।
২. তাড়াতাড়ি সুফল পেতে হলে ভেটেরিনারি সার্জনের নির্দেশিত মাত্রায় স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশন ও খাদ্যের সঙ্গে সালফোনেমাইড ওষুধ খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ :

নিম্নলিখিতভাবে সংক্রামক করাইজা রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

১. খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
২. যেহেতু এ রোগ থেকে সেরে ওঠা পাখি রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে তাই পালনের জন্য বয়স্ক মুরগি না কিনে একদিন বয়সের বাচ্চা কেনা উচিত।
৩. টিকার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য ইনঅ্যাকটিভেটেড ইনফেকশাস করাইজ টিকা ব্যবহার করা। নেদারল্যান্ডসের ইন্টারভেট কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত এ টিকার নাম নভিভ্যাক করাইজা। প্রতিটি পাখির পেশি বা ত্বকের নিচে ০.৫ মি.লি. মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা হয়। প্রথমবার ৬ সপ্তাহ বয়সে ও দ্বিতীয়বার ৪ সপ্তাহ বয়সে টিকা প্রদান করলে ৮ মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশে করাইজার কোনো টিকা প্রস্তুত হয় না।

নেক্রেটিক এন্টারাইটিস

এন্টারাইটিস কথাটির অর্থ হলো অন্ত্রের প্রদাহ। নানা কারণে অন্ত্রে প্রদাহ হতে পারে। অন্ত্রে উত্তেজক পদার্থের উপস্থিতি বা বিভিন্ন জীবাণু ও পরজীবীর কারণে এন্টারাইটিস হয়। সাধারণত ২-৮ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে ১ (এক) সপ্তাহ বয়সী বাচ্চাও আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ২০২০ ৫-৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

নেক্রেটিক এন্টারাইটিস রোগের কারণ :
বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, (যেমন : সালমোনেরা, ইকলাই, ও ক্লোস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস) ও প্রোটোজোয়া (ককসিডিয়া) এ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

রোগের লক্ষণ :

১. আক্রান্ত মোরগ-মুরগি ভীষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
২. প্রচন্ড ডায়রিয়া দেখা দেয়, লক্ষণ প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়।
৩. অনেক সময় লাল রঙের গুড়ের মতো পায়খানা হয় যা কক্সিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় হিসাবে ভুল হতে পারে।
৪. তাছাড়া অনেক সময় পানির মতো পাতলা পায়খানা হয় এবং বদ হজমকৃত খাদ্য পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসতে পারে।
৫. মোরগ-মুরগির ডানা ঝুলে পড়ে, দাঁড়াতে পারে না।
৬. পালক উস্কো-খুস্কো হয়ে যায়।
৭. ঠোঁট দিয়ে লালা পড়ে।
৮. বুকের মাংস কালো হয়ে যায়।

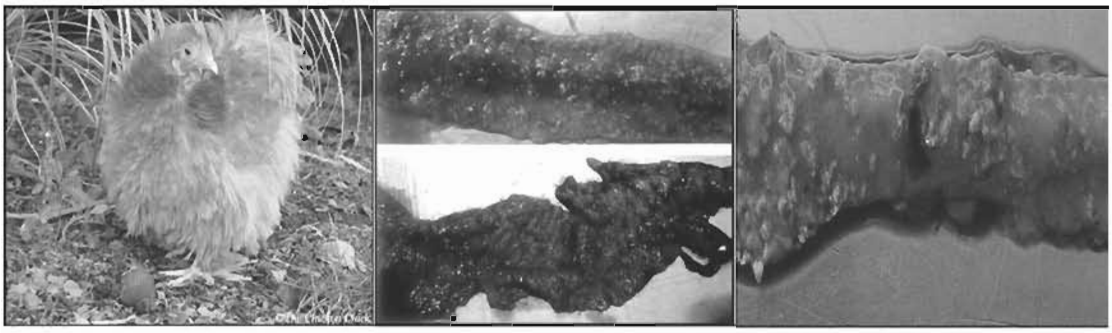

চিত্র : ১১.১৫ নেক্রেটিক এন্টারাইটিস রোগের লক্ষণ

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :
কলিজা বড় হয়ে যায়, হলুদাভ রঙের এবং রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। অন্ত্রে রক্তক্ষরণ হয় এবং গ্যাস জমে বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। অনেক সময় ক্ষুদ্রান্ত্রে সাদা রঙের ঘা দেখা দেয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর মোটা হয়ে যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ :
বায়োসিকিউরিটি মেনে চলতে হবে। সংক্রমিত ঘর ও সরঞ্জাম ১ : ২০০ বা ১ : ৫০০ কস্টিক সোডা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

১. ভাইরাস : ভ্যাকসিন বা টিকা প্রদানের মাধ্যমে ভাইরাসজনিত রোগ দমন করা হয়।
২. প্রোটোজোয়া : কক্সিডিয়া নামক প্রটোজোয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পোল্ট্রি খাদ্যে কক্সিডিয়া বিরোধী ঔষুধ ও ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়।
৩. ব্যাকটেরিয়া : এন্টারাইটিস সৃষ্টিকারী ২ ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে-

২০২০

(ক) সালমোনেলা, ই. কলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া- খাদ্যে বিভিন্ন এসিডিফায়ার (সালমোনেলা কিলার), অ্যান্টিবায়োটিক (সি.টি.সি./অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন/ফুরাজলিডন/টাইলোসিন ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়।

(খ) ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস : নামক গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি নেক্রোটিক এন্টাররাইটিস রোগটি দমনের জন্য আমরা কার্যকর তেমন কিছু ব্যবহার করি না। নেক্রোটিক এন্টারাইটিস যে কোনো বয়সের মোরগ-মুরগির হতে পারে। মৃত্যুহার লেয়ার মুরগির তুলনায় ব্রয়লার মুরগির বেশি। রোগটির সংক্রমণ কোনোরূপ পূর্বলক্ষণ প্রকাশ না করেই ঘটতে পারে। পুরাতন লিটার পুনঃব্যবহার করলে রোগটি ছড়াতে পারে। পুরাতন লিটারের মধ্যে রোগটির স্পোর বা বীজ থাকার সম্ভাবনা বেশি।

টিকিৎসা :

যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন- টেট্রাসাইক্লিন বা রেনামাইসিনের যে কোনো একটি ওষুধ বিধি মোতাবেক পানির সাথে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

কলিবেসিলোসিস (Colibacillosis)

ইসকারিসিয়া কলাই নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে কলিবেসিলোসিস রোগ বলে। এই জীবাণুটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সব প্রাণীর শরীরের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশে যেমন- খাদ্য বা পানির ভিতর এই জীবাণু উপস্থিত থাকে। সময় সুযোগমতো জীবাণুটি শরীরের ভেতর রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের অন্য কোনো রোগের উপস্থিতিতে বা অন্য কোনো ধরনের কারণে শরীর যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই এই জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে। আবহাওয়াগত বা অন্য কোনো কারণে বাতাসের আর্দ্রতা বা লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়

সংক্রমণের উপায় :

১) ডিম পাড়া মুরগির প্রজনন নালিতে জীবাণু বিদ্যমান থাকলে তা ডিমকে আক্রান্ত করতে পারে বা ঐ ডিম হতে যে বাচ্চা ফুটে তাকে সংক্রমিত করতে পারে।

২) আক্রান্ত মুরগির সংস্পর্শে এলে বা হাঁচি, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অন্য মুরগিতে ছড়াতে পারে।

৩) ইনকিউবেটরের আর্দ্রতা বেশি থাকলে এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে এই রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকলে সদ্য ফোটা বাচ্চার রোগ দেখা দিতে পারে।

৪) মোরগ-মুরগি স্থানান্তর করার সময় পরিবহন বা অন্য কোনো ধকল পীড়নের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৫) ঘরের মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাস জমে গেলে যে পীড়ন সৃষ্টি হয় তার ফলেও মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

এ রোগের লক্ষণগুলো নির্ভর করে মুরগির কোন অঙ্গে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করেছে তার উপর। যেমন :

১. অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis) :

- পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে এবং পিছনের পালকে বিষ্ঠা লেগে থাকে।
- পালক উস্কোখুস্কো থাকে।

২. কলিসেপটিসেমিয়া (Colisepticaemia) :

- হঠাৎ করে মোরগ-মুরগি অসুস্থ হয়ে পড়ে ও নিস্তেজ হয়ে যায়। নড়চড়ায় অনীহাভাব প্রকাশ পায়।
- মৃত্যুহার বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- শরীরের ভিতর বিভিন্ন অঙ্গে রক্তকরণ দেখা দেয়।
- ডিমের মাধ্যমে সংক্রমণ হলে ভ্রুণ মারা যায় বা বাচ্চা ফুটলেও রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত মৃত্যু হতে থাকে।
- যকৃতের মধ্যে সবুজ ক্ষত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো দেখা যায়।

৩. কলিগ্র্যানুলোমা (Coligranuloma) :

- মুরগির যকৃৎ, অন্ত্র ইত্যাদির ঝিল্লিতে গুটিগুটি দানার মতো দেখা যায়।

৪. এয়ার স্যাক ডিজিজ (Air Sac Disease) :

- ৬-৭ সপ্তাহের ব্রয়লার মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- শ্বাসনালী ও শ্বাস থলির মধ্যে এই ইনফেকশন হয় বলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- হৃৎপিন্ড, যকৃৎ ও চোখে প্রদাহ দেখা দেয়।

৫. প্যানঅপথ্যালমাইটিস ও সোলেন হেড ডিজিজ (Panopthalmitis & Swollen Head Disease) :

- কলি সেপ্টিসোমিয়া রোগে আক্রান্ত মুরগির চোখের ভিতর ও তার চারিধারে দধির মতো অথবা পুঁজ জাতীয় পদার্থ জমা হয় বলে চোখ ফুলে যায় ও চোখ বন্ধ করে রাখে। কখনও কখনও চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এটাই প্যানঅপথ্যালমাইটিস নামে পরিচিত।
- ব্রয়লার মুরগির চোখের চারিধারে পানি ও পুঁজ জমে ফুলে যায়। ফলে মনে হয় মাথা ফুলে গেছে। একে ‘সোলেন হেড ডিজিজ’ বলে। এ সমস্ত মুরগি বার বার মাথা নাড়ে ও ঘাড় বাঁকিয়ে রাখে।

৬. চর্ম প্রদাহ (Dermatitis) :

- চামড়ার নিচে জলপূর্ণ স্ফীতি ও মাংসপেশিতে রক্তক্ষরণ পরিলক্ষিত হয়।
- চামড়ার ঘা দেখা যেতে পারে।

সাইনোভাইটিস (Syovitis) :

- রক্তের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে হাড়ের জয়েন্ট বা অস্থি সন্ধিতে ইনফেকশন করে।
- সাধারণত বাচ্চা মুরগি আক্রান্ত হয়। ফলে অস্থি সন্ধি বা গীড়া ফুলে যায় ও মুরগি হাঁটতে পারে না।

৮. ওম্ফ্যালাইটিস (Omphalitis) :

- নাভীর প্রদাহে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে।
- অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে বাচ্চারা জড়ো থেকে থাকার প্রবণতা দেখা যায়।
- এই রোগে আক্রান্ত হলে বাচ্চার নাভীর ঘা শুকায় না এবং বাচ্চার মৃত্যু হয়।

প্রতিরোধের উপায় :

- জৈব নিরাপত্তা মেনে চলতে হবে।
- ডিম ফোটানোর জন্য সুস্থ, নীরোগ ও জীবাণুমুক্ত ডিম বেছে নিতে হবে।
- কোনোরূপ ধকল বা পীড়নে আক্রান্ত হওয়া মাত্র ভেট বেট পাউডার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

চিকিৎসা : -সিপ্রোফ্লক্স সলুশন ১ মিলি ১-২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়া হয় বিধায় খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হয়।

ওম্ফ্যালাইটিস/ন্যাভাল ইল :

ওম্ফ্যালাইটিস একটি ইসকারিসিয়া কলাই জীবাণুঘটিত রোগ তবে সংক্রামক নয়। ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে এ রোগটি মোরগ মুরগিকে আক্রমণ করে। ঘর বা লিটারের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে, হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মধ্যে আর্দ্রতা বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে, কোনো কারণে বাচ্চা অবস্থায় মুরগির পেটে থাকা ডিমের কুসুম অব্যবহৃত থাকলে, বাচ্চা অবস্থায় জীবাণুর সংস্পর্শে এলে ওম্ফ্যালাইটিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা খুব বেশি বা কম হলে এবং পরিবহনজনিত পীড়নের কারণে মৃত্যু হার অধিক হয়।

রোগের লক্ষণ :

- মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত মুরগির বাচ্চা সাধারণত সুস্থ দেখায়।
- অসুস্থ বাচ্চার ঝিমুনি হয় ও মাথা ঝুলে পড়ে।
- আলো-তাপের উৎসের দিকে জড়ো হয়ে থাকে।
- নাভি ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় সেটি লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। এ সময় আক্রান্ত স্থানে বাচ্চার ব্যথা অনুভূত হয়।
- জন্ম থেকে ১০-১৫ দিন বয়স পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু হার ১৫% পর্যন্ত হয়।
- বুকের চামড়ার নিচে ইডিমা (মাংস পেশিতে পচন ও পানি জমা) দেখা দিতে পার

চিত্র : ১১.১৬ ওম্ফ্যালাইটিস রোগের লক্ষণ (মুরগির পেটে থাকা ডিমের কুসুম অব্যবহৃত)

প্রতিরোধ :
হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মাধ্যমে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগের প্রতিরোধ ও বিস্তার রোধ করা সম্ভব। ইনকিউবেটরে পরিষ্কার ও ভালো ডিম বাছাই করতে বসাতে হবে।

চিকিৎসা : টেট্রো-ভেট পাউডার অথবা ডক্সাসিল-ভেট পাউডার নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে।

ফাউল কলেরা (Fowl Cholera)

হাঁস-মুরগির কলেরা বা ফাউল কলেরা হাঁসমুরগির ও অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্যপাখির একটি মারাত্বক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমক রোগ। উচ্চ হারে আক্রান্ত ও মৃত্যু হার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।সব বয়সের পাখি এতে আক্রান্ত হতেপারে। হাঁসমুরগির ঘর স্বাস্থ্যসম্মত না হলে এবং ব্যবস্থাপনা ঘাটতি থাকলে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। সঠিকভাবে রোগ শনাক্ত করে চিকিৎসা করতে না পারলে মৃত্যু হার অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া এ রোগ একবার দেখা দিলে দমন করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যদিও এ রোগকে ফাউল কলেরা বলে কিন্তু অ্যাভিয়ান পাশ্চুরেলোসিস, অ্যাভিয়ান হিমোরেজিক সেপ্টেসেমিয়া ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। তবে হাঁসের ক্ষেত্রে এ রোগকে হাঁসের কলেরা বা ডাক কলেরা বলা হয়।

মুরগির কলেরা রোগের কারন :
পাশ্চুরেলা মালটুসিডা নামক একপ্রকার গ্রাম নেগেটিভ ক্ষুদ্র দন্ডাকৃতির বাইপোলার ব্যাকটেরিয়া এ রোগের একমাত্র কারণ।

মুরগির কলেরা রোগের সংক্রমণ :
মুরগির কলেরা রোগ নিম্নলিখিত ভাবে সংক্রমিত হয়। যথা–
১. সংবেদনশীল মুরগির ঘরে কোনো বাহক মুরগি থাকলে বা প্রবেশ করলে।
২. বন্য পাখি বা অন্যান্য বাহক প্রাণীর সংস্পর্শে. সংবেদনশীল পাখি এলে।
৩. একই ঘরের বা খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হয়। যথা–
ক. আক্রান্ত মুরগির নাকের সর্দির মাধ্যমে।
খ. এ রোগের মৃত মুরগিকে ঠোকর দিলে।
গ. কলুষিত পানির মাধ্যমে।
ঘ. মানুষের জামা জুতো ঘরের ব্যবহিত সরঞ্জাম, টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।
ঙ. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আক্রান্ত মোরগ থেকে সুস্থ মুরগিতে ।

মুরগি ও অন্যান্য পাখিতে সাধারণত দুইপ্রকৃতিতে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন ঃ
১. তীব্র প্রকৃতির লক্ষণ।
২. দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণ।

১. তীব্র প্রকৃতির লক্ষণ ঃ
ক. হঠাৎ ধপ করে পড়ে মারা যায়। রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে অর্থাৎ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অল্পক্ষনের মধ্যেই মারা যায়।
খ. সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে। অনেক সময় পায়খানা ফেনাযুক্ত হয়।
গ. নাক মুখ দিয়ে পানি পড়ে।

২. দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণ ঃ
ক. গলার ফুল ফুলে যায়। (বিশেষ করে মোরগের ক্ষেত্রে)।
খ. মাথার ঝুঁটি একেবারে কালো হয়ে যায়।
গ. সন্ধিপ্রদাহ বা আর্থ্রাইটিস হয় এবং পা খোঁড়া হয়ে যায়।
ঘ. ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়। দুই মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকে।
ঙ. অবশেষে আস্তে আস্তে মারা যায়।

রোগ নির্ণয় ঃ
নিম্নলিখিতভাবে হাঁস-মুরগির কলেরা রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা ঃ
ক. রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
খ. ময়না তদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। যথা ঃ
১. অন্ত্রের রক্তক্ষরণ
২. যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ।
৩. হৃদপিন্ডের বাহিরের সাদা অংশে রক্তের ফোঁটা।
৪. মৃত মুরগির সমস্ত অঙ্গে রক্তক্ষরণ ও রক্তাধিক্য।
৫. গবেষণাগারে জীবাণু কালচার করে ।

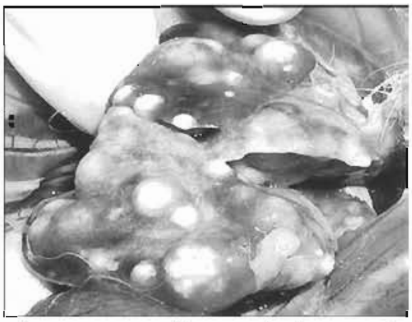
চিত্র : ১১.১৭ মুরগির কলেরা রোগের লক্ষণ (যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ)।

চিকিৎসা ঃ
কলেরা রোগের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইট গ্রুপের ঔষুধ উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।
১. ফ্লুমেকুইন ১০%পাউডার ১গ্রাম/২লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫দিন আক্রান্ত পাখিকে পান করাতে হবে।
২. ফ্লুমেকুইন ২০%সলুশন ১মিমি/৪লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫দিন আক্রান্ত পাখিকে পান করাতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ
১) কলেরা রোগ প্রতিরোধে নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
ক) এই ভ্যাকসিন ৭৫ দিন বয়সে ১ সিসি করে রানের মাংসে ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয় ।

খ) প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়ার ১৫ দিন পর পুনরায় ১ সিসি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয় ।

গ) তারপর ৬ মাস পরপর ১ সিসি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।

২. সব সময় খামারের আশপাশে জীবাণুনাশকের ব্যবহার বাড়ানো।

৩. লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা।

৪. এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার সময় জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

৫. খামারে জৈব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।

গ. মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট রোগঃ (মাইকোপ্লাজমোসিস)

মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগসমূহকে মাইকোপ্লাজমোসিস বলে। সাধারণত মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম ও মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি নামক জীবাণু মুরগির মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। সকল বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুহার সাধারণত কম তবে অন্য রোগে সৃষ্ট জটিলতার জন্য মৃত্যুহার ৩০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার :

- আক্রান্ত মুরগি ও ডিমের মাধ্যমে সুস্থ মুরগি বা বাচ্চাতে রোগটি হতে পারে।
- গৃহপালিত মুরগি, বন্যপ্রাণী,আঠালী, ইঁদুর প্রভৃতির মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
- রোগটির সংস্পর্শে আসা মানুষের হাতপা ও আক্রান্ত ফোমের আসবাসপত্র, যন্ত্রপাতি বা পরিবহন যানের মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- চোখ দিয়ে পানি ও নাক দিয়ে লালা ঝরে, চোখে পুঁজ জমা হয়ে থাকে।
- গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়।
- চোখের পাতা, মাথা, মুখ ও পায়ের গিরা ফুলে থাকে, যার জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটে।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মুরগি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।
- পায়ের তলায় ফুলে যায়, পুঁজ হতে পারে।
- বুকের মাংসে ফোসকা দেখা যায়।
- ব্রয়লারের ৪-৮ সপ্তাহ বয়সে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

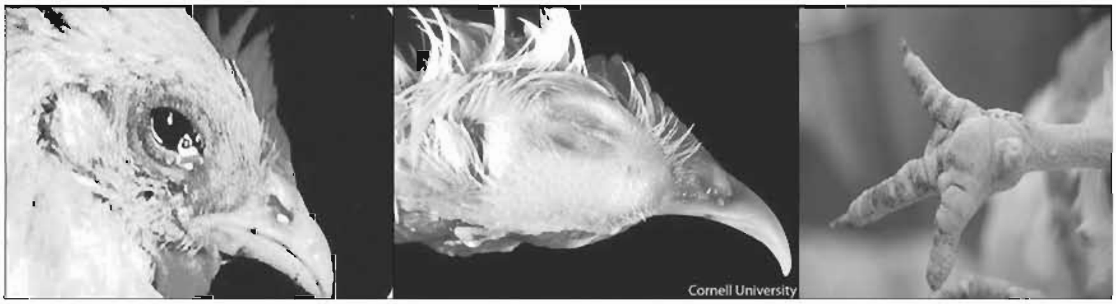

চিত্র : ১১.১৮ মাইকোপ্লাজমোসিস রোগে চোখ, নাক দিয়ে পানি, লালা ঝরে, চোখে পুঁজ জমা হয়ে পায়ের তলায় ফুলে যায়

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :
শ্বাসনালীতে প্রচুর হলুদাভ সর্দি (মিউকাস) জমে এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। গিরায় ক্রিমের মতো আঠালো পদার্থ দেখা যায়।

প্রতিরোধ :
রোগ ছাড়ানোর উপায়গুলো ভালোভাবে জেনে সেগুলো সম্পর্কে সতর্কতামূলক প্রতিরোধ ববস্থা নিতে হবে। নিয়মিত টিকা দিতে হবে। মাইকোপ্লাজমা মুক্ত খামার থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে। হ্যাচিং ডিম ইনকিউবেটরে রেখে ২-৩ ঘণ্টা তাপ (৩৭-৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) দিয়ে ০.০৪% -০.১০ টাইলোসিন টারট্রেন্ট বা জেন্টামাইসিন দ্রবণের মধ্যে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১০-৩০ মিনিট রেখে দিলে ডিমের মধ্যেকার মাইকোপ্লাজমা জীবাণু মারা যায়। মুরগির শেডে অতিরিক্ত ধুলাবালি ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

চিকিৎসা :
টাইলোসিন টারট্রেট ১ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

ঘ. ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ সমূহঃ

ব্রুডার নিউমোনিয়া

এসপারজিলাস ফ্লেভাস নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এ রোগকে এসপারজিলোসিস বলা হয়। মুরগির বাচ্চার ব্রুডিংকালীন সময়ে এ রোগ নিউমোনিয়া প্রকৃতির হয় বিধায় একে ব্রুডার নিউমোনিয়াও বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য বয়সের মুরগির আক্রান্ত হতে পারে। পুষ্টির অভাবজনিত কারণে দুর্বল মুরগি এবং বাড়ন্ত মুরগি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ব্রুডিংকালীন সময়ে হলে ১০-৫০% মুরগি মারা যেতে পারে।

রোগের বিস্তার :

- হ্যাচারিতে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর বা ব্রুডার হাউজে ব্রুডিং-এর সময় শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই ছত্রাকের স্পোর ফুসফুসে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
- লিটার বেশি আর্দ্র হলে এই রোগের জীবাণু জন্ম নেয়। উক্ত স্পোর শ্বাসনালীতে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ :

১. শ্বাসকষ্ট হয় ও হাঁ করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।
২. নিঃশ্বাসের সময় ঘড়ঘড় শব্দ হয়।
৩. খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দুর্বল হয়ে যায়।
৪. পিপাসা বেড়ে যাওয়ার ফলে বারবার পানি পান করে।
৫. বাচ্চা মুরগিতে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।
৬. চোখে আক্রান্ত হলে চোখ ফুলে যায় ও চোখ দিয়ে সবসময় পানি পড়ে।
৭. মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে অবশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না।

চিত্র : ১১.১৯ ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগে চোখ ফুলে যায়, ফুসফুসে সাগুদানার মতো নডিউল

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :
শ্বাসনালী, কণ্ঠনালী ও ফুসফুসে সাগুদানার মতো সাদা বা হলুদাভ নডিউল দেখা যায়। ফুসফুসে ধূসর বর্ণের ফেনা পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ :

১) হ্যাচারি যন্ত্র বাচ্চা ফোটানোর আগে ফিউমিগেশন করা উচিত। ছত্রাকমুক্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর আগে বেছে নিতে হবে। স্যাঁতসেঁতে বা বেশি শুকনা লিটার ব্যবহার করা উচিত না।

২) বেশি দিনের পুরনো ছত্রাকযুক্ত খাদ্য খাওয়ানো যাবে না, খাদ্য উপাদান মেশানোর পর বেশি দিন রাখা যাবে না। ময়লা-আবর্জনামুক্ত শুকনা পরিবেশ রাখতে হবে। খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। খাবারে নিয়মিত কপার সালফেট এবং মোল্ড বাইন্ডার যোগ করতে হবে।

চিকিৎসা :
কোনো সঠিক চিকিৎসা নেই। মাইকোফিক্স প্লাস প্রতি কেজি খাদ্যে ১.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। অথবা নিস্টাটিন জাতীয় ঔষধ খাবারে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

আফলা-টক্সিকোসিস (Afla-toxicosis)

এটি মাইকোটক্সিন জনিত মারাত্মক রোগ। অ্যাসপারজিলাস নামক ছত্রাক থেকে এই মাইকোটক্সিন তৈরি হয় বা খাদ্যের মাধ্যমে বিশেষ করে সয়াবিন, ভুট্টা, চালের গুঁড়া ইত্যাদির মাধ্যমে খামারের মুরগিতে বিস্তার লাভ করে। নিম্নমানের খাদ্য (১৪% এর অধিক আর্দ্রতা), উপযুক্তভাবে গুদামজাত না করা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ পোল্ট্রি খাদ্য মাইকোটক্সিন দ্বারা আক্রান্ত। সকল বয়সের মুরগি আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের বিস্তার :

১. খাদ্য যদি কোনো কারণে ভিজে যায় এবং সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়।
২. খাদ্য মেশানোর পর বেশি দিন রাখা হয় এবং তা যদি মুরগিকে খাওয়ানো হয়।

২০২০

রোগের লক্ষণ :

১. পালক ঠোকরাবে।
২. পায়ের রং ফ্যাকাসে হবে ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবে।
৩. খাদ্যে অরুচি ও পাতলা পায়খানা হবে।
৪. মুখে ঘা দেখা দেবে।
৫. পালক উসকো-খুসকো হবে।
৬. ঝিমাবে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে।
৭. শরীরের ওজন কমে যায়।
৮. পুষ্টি দ্রব্যের শোষণ হ্রাস পায়।
৯. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।
১০. পরবর্তীতে মুরগি মারা যাবে।

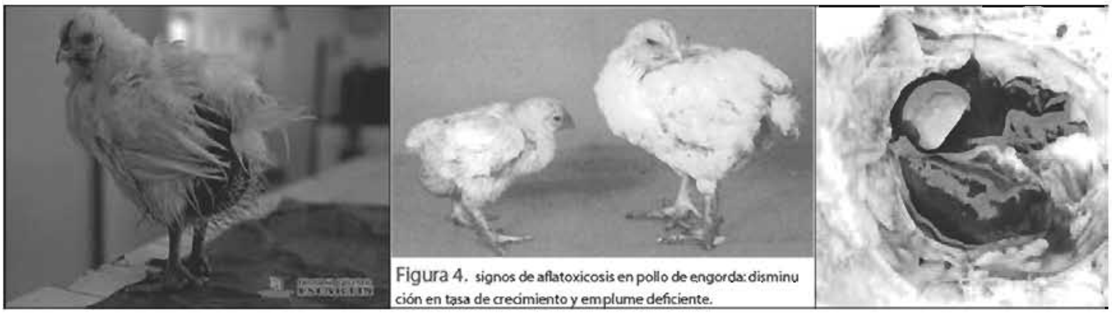

চিত্র : ১১.২০ আফলা-টক্সিকোসিস রোগে পালক উসকো-খুসকো, লিভার কালচে বর্ণ হয়ে যাওয়া

পোস্টমর্টেম লক্ষণ : লিভার কালচে বর্ণের। চামড়ার নিচে রক্তের ফোঁটা। পেটের ভিতরে প্রচুর রক্ত পাওয়া যাবে।

প্রতিরোধ :

খাবারে টক্সিন বাইন্ডার ও মোল্ড ইনহিবিটর নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত লিটার ও খাবার পরিবর্তন করতে হবে। মাঝে মাঝে খাবারে অফলাটক্সিন-এর পরিমাণ জানার জন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে হবে। লিটার শুকনা ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পচা, ভেজা ও নষ্ট খাবার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। পরিষ্কার খাবার ও পানি সরবরাহ করতে হবে।

চিকিৎসা :

১. মাইকোফিক্স প্লাস বা যে কোনো টক্সিন বাইন্ডার খাদ্যে মেশাতে হবে।
২. পানিতে আখের গুড় ও কপার সালফেট মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৩. পচা খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ : (ককসিডিওসিস বা রক্ত আমাশয়)

ককসিডিয়া নামক প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহকে ককসিডিওসিস বলে। অল্প বয়সের মুরগি বিশেষ করে ৪-৮ সপ্তাহের ব্রয়লার মুরগি এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে বেশি বয়সী মুরগিতেও কখনও

কখনও এ রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশে আইমেরিয়া টেনেলা ও আইমেরিয়া নেকাট্রিক্স নামে ২টি জীবাণু দ্বারা রক্ত আমাশয় হয়। মুরগির বাচ্চার মড়কের কারণগুলোর মধ্যে এই রোগ অন্যতম।

রোগের লক্ষণ :

১. হঠাৎ করে খাদ্য ও পানি গ্রহণে অনীহা দেখাবে।
২. পালক উসকো-খুসকো হবে।
৩. রক্ত মিশ্রিত চুনা বিষ্ঠা ত্যাগ করবে ও মলদ্বারের পালকগুলো বিষ্ঠায় ভিজা থাকে।
৪. বাচ্চা চোখ বুজে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে।
৫. শরীরে কাঁপুনি হয়।
৬. ঠোঁট পা ঝুঁটি ও গলার ফুল ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :

আক্রান্ত মুরগিতে রক্তমিশ্রিত পায়খানা থাকে। অন্ত্রের আক্রান্ত স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখা যায় ও অন্ত্রের দেয়ালের বাইরে থেকে রক্ত আবরণের চিহ্ন দেখা যায়। সিকামে রক্ত মিশ্রিত তরল বিষ্ঠা থাকবে।

প্রতিরোধ :

১. স্বাস্থ্যসম্মত লিটার ও পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
২. মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. বাড়ন্ত মুরগির সাথে বাচ্চা মুরগি রাখা যাবে না।
৪. পানির পাত্রের নিচের ও চারপাশের লিটার প্রতিদিন উল্টেপাল্টে দিতে হবে।
৫. বাচ্চা মুরগির ঘরে কাজ করার পর বড় মুরগির ঘরে কাজ করতে হবে।
৬. বিধি মোতাবেক ঘর পরিষ্কার ও লিটার পরিবর্তন করে নতুন ব্যাচে বাচ্চা তুলতে হবে।
৭. লিটার সব সময় শুষ্ক রাখতে হবে। ১০০ বর্গফুট জায়গায় ৫-৭ কেজি চুন ছিটিয়ে মিশিয়ে দিয়ে
৮. লিটার ওলট-পালট করে দিলে লিটার শুষ্ক থাকবে। ফলে ককসিডিয়ার জীবাণুসহ অন্যান্য জীবাণু মারা যাবে।
৯. প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যে ৫০ গ্রাম বাজারে প্রাপ্ত ককসিডিওস্ট্যাট মিশিয়ে খাদ্যে ব্যবহার করতে হয়। জৈব নিরাপত্তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
১০. টিকা ব্যবহার করেও বাচ্চার ককসিডিওসিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিকিৎসা :

১. ইএসবি৩ (৩০%) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন পান করাতে হবে।
২. এমবাজিন পাউডার ১.৫-২.০গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন পান করাতে হবে।

২০২০

চ) অন্যান্য রোগ : এসইটিস বা পেটে পানিজমা রোগ।

এসাইটিস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ব্রয়লার মুরগির একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের কারণ একাধিক তবে রক্ত সংবহন তন্ত্রের ত্রুটির জন্যই শেষ পর্যন্ত এসাইটিস দেখা দেয়। যে কোনো বয়সের মুরগিই আক্রান্ত হতে পারে তবে ৫-৬ সপ্তাহের মুরগিই বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ :

১. সাধারণ ঝাঁকের ছোট মুরগিগুলোই আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
২. পালক উসকো-খুসকো হয়।
৩. ঝুঁটি ফ্যাকাসে ও কুঁচকানো থাকে।
৪. হাঁটা বা নড়াচড়ায় অনীহা দেখায়।
৫. শ্বাসকষ্ট হয় এবং পেট বড় হয়ে যায়।

পোস্টমর্টেম লক্ষণ :
আক্রান্ত মুরগির পেটে হলুদাভ বা বাদামি রঙের পানি জমা হয়। হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যায়।

প্রতিরোধ :

১. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ভালো থাকলে, ব্রয়লারপ্রতি জায়গার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে, শেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লিটার শুষ্ক থাকলে, দুপুরের দিকে ২-৩ ঘণ্টা খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখলে এবং পানিতে দ্রবণীয় মাল্টি ভিটামিন খাওয়ালে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
২. খাদ্যের সাথে নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতি টনে ১২৫ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা :
এর কোনো চিকিৎসা নেই। তবে খাবারের অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ ব্যবহার করলে এবং পিএইচ কন্ট্রোলার ১ মিলি/ ২মিলি পানিতে ৫-৭ দিন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এনফ্লক্স-ভেট সলুশন ব্যবহার করলে রোগের প্রবণতা কমে।

১১.৩ মুরগির পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগের নাম, কারন, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

অপুষ্টিজনিত রোগ :
খাদ্যের যে কোনো এক বা একাধিক খাদ্যোপাদানের ঘাটতির কারণে ব্রয়লার মুরগির বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। নিচে ব্রয়লারে বিভিন্ন ভিটামিনসমূহের অভাবজনিত রোগ, তাদের চিকিৎসা ও প্রতিকারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ক) ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ :

ভিটামিন এ'র অভাবজনিত রোগ

কতদিন পর্যন্ত মুরগিগুলো এই ভিটামিনের অভাবে ভুগছে তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিন-'এ' এর অভাবে সৃষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। বয়স্ক মুরগিতে লক্ষণ দেখা দিতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। কিন্তু মুরগিতে ২/৩ সপ্তাহে মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভিটামিন-'এ' এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো অবস্থা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, চোখের পাতা ফুলে যায়।
২. নাক ও চোখ দিয়ে আঠার মতো জলীয় পদার্থ বের হয় এবং রাতকানা রোগ হয়।
৩. পায়ের হাঁটু ও চামড়ার হলুদ রং ফ্যাকাসে হয়ে যেতে থাকে।
৪. খাবার গ্রহণে আগ্রহ কমে যায় ও পালকের চাকচিক্য কমে যেতে পারে।
৫. মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল নীলাভ ও শুষ্ক হয়। ঝুঁটি শুষ্ক ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
৬. বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়।

অভাব নিরূপণ :

১) খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ সঠিক আছে কীনা তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।
২) রক্তের সিরামে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করা।
৩) চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় কীনা তা লক্ষ্য করার মাধ্যমে এই ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

খাদ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন। শাকসবজি, ভুট্টা, গম, ছোট মাছ, ফলমূল, ফলমূলের খোসা, হাঙ্গর মাছের তেল খাওয়ালে ভিটামিন-এ এর অভাব দূর হয়। লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিদিন বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন এ.ডি.ই দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমতো খাদ্য বা পানির সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন ডি'এর অভাবজনিত রোগ

শরীরের হাড় এবং ডিমের খোসার গঠনের জন্য অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতার জন্য এই ভিটামিন অত্যন্ত জরুরি। সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে বা খাবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে ভিটামিন-ডি নষ্ট হয়ে যায় ফলে মুরগি খাবার হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-ডি পায় না।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. পায়ের অস্থি নরম মোটা ও বাঁকা হয়ে যায়, ফলে মুরগি ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। একে
২. "রিকেট/অস্টিওম্যালেসিয়া" রোগ বলা হয়।
৩. ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে হাড় বাঁকা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।
৪. ঠোঁট, হাড় ও পায়ের নখ নরম হয়ে যায়, ফলে মুরগি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলে।
৫. দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ও পাজর ফুলে যায়।

চিত্র : ১১,২১ ভিটামিন ডি অভাবজনিত লক্ষণ

২০২০

রোগ নিরূপণ :

ক) লক্ষণ দেখে রোগ নিরূপণ তথা ভিটামিন-ডি এর অভাব বোঝা যায়।

খ) খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং

গ) সন্দেহজনক মুরগিকে যদি ভিটামিন-ডি সরবরাহ করে ভালো ফল লাভ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ভিটামিন-ডি এর অভাবে ভুগছিল।

সতর্কতা : অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন-ডি খাদ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োগ করলে মুরগির কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন-ডি এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির এ.ডি.ই দ্রবণ নির্দেশমতো খাওয়াতে হবে।

২) যেহেতু ভিটামিন-ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত তাই একই সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজনীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৩) খামারে ছোট বাচ্চাগুলোকে সম্ভব হলে দিনের কিছুটা সময় রোদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিলে এবং সকালবেলা ব্রয়লারের জন্য সূর্যালোকের ব্যবস্থা করলে ভিটামিন-ডি এর অভাবজনিত রোগের আশঙ্কা অনেক কমে যাবে।

ভিটামিন ই'এর অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন-ই এর অভাবে মুরগির এনসেফালোমেলাসিয়া, মাসকুলার ডিসট্রোফি, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি রোগ হতে পারে। খাদ্যে অপর্যাপ্ত সেলিনিয়ামের উপস্থিতি, বিভিন্ন উপকরণের সঠিক অনুপাতে মিশ্রণ না করা, তৈল জাতীয় খাদ্যের অক্সিডেশন ইত্যাদির কারণে ভিটামিন-ই এর অভাব হতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. আক্রান্ত হাঁটতে পারে না, পা টান করে ছেড়ে দেয়।
২. বাচ্চার মাথার বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও জায়গাগুলো নরম হয়। এ রোগকে অ্যানসেফালোম্যালেশিয়া বলে।
৩. বুক ও উরুর মাংস শুকিয়ে যায়, একে মাসকুলার ডিস্ট্রফি বলে।
৪. চামড়ার নিচে পানি জমার কারণে শরীর ফুলে যায়, একে অ্যাকজুডেটিভ ডায়াথেসিস বলে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

(ক) চিকিৎসার জন্য বাজারে প্রাপ্ত এ.ডি.ই দ্রবণ প্রস্তুতকারকের নির্দেশমতো খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

(খ) রোগ প্রতিরোধের জন্য সর্বদা খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের মাত্রা বজায় রাখতে হবে।

(গ) খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তৈল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ রাখতে হবে।

(ঘ) সংরক্ষিত খাদ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ খনিজ বিশেষত সেলেনিয়াম খাদ্যে মিশাতে হবে।

ভিটামিন কে'র অভাবজনিত রোগ

এই ভিটামিনটি শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এর অভাব হলে ঠোঁট কাটার সময় বা সামান্য আঘাতে অধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। আবার আমাশয় আক্রান্ত হলে পায়খানায় প্রচুর রক্ত দেখা যায়। খাদ্য ও পানিতে যদি সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয় তবে এই ভিটামিনটির মেটাবলিজমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে অন্ত্রের মধ্যে ভিটামিন-কে উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াসমূহ মরে যায়, ফলে দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে এ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ সৃষ্টি হতে পারে। খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন সংরক্ষণ করলেও খাদ্যের উপস্থিত এই ভিটামিনটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. এ ভিটামিনের ঘাটতির কারণে শরীরে কোথাও কোথাও কেটে গেলে বা ক্ষত হলে, রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। ফলে মুরগির মৃত্যু ঘটে।
২. ঠোঁট কাটার পর অধিক সময় ধরে রক্তক্ষরণ হয় ফলে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়ে মুরগি মরে যেতে পারে।
৩. চামড়া ও মাংসপেশিতে রক্তপাত হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

ক) ঠোঁট কাটার কয়েক দিন পূর্ব হতে খাদ্যে ভিটামিন-কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
খ) রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসা চলাকালেও অতিরিক্ত ভিটামিন-কে সরবরাহ করা প্রয়োজন।
গ) সবুজ ঘাস, মাছের গুঁড়া শাকসবজি ইত্যাদি খাওয়ালে ঘাটতি দূর হয়।
ঘ) চিকিৎসার জন্য খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।
ঙ) অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার সময় এবং তারপর কিছুদিন খাদ্য ভিটামিন-কে সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন বি -১ (থায়ামিন)'র অভাবজনিত রোগ

পানিতে দ্রবণীয় এ ভিটামিনটির অভাবে খুব তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-বি-১ বিদ্যমান না থাকলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. অরুচি এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
২. দৈহিক ওজন হ্রাস।
৩. উসকো-খুসকো পালক।
৪. দুর্বলতা এবং হাঁটতে অনীহা।
৫. ঝিমানো ভাব।
৬. ঘাড় বাঁকানো বা ঘুরিয়ে উল্টোভাবে রাখা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।
৭. কখনও কখনও মুরগি ঘাড় পিছনের দিকে বাঁকা করে উর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করে। একে 'স্টার গেজিং' বলে।

২০২০

রোগ নির্ণয় :

১. লক্ষণ অনুযায়ী ভিটামিন বি-১ এর অভাবে ভুগছে।

২. আক্রান্ত মুরগির খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এরা আসলে ভিটামিন- বি-১ এর অভাবে ভুগছে কীনা।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) পানি বা খাবারে ভিটামিন-বি-১ সরবরাহ করা। প্রথম কয়েক দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

২) খুব অসুস্থ মুরগির জন্য আরও বেশি পরিমাণে ভিটামিন- বি-১ খাবারে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৩) এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন খাবারের সাথে ভিটামিন-বি১ মিশিয়ে দিতে হবে।

ভিটামিন বি -২ (রাইবোফ্লাভিন)'র অভাবজনিত রোগ

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং খাবার পানির পিএইচ (অম্লত্ব) ভিটামিন বি-২ কে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

বাচ্চা অবস্থায় প্রথমকয়েক সপ্তাহ ও ভিটামিনটির অভাব হলে মুরগির মধ্যে-

১. দৈহিক দুর্বলতা ও অপর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়।

২. শুকিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক পালক গজায় না।

৩. পাতলা পায়খানা হয়।

৪. তীব্র আক্রান্ত মুরগির পা অবশ হয়ে গিয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হাঁটে।

৫. প্রায় সময় ও ভিটামিনের অভাবে পায়ের অবশতাজনিত রোগ দেখা যায় যাকে কার্ল-টো-প্যারালাইসিস বলে । এক্ষেত্রে দুই পা দুই দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে এক পা চলে পিছনের দিকে চলে যায় ফলে পা-গুলো অচল হয়ে যায় । তাই তারা হাঁটতে পারে না এবং না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে ।

৬. ব্রিডার মুরগি হলে ডিম হতে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায় এবং ডিমের ভিতর বাচ্চা মারা যায় ।

রোগ নিরূপণ :

রোগের লক্ষণ দেখে ভিটামিন বি-২ সরবরাহ করলে যদি লক্ষণগুলো দ্রুত চলে যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিগুলো ঐ ভিটামিনের অভাবে ভুগছিল ।

১) খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন বি-২ থাকা দরকার ।

২) মাঝে মাঝে পানিতে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে বি-২ সরবরাহ করা প্রয়োজন, যাতে এই ভিটামিনের অভাব না হয়

৩) আক্রান্ত মুরগিগুলোকে আলাদাভাবে রেখে ভিটামিন বি-২ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি-৬ (পাইরিডক্সিন)'র অভাবজনিত রোগ

খাবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকলে এবং ভিটামিন বি-৬ এর স্বল্পতা থাকলে সাধারণত এ ভিটামিনটির অভাবজনিত সমস্যা দেখা যায় । কারণ এটি প্রোটিনের বিপাকে সাহায্য করে ।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা অরুচি, উসকো-খুসকো পালক ইত্যাদি।
২. দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত বা কম হওয়া।
৩. প্রজনন ক্ষমতাহ্রাস পায়।
৪. গুরুতর আক্রান্ত মুরগিগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং সব শেষে খিঁচুনি দেখা যায় এবং মৃত্যু হয়।

রোগ নির্ণয় :

খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ণয় করে ও রোগের লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণার ভিত্তিতে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ঐ ঝাঁকের মুরগিগুলি ভিটামিন বি-৬ এর অভাবে ভুগছিল।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

১) লক্ষণ প্রকাশ পেলে খাবারের বা পানির সাথে ভিটামিন বি-৬ সরবরাহ করে এ রোগের লক্ষণ প্রশমিত করা যায়।
২) নিয়মিত পরিমাণমতো ভিটামিন বি৬ খাবারের সাথে সরবরাহ করলে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় না।

বায়োটিন'র অভাবজনিত রোগ

অধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে বায়োটিন সৃষ্টিকারী জীবাণু মরে গিয়ে কিংবা খাদ্যের মধ্যে বায়োটিনের পরিমাণ কম হলে অথবা খাদ্যে বায়োটিন নষ্টকারী কোনো পদার্থের উপস্থিতি থাকলে মুরগিতে এটার অভাবজনিত বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। বাচ্চা মুরগির শরীরের অসাড়তার হাত থেকে রক্ষার জন্য এ ভিটামিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. পালক ভেঙে ঝুলে পড়া ও পরে হাড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে।
২. অনেক সময় চোখের পাতা বুজে থাকে বা চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
৩. বাচ্চা মুরগির পায়ের নিচে, মুখের কোনায় এবং চোখের পাতায় কড়া পড়ে যেতে পারে।
৪. ডিমের ভিতরে বাচ্চা মরে যায়।
৫. ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়

রোগ নির্ণয় :

১) লক্ষণ দেখে বায়োটিন প্রয়োগের ফলে যদি চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মুরগির বায়োটিনের অভাবে ভুগছিল।
২) খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ এবং রোগের লক্ষণ দেখে সমন্বয় করেও রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়োটিন মিশাতে হবে।
২) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে পানিতে অতিরিক্ত বায়োটিন মিশাতে হবে।
৩) খাদ্য বা পানিতে অত্যাধিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার পরিহার করতে হবে।
৪) খাদ্যস্থিত বায়োটিনের পরিমাণ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে খাদ্যে বায়োটিনের অভাব না হয়। ২০২০

কলিন’র অভাবজনিত রোগ

মোরগ-মুরগির শরীরে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে কলিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শারীরিক অসাড়তা দূর ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা কলার গঠনে এবং স্নায়ুতন্ত্র সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুরগির খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কলিন সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. পায়ের হাড় নরম ও বাঁকা হয়ে মুরগি অসাড় হয়ে যায়।
২. দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ।
৩. ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির কলিজায় অতিরিক্ত চর্বি ও রক্তক্ষরণজনিত লক্ষণ দেখা দেয়।
৪. ব্রয়লার ব্রিডার মুরগির মৃত্যুর হার বেড়ে যায়, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমে যায় ফলে ডিম পাড়াও কমে যায়।

রোগ নির্ণয় :

লক্ষণ দেখে এবং পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়াও খাদ্যস্থিত কলিন বৃদ্ধি করে যদি ফল পাওয়া যায় তবে ধরতে হবে কলিনের অভাব ছিল।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণ সয়াবিন মিল, গম ভাঙা, ফিশ মিল ইত্যাদি থাকায় মোরগ-মুরগিতে কলিনের অভাব সাধারণত হয় না। কারণ সয়াবিন মিল ও ফিশমিলে প্রচুর পরিমাণে কলিন থাকে। বাজারে বাণিজ্যিকভিত্তিতে যে কলিন বা কলিন ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন মতো খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে। তবেই কলিনের অভাজনিত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

ভিটামিন বি ১২ (সায়ানো-কোবালামিন)’র অভাবজনিত রোগ

শরীরের কোষের নিউক্লিক এসিড তৈরিতে, শর্করা ও চর্বির বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় ভিটামিন বি-১২ সাহায্য করে। তন্ত্রের বিভিন্ন জীবাণু এই ভিটামিনটি তৈরি করে বিধায় এই ভিটামিনটির অভাবজনিত রোগ খুব কম দেখা দেয় এবং খাদ্যে এর প্রয়োজন অত্যন্ত নগণ্য। লিটারে পালিত মোরগ-মুরগির এই ভিটামিনের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি মোরগ-মুরগিকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয় তবে এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
২. মৃত্যুর হার বেড়ে যায় এবং ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।
৩. ডিমের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে।

রোগ নির্ণয় :

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ইতিহাস, লক্ষণ ইত্যাদি দেখে ভিটামিন বি-১২ দিয়ে চিকিৎসা দিলে যদি ভালো ফল পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে মুরগিতে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব ছিল।

২০২০

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) লক্ষণ দেখা দিলে পানি বা খাবারের সাথে ভিটামিন বি-১২ সরবরাহ করতে হবে।

২) সুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে পানির সাথে ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন সি'র অভাবজনিত রোগ

স্ট্রেস বা পীড়ন প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসেবে ভিটামিন-সি ব্যবহার হয়ে থাকে। মোরগ-মুরগি ভিটামিন সি যথেষ্ট পরিমাণে নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে। দৈহিক বৃদ্ধি, বীর্য উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রকম বিষক্রিয়া বিশেষত কিছু খনিজ লবণের বিষক্রিয়ার হাত থেকে মোরগ-মুরগিকে রক্ষা করার ক্ষমতা ভিটামিন-সি এর রয়েছে। খাদ্যে ভিটামিন-সি এর অভাব থাকলে বা মোরগ-মুরগি অত্যাধিক গরম আবহাওয়ায় থাকলে বা পীড়ন (স্ট্রেস) সৃষ্টি হলে মোরগ-মুরগির ভিটামিন-সি এর অভাব দেখা দিতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
২. দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায়।
৩. খাদ্য হজম কম হয়।
৪. পীড়নের মধ্যে পড়লে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়
৫. মোরগ-মুরগির বিশেষত মোরগের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি মেশাতে হবে।

২) মোরগ-মুরগির ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) পীড়ন হলে বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে পানির সাথে অতিরিক্ত ভিটামিন-সি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

৪) ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে ও পরে কয়েকদিন ভিটামিন-সি সরবরাহ করতে হবে।

খ. খনিজ পর্দাথের অভাবজনিত রোগ সমূহ:
(ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস)

আমিষ, শ্বেতসার, চর্বি এবং ভিটামিনের মতো পাখির খাদ্যে খনিজ পর্দাথের একান্ত প্রয়োজন। পাখির দৈহিক বৃদ্ধি,স্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রজননের জন্য খনিজপদার্থ অত্যাবশ্যক। তবে অধিক পরিমাণে খনিজপদার্থ বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই পরিমিত পরিমাণ খনিজপদার্থ খাদ্যের সাথে সরবরাহ করতে হয়।

কাজ :

২. পাখির দেহের অস্থি গঠন, ডিমের খোসা তৈরিতে খনিজপদার্থ অত্যাবশ্যক।
৩. দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করে।
৪. খনিজ শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য বিপাকে সাহায্যে করে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়।

২. ডিমের খোসা নরম ও পাতলা হয়
৩. খোসা ছাড়া ডিম দেয়।
৪. অস্থির গঠন ঠিকমতো হয় না।
৫. রক্ত জমাট বাঁধে না।
৬. রিকেট রোগ ও কেজ লেয়ার ফ্যাটিগ রোগ হয়।
৭. বাচ্চা ফোটার হার কমে যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

১) মাছের গুঁড়া, ঝিনুক, হাড়, দানা শস্য, পালং শাক ইত্যাদি মুরগির খাদ্যে সরবরাহ করলে এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।
২) মুরগির খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে– বাচ্চা মুরগিতে ২.২ : ১।
৩) মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে– বাড়ন্ত মুরগিতে ২.৫ : ১।
৪) মুরগির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হবে– ডিমপাড়া মুরগিতে ৯ : ১।

সোডিয়াম

সোডিয়ামের কাজ :

১. দেহের অম্ল-ক্ষারত্ব সমতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
২. অস্থি গঠন করে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
২. ক্যানাবলিজম রোগ হয়।
৩. হাড় নরম হয়।
৪. রক্ত পাতলা হয়।
৫. ডি-হাইড্রেশন দেখা দেয় ও মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : খাদ্যে সাধারণ লবণ সরবরাহ করে এর অভাব দূর করা যায়।

জিংক

জিংকের কাজ :

১. পাখির দৈহিক বৃদ্ধি ,পালক গজানো ও ডিম উৎপাদনের জন্য জিংক প্রয়োজন।
২. অস্থির গঠনে জিংক প্রয়োজন।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না।
২. পালক কম গজায় ও পায়ের চামড়া উঠে যায়।
৩. পায়ের হাড় খাটো ও মোটা হয়।
৪. মুরগি ঠোকরা-ঠুকরি করে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা : মুরগির খাদ্যে জিংকের বা জিংকসমৃদ্ধ উপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে ।

সেলেনিয়াম

সেলেনিয়ামের কাজ :

১. সেলেনিয়াম হচ্ছে গ্লুটাথায়োন পারোক্সিডেজ (Glutathion Peroxidase) নামক এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. ডিম বসানোর চতুর্থ দিনে ভ্রূণের মৃত্যু হয়।
২. চামড়ার নিচে পানি জমে।
৩. দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
৪. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

ছোলা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে বা খাদ্যে সেলেনিয়াম যুক্ত করলে এর অভাব দূর হয়।

লৌহ ও কপার

অভাবজনিত লক্ষণ :

১. রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ হয়।
২. লাল পালকের রং ফ্যাকাশে হয়।
৩. স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা :

শাকসবজি, ঘাস, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। খাদ্যে ফেরাস সালফেট ও কপার সালফেট সংযোজন করতে হবে।

১১.৪ লেয়ার মুরগির টিকাদান কর্মসূচি :

টিকা বীজ হচ্ছে রোগের প্রতিরোধক যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়। পাখির দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। টিকা বীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে একপ্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক আমিষ পদার্থ তৈরি হয়। যাকে অ্যান্টিবডি বলা হয়। এ অ্যান্টিবডিই হচ্ছে রোগপ্রতিরোধ পর্দাথ। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যাবধানে টিকা প্রদানের যে সিডিউল তৈরি করা হয় তাই টিকা দান কর্মসূচি ।

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	ডোজ	প্রয়োগের মাধ্যম
১	মারেক্স	০.২ সিসি	চামড়ার নিচে
৪	গামবোরো + রানীক্ষেত (কিল্ড)	হাফ ডোজ(০.২৫সি,সি)	চামড়ার নিচে

২০২০

৬	ইনফেকশাস ব্রোংকাইটিস + রানীক্ষেত (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
১০	গামবোরো (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
১৫	মারেক্স	০.২ সিসি	চামড়ার নিচে
১৭	গামবোরো (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
২১-২৪	রানীক্ষেত (লাইভ)	১ ড্রপ	চোখে
৩৫	ফাউল পক্স	১ ডোজ	পাখার চামড়ার নিচে
৫৮-৬০	ইনফেকশাস ব্রোংকাইটিস + রানীক্ষেত (লাইভ)	১০০০ ডোজ ৫০ লিটার পানিতে	পানির সাথে
১০৫	ইনফেকশাস ব্রোংকাইটিস + রানীক্ষেত (লাইভ)	১০০০ ডোজ ৫০ লিটার পানিতে	পানির সাথে
১১০	ইনফেকশাস ব্রোংকাইটিস + রানীক্ষেত (লাইভ)	০.৩ মিলি	চামড়ার নিচে
প্রতি ২ মাস পর পর	রানীক্ষেত (লাইভ) (এনডি ক্লোন-৩০)	১০০০ ডোজ ৫০ লিটার পানিতে	পানির সাথে

ভ্যাক্সিন/ টিকা

জীবিত বা মৃত বা অর্ধমৃত অনুজীব বা অনুজীব নিঃসৃত বিষ বা এনজাইম যা শরীরে প্রবেশ করানোর পর নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাই ভ্যাকসিন। কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনেশন বলে। ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করেই শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়।

ভ্যাক্সিনেশনের নিয়মাবলি :

সঠিক মান ও জাতের ভ্যাক্সিন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

১. যে ভ্যাক্সিন যে বয়সে দেওয়ার নিয়ম সে বয়সেই দিতে হবে।
২. ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে/বোতলে তৈরি দুই বা ততোধিক ভ্যাক্সিন এক সাথে দেওয়া যাবে না।
৩. ভ্যাক্সিন গুলানো, মাত্রা ও প্রয়োগ করতে প্রস্তুতকারকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
৪. প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাক্সিন রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে।
৫. ভ্যাক্সিন গুলানোর সময় ভেটেরিনারি ওয়াটার বা পরিশ্রুত পানি ব্যবহার করতে হবে।
৬. ভ্যাক্সিন প্রয়োগের সরঞ্জাম কোনোক্রমেই কোনো রাসায়নিক বস্তু/ওষুধ/জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা যাবে না। পানিতে ফুটিয়ে সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
৭. রোগাক্রান্ত বা পীড়ন অবস্থায় ভ্যাক্সিন দেওয়া যাবে না।
৮. ভাইরাল ভ্যাক্সিন প্রয়োগের সময় গুলানো ভ্যাক্সিন বরফের মধ্যে রেখে দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
৯. ভ্যাক্সিন প্রয়োগের তিন দিন পূর্বে থেকে তিন দিন পর পর্যন্ত প্রতি ৫ লিটার পানিতে ১ গ্রাম করে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ডব্লিউ.এস.মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

১০. গুলানো ভ্যাক্সিন ১-২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
১১. ভোরবেলা অথবা বিকেল বেলা অথবা রাতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে।
১২. একটি ঘরের সকল পাখিকে একই সময়ে ভ্যাক্সিন দিতে হবে।
১৩. খাবার পানির মাধ্যমে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে পানিতে যাতে ক্লোরিন না থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
১৪. ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পর ভ্যাক্সিনের ভায়াল মাটির গভীর গর্তে পুঁতে রাখতে হবে অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।
১৫. ভ্যাক্সিন অবশ্যই থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে বরফ দিয়ে তার মধ্যে পরিবহন করতে হবে।

ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণ

বিভিন্ন কারণে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন-

১. ভ্যাক্সিনেশনে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, নিডল, ড্রপার যদি জীবাণুমুক্ত না হয়।
২. ভ্যাক্সিনের মাত্রা যদি নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে খুব কম বা খুব বেশি হয়।
৩. ক্লোরিনযুক্ত পানিতে ভ্যাক্সিন গুলানো হলো।
৪. নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিনের জন্য নির্দিষ্ট ডায়লুয়েন্ট (পানি) ব্যবহার না করলে।
৫. ভ্যাক্সিন যদি শরীরের মধ্যে ঠিকভাবে প্রবেশ না করে।
৬. বুস্টার ডোজ না দিলে।
৭. মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিন ব্যবহার করলে।
৮. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ বা পরিবহন না করলে।
৯. রোগাক্রান্ত পাখিতে ভ্যাক্সিন প্রদান করলে।
১০. খাদ্যে মাইকো টক্সিন এবং আফলা টক্সিন থাকলে।
১১. পীড়নকালে ভ্যাক্সিন দিলে।
১২. জীবিত জীবাণু দ্বারা তৈরি ভ্যাক্সিনের জীবাণুর মৃত্যু ঘটলে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

ভ্যাক্সিনেশনের বিভিন্ন উপায়

দুইটি পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা যায়- (ক) একক ভ্যাক্সিনেশন এবং (খ) সম্মিলিত ভ্যাক্সিনেশন।

(ক) একক ভ্যাক্সিনেশনের বিভিন্ন উপায়

১. **চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে** : সাধারণত ঘাড়ের বা পাখার চামড়ার নিচে এবং রানের বা বুকের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়।
২. **চোখ বা নাকের ছিদ্রের মাধ্যমে** : নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিনের জন্য নির্দিষ্ট আকারের ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে বা নাকের এক ছিদ্র পথে ১ ফোঁটা ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়।
৩. **ঠোঁট ডোবানোর মাধ্যমে** : নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দ্বারা ভ্যাক্সিন গুলিয়ে তার মধ্যে নাকের ছিদ্র পর্যন্ত ঠোঁট ডুবিয়ে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়।
৪. **ক্ষত তৈরির মাধ্যমে** : রানের কোনো স্থানে কয়েকটি পালক উঠালে একটি ছোট ক্ষত তৈরি হয়। এই ক্ষতস্থানে ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি দ্বারা লেপে দিলে ভ্যাক্সিনেশন হয়ে যায়।

(খ) সম্মিলিতি ভ্যাক্সিনেশনের উপায়

১. খাবার পানির সাথে : এই পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন ক্লোরিনমুক্ত পানি/পাতিত পানি/বৃষ্টির পানির সাথে

২০২০

মিশিয়ে ঐ পানি মুরগিকে পান করানো হয়। এ পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে-

- পাখিকে ৩ ঘণ্টাকাল পানি না দিয়ে তৃষ্ণার্ত করে ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি দিতে হবে।
- ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি পাত্রে ২-৩ ঘণ্টা সময় থাকতে হবে।
- ভ্যাক্সিন মিশ্রিত করতে হবে ব্যবহারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে।
- সকালে বা বিকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সময় ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি দিতে হবে।

২. স্প্রে ভ্যাক্সিনেশন :

পরিষ্কার, ক্লোরিন ও জীবাণুমুক্ত পানিতে/পাতিত পানিতে ভ্যাক্সিন মিশিয়ে স্প্রে কমেশিনের সাহায্যে ৩-৩.৫ ফুট উপর থেকে বাচ্চার উপর স্প্রে করতে হবে। ভ্যাক্সিন স্প্রে করার সময় দরজা জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

১১.৫ লেয়ার মুরগির পরজীবি জনিত রোগ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার :

পরজীবীজনিত রোগ

পরজীবী বা প্যারাসাইট এক ধরনের ক্ষুদ্র জীব যা অন্য জীব অর্থাৎ মানুষসহ পশুপাখির দেহে বসবাস করে জীবনধারণ করে। যে জীবের দেহে এরা জীবনধারণ করে তাদেরকে হোস্ট বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বলে। আবার কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাইরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে বহি : দেহের পরজীবী বলে। উভয় ধরনের পরজীবীর আক্রমণের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভারে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরা পাখির দেহে বাস করে পাখি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পাখি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী আছে যারা পাখির দেহে বাস করে রক্ত শুষে নেয়, ফলে আক্রান্ত পাখির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। যে কোনো পরজীবী দ্বারা পাখি আক্রান্ত হোক না কেন, এদের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত পাখির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এবং ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায়। এছাড়াও এক ধরনের পরজীবী আছে যাবা আক্রান্ত পাখির দেহ থেকে সুস্থ পাখির দেহে সংক্রামক রোগের জীবাণু সংক্রমিত করে থাকে। কাজেই পোল্ট্রি শিল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পেতে হলে পরজীবীজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ অপরিহার্য।

পাখির দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্তঃ পরজীবিঃ

পরজীবীর আক্রমণ নির্ভর করে পাখি পালন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধির ওপর। পাখির বাসস্থান যদি স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং পালন ব্যবস্থাপনা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক হয়, তাহলে এ ধরনের পরজীবীর আক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়। ব্রয়লার মুরগিতে এদের আক্রমণ নেই বললেই চলে। কারণ, ব্রয়লার মুরগি খুব অল্প সময়ের জন্য প্রতিপালন করা হয়। খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করলে সাধারনত পরজীবীর আক্রমণ খুব কম হয়। দেহাভ্যন্তরে পরজীবী আক্রমণের ফলে পাখির দেহে যেসব ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায় তা নিম্নরুপ :

১. কোষ বা কলার গঠন নষ্ট হয়ে যায়।
২. পোষকের খাদ্য খেয়ে ফেলার কারণ পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।
৩. সংক্রামক রোগের জীবাণু ছড়ায়।

৪. খাদ্যনালি বন্ধ করে রাখে, ফলে আক্রান্ত পাখি মারা যায়।
৫. পরজীবী টক্সিন বা বিষ তৈরি করে যা পোষকের দেহের জন্য ক্ষতিকর।
৬. ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ দেখা যায়।

বড় গোলকৃমি :
অ্যাসক্যারিডিয়া গ্যালি হচ্ছে মুরগির বড় গোলকৃমি যা ক্ষুদ্রান্ত্রে আক্রান্ত করে।

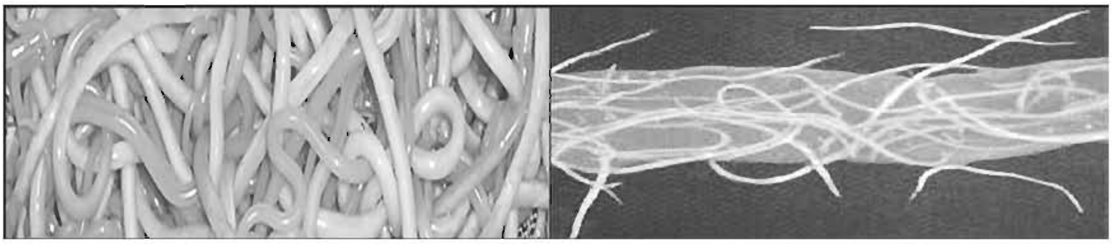

চিত্র : ১১.২২ অ্যাসক্যারিডিয়া গ্যালি (বড় গোলকৃমি)

জীবনচক্র
পরিপক্ব স্ত্রী গোলকৃমি পাখির ক্ষুদ্রান্ত্রে ডিম পাড়ে। কৃমির ডিম মুরগির মলের সাথে বের হয়ে আসে। বাইরের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার ফলে ডিমের মধ্যে লার্ভা জন্মায়। আস্তে আস্তে লার্ভা পরিপক্ব হয়। খাদ্য অথবা পানির সাথে পরিপক্ব লার্ভা মুরগির দেহে প্রবেশ করে। ২১ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপক্ব কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

কৃমির বিস্তার
একটি পরিপক্ব স্ত্রী কৃমি কয়েক হাজার ডিম দেয়। লার্ভাসম্বলিত ডিমই হচ্ছে মারাত্মক। পরিবেশের মধ্যে কৃমির ডিম কয়েক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের ব্যবহৃত জামা, জুতো, খামারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে এসব ডিম এক খামার থেকে অন্য খামারে ছড়াতে পারে। এরপর খাদ্য বা পানির মাধ্যমে এগুলো মুরগির দেহে সংক্রমিত হয়।

বড় গোলকৃমি আক্রান্তের লক্ষণ:

আক্রান্ত মুরগিতে নিম্ন বর্ণিত লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে। যেমন-
১. দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা।
২. খাদ্য কম খাওয়া।
৩. পালক উসকোখুসকো হয়ে যাওয়া।
৪. পাতলা পায়খানা হওয়া।
৫. শরীর রুগ্ন হওয়া এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
৬. ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া।

চিকিৎসা :
পাইপারজিন গ্রুপের যে কোনো একটি কৃমিনাশক, যেমন- পাইপারজিন সাইট্রেট, পাইপারজিন অ্যাডিপেট বা পাইপারজি ডাই-হাইড্রো-ক্লোরাইড খাদ্য বা পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে খালি পেটে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। কৃমিনাশক হিসেবে লেভামিজল ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ :
নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চললে মুরগিতে লোগকৃমির আক্রমণ হবে না। যথা–

১. নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্ধারিত মাত্রায় কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করাতে হবে।
২. সবসময় মুরগিকে সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।
৩. বাসস্থানের লিটার সবসময় শুষ্ক রাখতে হবে।
৪. বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগির সাথে বয়স্ক মুরগি পালন করা যাবে না।
৫. ঘরে মুরগি পালনের পূর্বে জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে বাসস্থান ও আশেপাশের এলাকা ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
৬. খাদ্য ও পানির সাথে যাতে মুরগির পায়খানা না লাগতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছোট গোলকৃমি

মুরগির ছোট গোলকৃমির নাম হচ্ছে হেটারেকিস গ্যালিনেরাম। এদেরকে সিকাম কৃমিও বলা হয়ে থাকে। এধরনের কৃমি সাধারণত মুরগির খাদ্যনালীর সিকাম নামক অংশে বাস করে।

জীবনচক্র :
পায়খানার সাথে এ কৃমির ডিম বাইরে বের হয়ে আসে। বাইরের আবহাওয়ায় ডিম থেকে লার্ভা হয়। খাদ্য বা পানির সাথে মুরগির দেহে এ লার্ভা প্রবেশ করে। অত:পর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে মুরগির সিকামে এরা পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

কৃমির বিস্তার:
মানুষে ব্যবহৃত জামাকাপড়, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বন্য পশুপাখি প্রভৃতির মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কৃমির ডিমের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও এ কৃমির ডিম সুস্থ মুরগিতে প্রবেশ করে।

ছোট গোলকৃমি আক্রান্তের লক্ষণ :

ছোট গোলকৃমি আক্রমণের ফলে মুরগির দেহে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা হলো–

১. বাদামি রঙের পাতলা পায়খানা হওয়া।
২. ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া।
৩. খাদ্য খাওয়া কমে যাওয়।
৪. ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া।
৫. পালক এলোমেলো ও উসকোখুশকো হয়ে যাওয়া।

চিকিৎসা
পাইপারিজিন গ্রুপের যে কোনো একটি কৃমিনাশক খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

এ কৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থা বড় গোলকৃমি প্রতিরোধের মতোই।

সুতাকৃমি :

মুরগির সুতাকৃমি হচ্ছে ক্যাপিলারিয়া গনের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েক প্রজাতির গোলকৃমি। এদেরকে চুলকৃমিও বলা হয়। ক্যাপিলারিয়া অ্যানুল্যাটা মুরগির খাদ্যনালি বা ইসোফেগাস ও খাদ্যথলি বা ক্রপে এবং ক্যাপিলারিয়া অবসিগন্যাটা ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে। উভয় ধরনের কৃমির ডিমই মুরগির পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে। ডিমের মধ্যে লার্ভা জন্মায়। এর লার্ভাসম্বলিত ডিম কেঁচো খেয়ে ফেলে। কেঁচোর দেহের ভিতরে লার্ভা বৃদ্ধি লাভ করে। মুরগি যখন কেঁচো খায়, তখন কৃমির এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লার্ভা কেঁচোর দেহ থেকে মুরগির দেহে চলে আসে এবং পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

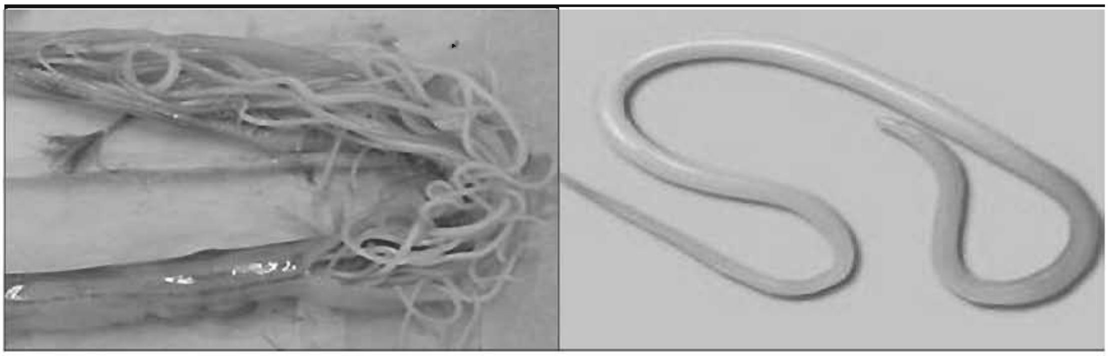

চিত্র : ১১.২৩ ক্যাপিলারিয়া অ্যানুল্যাটা (সুতাকৃমি)

কৃমির বিস্তার :

মানুষের ব্যবহৃত জামাকাপড়, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বন্য পশুপাখি প্রভৃতির মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কৃমির ডিমের বিস্তার ঘটে। খাদ্য অথবা পানির মাধ্যমেও সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ :

আক্রান্ত পাখির দেহে নিম্নক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা–

১. দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
২. দৈহিক ওজন একেবারে কমে যায়।
৩. পালক উসকোখুসকো দেখায়।
৪. পাতলা পায়খানা হয়।
৫. রক্তশূণ্যতা দেখা দেয়।
৬. অবশেষে পাখি মারা যায়।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিতভাবে আক্রান্ত পাখির চিকিৎসা করা যায়। যথা-

১. পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় লেভামিজল মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।
২. পাইপারজিন গ্রুপের কৃমিনাশকও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ

সুতাকৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্যান্য গোলকৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থার মতোই। ২০২০

ফিতাকৃমি :

হাঁসমুরগির মলের সাথে পরিণত বয়সের কৃমির অংশ বা সেগমেন্ট বের হয়ে আসে। কৃমির সেগমেন্টের মধ্যে ডিম থাকে। বিভিন্ন পোকামাকড়, যেমন শামুক, পিঁপড়া, মাছি ইত্যাদি কৃমির ডিম খেয়ে ফেলে। এদের দেহে ডিম থেকে কৃমির লার্ভা জন্মায়। হাঁসমুরগি কৃমি আক্রান্ত শামুক, পিঁপড়া , মাছি ইত্যাদি খেয়ে ফেললে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

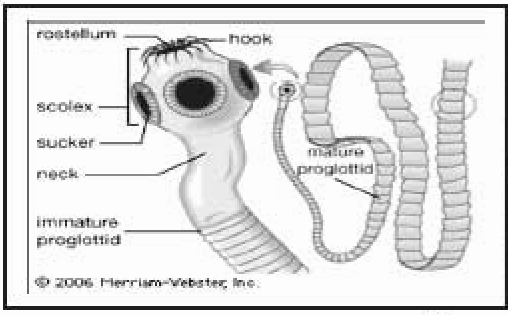

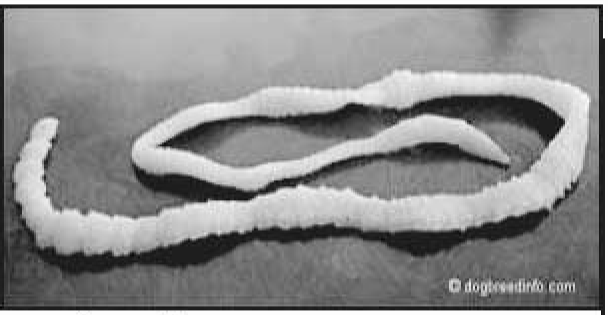

চিত্র : ১১.২৪ ফিতা কৃমি

ফিতা কৃমির বিস্তার :

বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের মাধ্যমে এদের বিস্তার ঘটে।

লক্ষণ:

এ ধরনের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে পাখিদেহে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো-

১. দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা।
২. খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
৩. পালক উসকোখুসকো হয়ে যাওয়া।
৪. পাতলা পায়খানা হওয়া।
৫. রক্তশূন্যতা দেখা দেওয়া।

চিকিৎসা:

নির্দিষ্ট মাত্রায় ডাইবিউটাইল-টিন-ডাইলাইউরেট পানি অথবা খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে মুরগির দেহ থেকে ফিতাকৃমি সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়।

প্রতিরোধ:

নিম্নলিখিতভাবে ফিতাকৃমির আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

১. মুরগির বাসস্থানে সঠিক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বাসস্থানের আশপাশে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
২. মাঝেমধ্যে চিকিৎসার অর্ধেক মাত্রায় কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

দেহের বহিঃ পরজীবী

যেসব পরজীবী পাখির দেহের বাইরের অংশ আক্রান্ত করে তাদেরকে বহিপরজীবী বা বহিঃপরজীবী বা বহির্দেহের পরজীবী বলে। যেমন-উকুন, আটালি, মাইট এবং ফ্লি ইত্যাদি। এরা বেশির ক্ষেত্রেই পাখির

চামড়া এবং পালকের মধ্যে বসবাস করে। এ ধরনের পরজীবী পাখির দেহে কামড় দেয়, রক্ত শুষে নেয় এবং অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের গরম আবহাওয়া এদের আক্রমণের অনুকূলে। যেকোনো পাখি পালনে এলাকায় এদের আক্রমণ দেখা যায়। খাঁচা বা লিটার যে পদ্ধতিতেই পালন করা হোক না কেন, এদের আক্রমণ সব জায়গায়ই বিরাজমান।

উকুন

এরা পাখির বুক, পেট ও পাখার নিচের পালক ও ত্বকের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে। কামড়ানি ও শোষক এ দুধরণের উকুনের মধ্যে কামড়ানি উকুন মুরগিকে আক্রান্ত করে। উকুন তাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র মুরগির মধ্যেই সম্পন্ন করে। পাখির দেহ ছাড়া এরা ছয় ঘন্টার বেশি বাঁচতে পারে না। এরা পাখির পালকের মধ্যে ডিম দেয়। দুসপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে উকুনের বাচ্চা হয় এবং পরবর্তীতে পরিপূর্ণ উকুনে পরিণত হয়।

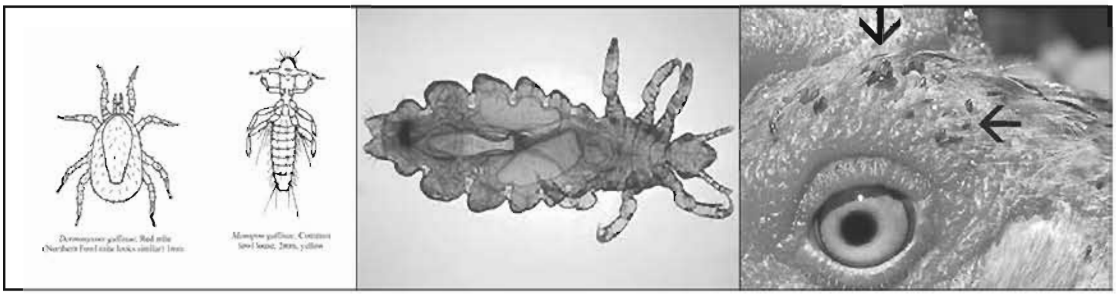

চিত্র : ১১.২৫ বিভিন্ন ধরনের উকুন

উকুনের আক্রমণে পাখির দেহে যেসব লক্ষণ :-

ক) উকুন চামড়ার উপরের অংশে কামড় দেয়,তাই মুরগি ঠোঁট দিয়ে শরীরের মধ্যে চুলকায়।
খ) পাখির মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়।
গ) চামড়া নষ্ট হয়ে যায়
ঘ) পাখি পালক খেয়ে ফেলে।
ঙ) ডিম উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধ ও দমন

নিম্নলিখিতভাবে পাখিতে উকুনের আক্রমণ প্রতিরোধ ও দমন করা যায়। যথা–
ক) মুরগির ঘরে যাতে বন্য পাখি ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
খ) পাখির দেহে উকুন দেহে উকুন আছে কিনা তা প্রতিদিন যাচাই করতে হবে।
গ) সুস্থ পাখির ঘরে উকুন আক্রান্ত পাখি ঢুকতে দেওয়া যাবে না।
ঘ) একই ব্যক্তিকে সুস্থ ও আক্রান্ত পাখির ঘরে কাজ করতে দেওয়া যাবে না।
ঙ) যে এলাকাতে প্রতিবছর উকুনের আক্রমণ দেখা দেয়, সে এলাকার মুরগির ঘরে মাঝেমধ্যে উকুননাশক স্প্রে করতে হবে।

চিকিৎসা :

ম্যালাথিয়ন, কার্বারাইল, ফেনক্লোরফস নামক কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় পানিতে বা বালিতে মিশিয়ে গোসল বা ধূলিস্নান করতে দিতে হবে।

আঠালি

আঠালি পাখির দেহে রক্ত শোষণ করে। রক্ত শোষণের পর দেহ থেকে নিচে নেমে আসে। পুরুষ আঠালি যৌন মিলনের পর মারা যায়। স্ত্রী আঠালি মুরগির ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ডিম দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। লার্ভা থেকে নিম্ফ এবং নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ আঠালি পরিনত হয় । রাতের বেলায় পাখির দেহে বসে রক্ত শোষণ করে।

চিত্র : ১১.২৬ বিভিন্ন ধরনের আঠালি

আঠালি আক্রমণে পাখির দেহে যেসব লক্ষণ :-

১) আঠালি কর্তৃক মুরগির রক্ত চুষে খাওয়ার ফলে মুরগি রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।
২) দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাঘাত ঘটে।
৩) বাতিল মুরগির সংখ্যা বেড়ে যায়।
৪) পাখির মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

প্রতিরোধ ও দমন:

পাখির ঘর, ঘরের আশপাশ এবং যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে শোধিত করতে হবে। আটালি আক্রান্ত এলাকায় মাঝে মধ্যে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

চিকিৎসা :

ম্যালাথিয়ন,কার্বারাইল, ফেনক্লোরফস নামক কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় পানিতে বা বালিতে মিশিয়ে গোসল বা ধূলিস্নান করতে দিতে হবে।

১১.৬ খামারের জৈব নিরাপত্তা বা বায়ো-সিকিউরিটি

বর্তমান বিশ্বে খামার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি বহুল আলোচিত শব্দ। খামার স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে খামার পরিকল্পনা, উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ, এমনকি ভোক্তার কাছে উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথা জীবাণুমুক্ত ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাবমুক্তভাবে সম্পন্ন করাই জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য :

১) বহিরাগত রোগজীবাণুর যেমন : রানীক্ষেত রোগ, বার্ড ফ্লু জাতীয় রোগের কবল থেকে খামার রক্ষা করা।
২) মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ ও জীবাণু যেমন- সালমোনেলা থেকে খামারকে রক্ষা করা।
৩) খামারের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান।
৪) রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় কমানো, লাভজনক উপায়ে খামার গড়ে তোলা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি কমানো।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখলে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলা যাবে :

১. খামারের স্থান নির্বাচন :

- পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি করে ঘর তৈরি করতে হবে।
- চারিদিকে খোলা মেলা, প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের সক্ষম এমন স্থান বেছে নিতে হবে।
- লোকালয় থেকে দূরে কিন্তু খামারের পণ্য বাজারজাতকরণের ভালো যোগাযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও শহর থেকে অনতি দূরে খামারের স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- খামারে পর্যাপ্ত পানি ও বিদ্যুতের সুবিধা থাকতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে।

২. রোগ জীবাণুর উৎস ও প্রতিরোধের উপায় নির্বাচন :

১) বাহক পাখি, বাইরে থেকে আমদানিকৃত জীবাণুবাহী ডিম ও ১ দিন বয়সের বাচ্চা, আক্রান্ত ডিম ও পাখি, মানুষের হাত-পা ও পোশাকাদি, ধুলাবালি, পালক, বিষ্ঠা ও জৈব বর্জ্য, বন্যপাখি, শিকারি জীবজন্তু, ইঁদুর ইত্যাদি।
২) দূষিত পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি।
৩) রোগ জীবাণু দুষ্ট সরবরাহের যন্ত্রপাতি যথা-ট্রাক, খাঁচা, ডিমের পাত্র ইত্যাদি।

রোগ বিস্তার প্রতিরোধের উপায় :

(ক) যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ ;

- যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে।
- সব ধরনের দর্শনার্থী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারের কর্মীদের খামারে ব্যবহৃত জুতা ও পোশাকাদি আলাদা রাখতে হবে এবং খামারের বাইরে বের করা যাবে না।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে ও পরে হাত পা জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে ও শরীরের বহিরাংশে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- খামারের বন্যপ্রাণী, পোষাপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- এক খামারে একই বয়সের মুরগি পালন করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে একটি ঘরে একই বয়সের মুরগি রাখতে হবে।

(খ) খামারে অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ :

- দর্শনার্থীদের জন্য একটি তথ্য বই সংরক্ষণ করতে হবে। খামার পরিদর্শনকারীর নাম-পরিচয়, সাক্ষাৎকারের তারিখ-সময় ইত্যাদি তথ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করে খামারের নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খামারকর্মী ও খামার পরিদর্শনকারী বহিরাগত উভয়কেই কাজ করার সময় বা খামার পরিদর্শনের সময় জীবাণুমুক্ত জুতা ও পোশাকাদি পরিধান করতে হবে। খামার পরিদর্শন ও কাজের শেষে পুনরায় এদের জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।

২০২০

- উপকরণ সরবরাহকারী বাস/ট্রাক ড্রাইভার ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরও উপরোক্ত উপায়ে যথাসম্ভব জীবাণু মুক্ত রাখতে হবে।
- বন্যপাখি নিয়ন্ত্রণের জন্য খামার ঘরের চারদিকে আলো বিকিরণকারী অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বেঁধে দিতে হবে।

গ) চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতা :

- পোল্ট্রি খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অথবা চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যকর্মীকে জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।
- প্রতিটি আলাদা শেডে ঢোকার পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে হাত-পা ধৌত করতে হবে। সম্ভব হলে আলাদা অ্যাপ্রন, হাত পায়ের মোজা ও মাথার আবরণী ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ খামারে প্রবেশকারী যানবাহন, তাদের চালক ও সংশ্লিষ্ট সহায়ক কর্মীবৃন্দের যে কোনো ধরনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন।
- ময়নাতদন্ত করার জন্য বাতাসের অনুকূলে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে খামারে জীবাণু প্রবেশের কোনো আশঙ্কা নেই। ময়নাতদন্ত শেষে স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৩. নিয়মিত টিকা প্রয়োগ :

খামারে মোরগ-মুরগিকে টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগমুক্ত রাখা একটি আধুনিক, জটিল ও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। আধুনিক কালে পোল্ট্রি শিল্পের সাফল্য সময়মত ও সফলভাবে টিকা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই টিকা প্রয়োগ কালে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করা বাঞ্ছনীয়। টিকা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে–

- হ্যাচারির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত স্বাস্থ্যকর্মীকে ১ দিন বয়সী বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে খামারিদের ধারণা দিতে হবে। মায়ের বা বাচ্চার শরীরের এন্টিবডি টাইটার লেভেল নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাচ্চার টিকা প্রদান কর্মসূচি নির্ণয় করতে হবে।
- সঠিকভাবে উৎপন্ন, সংরক্ষিত, পরিবাহিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণিভেদে টিকা প্রদানের সঠিক মাধ্যম অনুসারে টিকা প্রদান করতে হবে। যেমন- জীবন্ত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে খাবার পানি, স্প্রে বা চোখে ফোঁটা প্রদানের মাধ্যমে ও মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুতকৃত টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- অসুস্থ মুরগিকে টিকা প্রয়োগ করা যাবে না।
- টিকা প্রদানের পূর্বে ভিটামিন এ, ডি ও ই ব্যবহার করা ভালো।
- টিকা প্রদানের পর ভিটামিন সি, ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম ব্যবহার করা ভালো।

৪. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

- প্রতি সপ্তাহে মোরগ-মুরগির খাদ্য ও পানি গ্রহণের পরিমাণ, ওজন ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য বা পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হবে।
- সঠিকভাবে আলো প্রদান করতে হবে।
- কোনোরূপ রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথেই নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা :

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভজনক খামারের পূর্বশর্ত। তাই খামারের ভেতরের ও বাইরের চারিদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। মেঝে বা লিটার পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচে নতুন লিটার দেওয়া ও ঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা উচিত। খামারের সকল যন্ত্রপাতি, যেমন– মুরগির খাঁচা, ডিম রাখার পাত্র, খাবার ও পানি পাত্র ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বছরে অন্তত একবার শেডসহ সকল যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে অথবা ফিউমিগেশন করে পরিষ্কার করতে হবে। খামার পরিষ্কার রাখার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

খামারে ব্যবহৃত পুরোনো লিটার যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অপসারণ কালে ব্যবহৃত লিটার দ্বারা কোনোভাবেই যেন খামারের পরিবেশ নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

- সমস্ত ঘর ঝাড়ু দিতে হবে। খামারের প্রতিটি অংশ, যেমন- মেঝে, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্বসহ অন্যান সরঞ্জাম, দরজা জানালার মাঝে থাকা ধুলাবালি, মাকড়সার জাল প্রভৃতি পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট বাল্বের জায়গায় নতুন বাল্ব লাগাতে হবে।
- শেডের ভিতরে জীবাণুনাশক স্প্রে করলে ঘরের পিছন দিকে স্প্রে করা শুরু করে সামনের দিকে এসে শেষ করা উচিত। ঘরের ভেতরে প্রথমে ছাদ, পরে দেয়াল এবং সবশেষে মেঝেতে স্প্রে প্রয়োগ করার নিয়ম।
- শুকনো মেঝেতে অন্তত চার ইঞ্চি পুরু, শুষ্ক, শোষণক্ষম লিটার ছড়িয়ে দিতে হবে। লিটার হিসাবে ধানের তুষ সর্বোত্তম।
- লিটারে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে কীটনাশক নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। কীটনাশক ও জীবাণুনাশক একত্রে ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে কীটনাশক দেয়ালে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঘরের চারপাশে পর্দা হিসাবে পলিথিন বা নাইলনের বস্তা ব্যবহার না করে চটের বস্তা ব্যবহার করা উচিত। খাঁচা পদ্ধতির ঘরের ক্ষেত্রে প্রতি ব্যাচ বাড়ন্ত মুরগি পালন শেষে সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা অতীব জরুরি। লেয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্লক উঠানোর পূর্বে সমস্ত ঘর ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

৬. স্বাস্থ্যসম্মত ও আদর্শ খাদ্য প্রদান :

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন-সালমোনেলোসিস ও ছত্রাকজনিত যেমন-এসপারজিলোসিস, আফলা টক্সিকোসিস) রোগের জীবাণু খামারের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সত্যিকারের ভালো খাবার বলতে জীবাণুমুক্ত ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্যকে বুঝায়।

৭. মুরগির ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা :

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংসকারী জীবাণুনাশক অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রাতেই বেশি কার্যকর। বাতাসের তাপমাত্রা ৭০° ফা. এর উপরে এবং আর্দ্রতা ৭৫% এর উপরে থাকলে ফরমালডিহাইড গ্যাস সবচেয়ে ২০২০

কার্যকর।

ক) ক্লোরক্স (সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড দ্রবণ) : ১ কন্টেইনার ক্লোরক্স দিয়ে ৮০ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়। বাঁশের তৈরি মুরগির ঘরের মেঝে, চালা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরক্স খুবই কার্যকর।

খ) ভায়োডিন (আয়োডিন দ্রবণ) : ১ বোতল ভায়োডিন ১০% সলিউশন দিয়ে ৫ লিটার জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করা যায়।

গ) চুন দিয়ে মাচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি। ১০০-২০০ মুরগি পালন উপযোগী একটি ঘরের মাঁচার নিচের মাটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য ২০ কেজি পাউডার চুন ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮. বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পানির পাত্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা :

১) পান করার জন্য মুরগির খামারে টিউবওয়েলের পানি অথবা বাতাস দূষিত নয় এমন এলাকার সঠিক উপায়ে রাখা বৃষ্টির পানি অথবা পৌর কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত পানি অথবা ছাঁকা অথবা ১০০ লিটার পানির সাথে অন্তত ৩০০ মি. গ্রা. ক্লোরিন পাউডার মিশ্রিত করে ৩-৬ ঘণ্টা সংরক্ষণ করার পর সেই পানি সরবরাহ করা উচিত।

২) শেডে মুরগি থাকা অবস্থায় সপ্তাহে একবার পানিতে বেকিং সোডা (সোডিয়াম বাই কার্বনেট) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ড্রিংকার, বাল্ব ও পাইপ লাইনে আঠালো বস্তু জমতে পারবে না। পানির সাথে অ্যান্টিবায়োটিক বা ভিটামিন দেওয়ার ঠিক পূর্বেই বেকিং সোডা মিশ্রিত পানি পরিচালনা করতে হবে। প্রতি গ্যালন মজুদ দ্রবণের সাথে এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা দিতে হবে।

৩) লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালনে পানি সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নতুন ব্যাচের ব্যবস্থাপনা :

পুনরায় মুরগি বা বাচ্চা তোলার পূর্বে ঘর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে কীনা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন—

১) সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ/সরবরাহ লাইন পরীক্ষা করতে হবে। মেরামতের প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিক ভাবে করতে হবে।

২) মুরগির খাঁচা, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) পানির পাত্র ও সরবরাহ লাইন প্রয়োজনে মেরামত করতে হবে।

৪) থার্মোমিটার, থার্মোস্ট্যাট, গ্যাস ব্রুডার, স্টোভ ইত্যাদি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

৫) আগের ব্যাচের মুরগির বিষ্ঠাগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে অথবা কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির কাজে লাগাতে হবে।

৬) মুরগির খাঁচা, খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৭) টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্যসমূহ জীবাণুনাশক দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে।

৮) দ্রব্যসমূহ ভালোভাবে শুকানোর পর নতুন বাচ্চা তুলতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুরগির রোগগুলোকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
২. ভাইরাসজনিত দুটি রোগের নাম লেখ ।
৩. ব্যাকটেরিয়া জনিত তিনটি রোগের নাম লেখ ।
৪. সংক্রামক রোগ কী?
৫. অসংক্রামক রোগ কী?
৬. রানীক্ষেত রোগের কারণ কী?
৭. গামবোরো রোগের কারণ কী?
৮. মারেক্স রোগের কারণ কী?
৯. পক্স রোগের কারণ কী?
১০. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ কী?
১১. অন্তঃপরজীবীর নাম কী?
১২. সোলেন হেড ডিজিজ কাকে বলে?
১৩. স্টার গেজিং কাকে বলে।
১৪. র্কাল-টো-প্যারালাইসিস কাকে বলে?
১৫. অ্যাকজুডেটিভ ডায়াথেসিস কাকে বলে?
১৬. কেইজ লেয়ার ফ্যাটিগ কাকে বলে?
১৭. অ্যান্টিবডি কাকে বলে?
১৮. বুস্টার ডোজ কাকে বলে?
১৯. পোষক কাকে বলে?
২০. ছোট গোল কৃমির অপর নাম কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রানীক্ষেত রোগের লক্ষণ লিখ।
২. রানীক্ষেত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. গামবোরো রোগের লক্ষণ লিখ।
৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ লিখ।
৫. ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ লিখ।
৬. সালমোনেলা রোগের লক্ষণ লিখ।
৭. ইনফেকশাস করাইজা রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি লিখ।
৮. নেক্রোটিক এন্টারাইটিস রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি লিখ।
৯. কলিবেসিলোসিস রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি লিখ।
১০. ওস্ফালাইটিস রোগের লক্ষণ লিখ।
১১. কলেরা রোগের লক্ষণ লিখ।
১২. মাইকোপ্লাজমা রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায়?
১৩. ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা লিখ।

২০২০

১৪. আফলা টক্সিকোসিস রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি লিখ।
১৫. উকুন ও আটালি দ্বারা আক্রমনের লক্ষণ লিখ।
১৬. রক্ত আমাশয় রোগ প্রতিরোধের উপায় লিখ।
১৭. রক্ত আমাশয় রোগ দেখা দিলে কী চিকিৎসা দিতে হবে?
১৮. অ্যাসাইটিস রোগের লক্ষণ লিখ।
১৯. ভিটামিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২০. ভিটামিন বি এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২১. ভিটামিন ই এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২২. ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২৩. ভিটামিন সি এর অভাবজনিত লক্ষণ লিখ।
২৪. গোলকৃমি সংক্রমণ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার পদ্ধতি লিখ।
২৫. ফিতাকৃমি সংক্রমণ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার পদ্ধতি লিখ।
২৬. ছোটকৃমি সংক্রমণ, লক্ষণ ও তার প্রতিকার পদ্ধতি লিখ।
২৭. জৈব নিরাপত্তা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রানীক্ষেত রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
২. গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৩. মারেক্স রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৪. পক্স রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৫. মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৬. ইনফেকশাস করাইজা রোগের কারণ,সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৭. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৮. ককসিডিওসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
৯. আফলা টক্সিকোসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণও রোগপ্রতিরোধ,চিকিৎসা বর্ণনা কর।
১০. ওস্ফালাইটিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণও রোগপ্রতিরোধ, চিকিৎসা বর্ণনা কর।
১১. লেয়ারের টিকাদান কর্মসূচি উল্লেখ কর।
১২. জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি এমন রোগ প্রতিরোধে গৃহীত প্রয়োজনীয় জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়
ডিমপাড়া মুরগির ঠোঁট কাটা বা ডিবিকিং

১২.১ কানাবলিজম বা ঠোকরা-ঠুকরি

লেয়ার খামারে ক্যানাবলিজম বা ঠোকরা-ঠুকরি একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এ সমস্যা দেখা দিলে মুরগি একে অপরের চোখ, মাথাডানা, লেজের পালক ও পায়ুতে ঠোকরাতে থাকে। এতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে রক্ত বের হয়। এই বদ অভ্যাসগুলেকেই ক্যানাবলিজম বলে।

ঠোকরা-ঠুকরির কারণ :

১. ঘরে অতিরিক্ত প্রখর আলোর ব্যবস্থা থাকলে।
২. অল্প জায়গায় অনেক বেশি মুরগি থাকলে।
৩. অত্যাধিক গরম ও অপর্যাপ্ত বাতাস চলাচল।
৪. ঘরে ডিম দেওয়ার জায়গা কম থাকলে।
৫. মেঝেতে ডিম পাড়লে।
৬. দেরিতে ঠোঁট কাটলে বা ঠোঁট না কাটলে।
৭. খাদ্যে আঁশ জাতীয় খাদ্যের শতকরা হার কম হলে।
৮. খাদ্যে খনিজ পদার্থ কম হলে।
৯. খাদ্যে আরজিনিন ও মিথিওনিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব হলে।
১০. উকুনের সংক্রমণ হলে।

১২.২ ক্যানাবলিজমের ক্ষতিকর প্রভাব :

ক্যানাবলিজমের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

১) ক্যানাবলিজম আক্রান্ত মুরগি অন্য পালকহীন বা কম পালকযুক্ত অংশে ঠোকরাতে থাকে।
২) অনেক সময় পালকের গোড়া ঠোকরে তুলে তা খেয়ে ফেলে।
৩) ঠোকরানোর ফলে রক্ত বের হয়।
৪) ঠোকরানো স্বভাবের পাখিরা একবার যদি রক্তের স্বাদ পায় তবে আহত পাখিকে অনবরত ঠোকরায় ও রক্তপাত ঘটাতে থাকে।
৫) প্রথমে বেশ কিছু মুরগি আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে পুরো ঝাঁকে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে।
৬) সমস্ত ঝাঁকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে খামার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
৭) ডিমপাড়া মুরগির ডিম দেওয়ার পর মলদ্বার ভিজা ও লাল থাকে, যা অন্য মুরগিকে ঠোরাতে অকর্ষণকরে এবং রক্ত বের হয়।
৮) দেখা যায় যে ঝাঁকে মৃত্যুহারের ৭০% ঠোকরা-ঠুকরির কারণে হতে পারে।
৯) সাধারণত খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতিতেই ঠোকরা-ঠুকরি বেশি দেখা যায়।

চিত্র:১২.১ ঠোকরা-ঠুকরির ক্ষতিকর প্রভাব

১২.৩ ঠোকরা-ঠুকরির প্রতিকার

১. ঘরে সরাসরি যেন সূর্যের আলো না পড়ে সেজন্য বেড়ায় ঝুলন্ত পর্দা রাখতে হবে।
২. মুরগি প্রতি সঠিক পরিমাণ জায়গা দিতে হবে।
৩. বেড়ায় ঝুলানো পর্দার বা চট তুলে ফেলে গরম বের করে দিতে হবে ও ক্রস ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা
৪. করতে হবে
৫. বেশি সংখ্যক বাসা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. যথাস্থানে বাসা রাখতে হবে।
৭. অল্প বয়সেই বাচ্চার ঠোঁট কাটার ব্যাবস্থা করতে হবে।
৮. ডিমপাড়া মুরগির রেশনে ৪% আঁশজাতীয় খাদ্য রাখতে হবে।
৯. রেশনে ০.৫% লবন দিতে হবে।
১০. কুঁড়া, তিলের খৈল,মাছের গুঁড়া বা কৃত্রিম আরজিনিন ও মিথিওনিন রেশনে দিতে হবে।
১১. উকুন মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

১২.৪ ডিবিকিং (ঠোঁটকাটা)

মুরগির ঠোঁট বেশি লম্বা ও সুচালো হলে সহজে খেতে পারে না ও খাদ্য ছিটিয়ে নষ্ট করে। তাই নির্দিষ্ট বয়সে প্রতিটি মুরগির ঠোঁটের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়। মুরগির সুচালো ঠোঁটের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেটে বাদ দেওয়াকেই ডিবিকিং বলে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ঠোঁট কাটা হয় তার নাম ডিবিকার।

চিত্র:১২.২ বিভিন্ন প্রকার ডিবিকার মেশিন

ডিবিকিং-এর সুবিধা :

১) ক্যানাবলিজম প্রতিরোধ করে।
২) খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্ধি পায়।
৩) খাদ্যের অপচয় রোধ করে।
৪) খাদ্য ও ডিম নষ্ট করার প্রবণতা কমে।
৫) মুরগির দৈহিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৬) মুরগি ড়িমপাড়ার দিকে অধিক মনোযোগী হয়।
৭) ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়।

ডিবিকিং-এর বয়স :

- অনেক খামারে একদিনের বাচ্চাদের ঠোঁট কাটানো হয়।
- এছাড়া ৬-১০ দিন বয়সে মুরগির বাচ্চা ডিবিকিং করানো মোটামুটি ভালো। নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁট থেকে কিছুটা কম কাটাতে হবে।
- পুলেটের ক্ষেত্রে ১২-১৬ সপ্তাহের মধ্যে ঠোঁট কাটানো হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রোয়ার হাউজ থেকে লেয়ার হাউজে লেয়ার নেওয়ার আগেই ঠোঁট কাটানো হয়। লেয়ার হাউজে নেওয়ার সময়ও ডিবিকিং করা যায়।
- এ ক্ষেত্রে নাসারন্ধ্র থেকে ৬-৭ মি.মি.সামনে ঠোঁট কাটতে হবে। উপরের ঠোঁটের সামনের দিকের অংশ যেটির রং কিছুটা সাদাটে এবং সুচালো হয় (ঠোঁটের ১/৩ ভাগ অংশ) সেই অংশ কাটতে হয়। নিচের ঠোঁটের একেবারে সামনের সাদাটে অংশও কেটে বাদ দিতে হয়। উভয় ঠোঁট পৃথকভাবে কাটাতে হবে।

সাধারণত ৩টি পদ্ধতিতে ডিবিকিং করা যায় :

ক) বৈদ্যুতিক ঠোঁট কাটা যন্ত্রের সাহায্যে : এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে সহজ, নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে একটি ধারালো ব্লেড লোহিত তপ্ত করা হয়, মুরগির ঠোঁট প্লেটের গর্তে ঢুকিয়ে এই ব্লেড দিয়ে চাপ দিয়ে ঠোঁট কাটা হয়। ব্লেড উওপ্ত থাকার কারণে কাটা অংশের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

- ৬-১০ দিন বয়সে ঠোঁট কাটলে ৮১৫ ডিগ্রি সে. তাপে ব্লেড উত্তপ্ত করা হয় ও ব্লেডের সংস্পর্শে তিন সেকেন্ড রাখা হয়।
- পুলেটের ক্ষেত্রে ৯৬২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ব্লেড উত্তপ্ত করা হয় এবং ঠোঁট কাটার পর কাটা অংশ ব্লেডে ভালোভাবে ঘষে নিলে রক্ত পাত বন্ধ হয়।

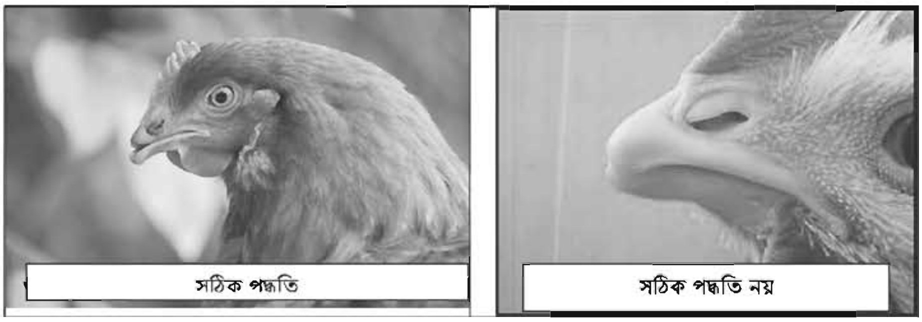

চিত্র:১২.৩ মুরগির ঠোঁট কাটা

২০২০

খ) তপ্ত ছুরির সাহায্যে :
একে বৈদ্যুতিক ডিবিকারের দেশীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। এটি খুব ভালো পদ্ধতি নয়,কারণ ছুরি খুব বেশি তপ্ত করা যায় না এবং দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও বেশি থাকে।

যে সময়গুলোতে ডিবিকিং করা উচিত নয় :

- যখন মুরগির কোনো রোগ হয়।
- পীড়ন/ ধকল দেখা দেয়।
- ভ্যাকসিন প্রদানের ২ (দুই) দিন আগে বা পরে।
- ডিমপাড়া শুরু হলে।
- সালফেট জাতীয় ঔষধ খাওয়ানোর ২ (দুই) দিন আগে বা পরে।

ঠোঁট কাটার সময় সতর্কতা :

- ঠোঁট কাটার ২ (দুই) দিন পূর্ব থেকে পানিতে ভিটামিন কে ব্যবহার করা।
- ঠোঁট কাটার যন্ত্র ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করা।
- ব্লেডের উত্তপ্ত হওয়ার তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।
- মুরগির চোখ যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

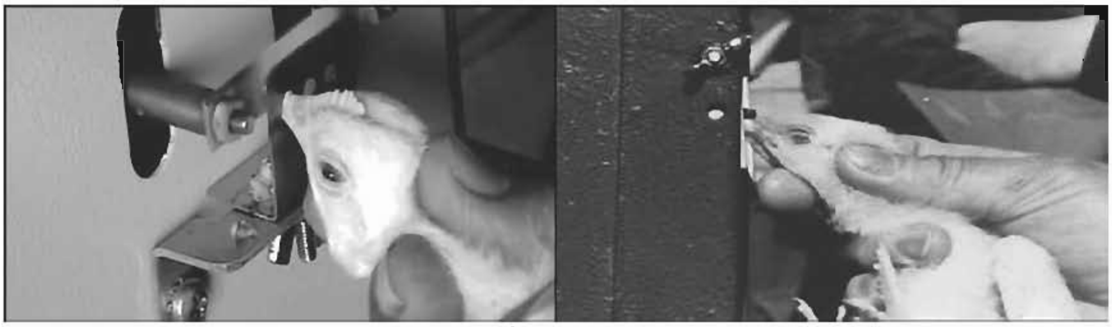

চিত্র ১২.৪ : বৈদ্যুতিক ঠোঁট কাটা যন্ত্রের সাহায্যে ডিবিকিং

- দিনের ঠাণ্ডা সময়ে অর্থাৎ সকালে ঠোঁট কাটা।
- ঠোঁট কাটার পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান করাতে হবে।
- অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে ঠোঁট কাটা।

ডিমপাড়া মুরগির ঠোঁট কাটা (ডিবিকিং) পরবর্তী পরিচর্যা :

- ঠোঁট কাটার ২ (দুই) দিন পূর্ব থেকে পরবর্তী ৩ দিন পানির সাথে ভিটামিন কে-সহ অন্যান্য ভিটামিন ব্যবহার করা
- খাদ্যের সাথে ২ (দুই) দিন পূর্ব থেকে অতিরিক্ত আমিষ ব্যবহার করা।
- পানির পাত্রের গভীরতা বৃদ্ধি করা। ঘরে নিপল ড্রিংকার থাকলে এর পাশাপাশি ট্রাফ ড্রিংকার ব্যবহার করতে হবে
- মাল্টিভিটামিন খাওয়ানো যেতে পারে।
- ১ সপ্তাহের মধ্যে ঘর পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা ঠিক হবে না।

২০২০

প্রশ্নমালা

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ক্যানাবলিজম কী?
২. ডিবিকিং কী ?
৩. ডিবিকার দিয়ে কী করা হয়?
৪. ডিবিকিং কোন বয়সে করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঠোকরা-ঠুকরি বা ক্যানাবলিজমের কারণ কী কী?।
২. ক্যানাবলিজমের ক্ষতিকর প্রভাব কী কী ?
৩. ডিবিকিং-এর সময় কী কী সতকর্তা অবলম্বন করতে হয় ?
৪.ডিবিকিং-এর সুবিধা লিখ।
৫. ঠোকরা-ঠুকরির প্রতিকার লিখ।
৬.ডিমপাড়া মুরগির ঠোঁট কাটা (ডিবিকিং) পরবর্তী পরিচর্যা লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিবিকিং কয়টি পদ্ধতিতে করা হয় এবং পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ডিম উৎপাদন ও সংগ্রহ

১৩.১ লিটার পদ্ধতিতে লেয়ার ঘরে ডিমপাড়া বাক্স স্থাপন

লিটারে ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে ময়লা ডিম ও মেঝেতে পাড়া ডিম সংগ্রহ করা মুরগি পালনের জন্য একটি বড় বাধা। এছাড়া মেঝেতে ডিমপাড়ার কারণে মুরগির ফ্লকে ডিম খাওয়ার অভ্যাস এবং মলদ্বার ঠোকরানো অভ্যাস দেখা দিতে পারে। এর ফলে খামারের প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। যদি ডিমপাড়া মুরগির ঘরে সঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বা সংখ্যায় ডিমপাড়া বাক্স স্থাপন করা যায়, তবে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব।

লিটার পদ্ধতির ক্ষেত্রে :
লিটার পদ্ধতিতে প্রতি ৪-৫টি মুরগির জন্য ১টি ডিমপাড়ার বাক্স বরাদ্দ করতে হবে, যার পরিমাপ হবে ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি ×১৪ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা)। মুরগির ঘরের এক পাশে অন্ধকারযুক্ত স্থানে (কম আলো) যেখানে মুরগির চলাফেরা কম এমন স্থানে ডিমপাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

চিত্র : ১৩.১ মুরগির ঘরে ডিমপাড়ার বাসা

পুলেট মুরগির ডিমপাড়া শুরুর ২ (দুই) সপ্তাহ আগে থেকে ডিমপাড়া বাক্স দিতে হবে, যাতে পুলেটের সাথে বাক্সের পরিচয় ঘটে। বাক্সের মধ্যে শুকনো, নরম ও আরামদায়ক বিছানা তৈরি করতে হবে। বাসার ভেতর ডিম পাড়তে অভ্যস্ত করার জন্য পূর্ব থেকে কোনো সিদ্ধ ডিম বা কৃত্রিম ডিম রাখা যেতে পারে। রাতে বাক্সের দরজা বন্ধ রাখতে হবে ও সকালে দরজা খুলতে হবে।

ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন :
মুরগির ডিমপাড়া শুরুর ৪-৫ সপ্তাহ পূর্বে লিটার ও মাচাতে পালিত মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত পরিমাপের বাসা স্থাপন করতে হবে। ফলে মুরগিগুলো ডিমপাড়া বাসার সাথে পরিচিত হবে।

ডিমপাড়ার সময়ে মুরগিগুলো একটি নিরিবিলি জায়গা খোজে যেখানে সে ঝামেলা ছাড়াই ডিম পাড়তে পারবে। যদি ডিমপাড়া বাসা ঝামেলামুক্ত ও আরামপ্রদ না হয় বা সংখ্যায় অপর্যাপ্ত পরিমাণ ও পরিমাপে সঠিক না হয় তাহলে মুরগিগুলি ঘরের ছায়াযুক্ত কোনায় বা খাবার পাত্র বা পানির পাত্রের নিচে বসে ডিম পাড়ে। মেঝেতে

ডিমপাড়ার সময় অন্য মুরগি তার ডিম্বনালীর শেষ অংশ ঠোকর দিয়ে ডিম্বনালী বের করতে পারে। ডিমপাড়া অবস্থায় মুরগির মাথা বাইরের দিকে থাকবে।

ডিমপাড়ার বাসার আকর্ষণীয়তা :
ডিমপাড়া শুরু করার পূর্বে মুরগির ঘরে ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন করে তাতে খড়ের ছোট ছোট নরম ও মোলায়েম টুকরা দেওয়া উচিত। তাতে মুরগির কাছে বাসাগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। আবার একই সাথে সব বাসায় খড়ের টুকরা দেওয়া উচিত না। এ ছাড়া ডিমপাড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ডিম খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে বা প্লাস্টার ডিম সার্বক্ষণিকভাবে ডিমপাড়ার বাসায় রেখে দেওয়া যেতে পারে।

মেঝেতে ডিমপাড়ার কারণসমূহ :
- সঠিক সময়ে মুরগির ঘরে ডিমপাড়া বাক্স স্থাপন না করলে।
- কম পরিমাণে ডিমপাড়া বাসা স্থাপন করলে।
- ডিমপাড়া বাসার পরিমাপ সঠিক না হলে।
- বাসা ঘরের নির্জণ শান্ত ছায়াযুক্ত স্থানে না হলে।
- বাসা যথেষ্ট গভীর ও আরামপ্রদ না হলে।
- ডিমপাড়ার বাসায় ব্যবহৃত লিটার দ্রব্যের ক্রটি থাকলে।
- ডিমপাড়ার বাসার ধরণ সঠিক না হলে।
- খাদ্য প্রদান সময়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেঝেতে ডিমপাড়ার অভ্যাস কমানো যায়।

ডিমপাড়া বাক্স বা বাসা দুই ধরনের হয়, যথা-

ক) পৃথক বা একক বাক্স :
- ভারী জাতের ক্ষেত্রে ১৪ইঞ্চি×১০ইঞ্চি×১৪ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) এবং হালকা জাতের ক্ষেত্রে ১২ইঞ্চি×১ইঞ্চি২×১৪ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) মাপের ১টি বাক্সেই ৪-৫টি মুরগি ডিমপাড়ার জন্য যথেষ্ট।
- তবে ডিমপাড়া একক বাক্স বহুতল বিশিষ্ট করা যায়, সেক্ষেত্রে বাক্সের সামনে সমান্তরাল সিঁড়ি দিতে হয়।
- একক বাসা পাশাপাশি স্থাপন করা যায়।
- বাসা কাঠ বা আয়রণ শিট দিয়ে তৈরি করা যায়।
- বাসার উপরিভাগে ঢালু থাকে, ফলে মুরগি বসে পায়খানা করে নোংরা করতে পারে না।
- বাসার সামনে মুরগির দাঁড়ানোর প্লাটফরম থাকে। রাতে প্লাটফরম ভাঁজ করে বাসায় ঢোকার রাস্তা বন্ধ করা যায়।
- রাতে বাসার ভেতর মুরগি বসতে পারলে ব্রুডি হতে পারে এবং পায়খানা করে নোংরা করতে পারে।
- ঘরের নির্জন ছায়াযুক্ত, ঠাণ্ডা ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলসম্পন্ন জায়গায় বাসা দিতে হবে। প্রয়োজনে বাসাগুলো সরানো যাবে।

চিত্র : ১৩.২ ডিম পাড়ার বাক্স

খ) দলভিত্তিক বাক্স

- বড় বাণিজ্যিক খামারে এই ধরনের বাক্স ব্যবহৃত হয়। ৫০টি ডিমপাড়া মুরগির জন্য ৬০ ইঞ্চি× ২৪ইঞ্চি × ২৪ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মাপের ১টি দলভিত্তিক বাক্সই যথেষ্ট।
- বাসার ভেতর এককভাবে ডিম পাড়ার জন্য কোনো পার্টিশন থাকে না।
- এই বাসার উভয় প্রান্তে মুরগি ঢোকার পথ থাকে।
- ডিম সংগ্রহের জন্য স্লাইডিং দরজা থাকে।

গ) রোল ওয়ে বাসা :

- মুরগির খাঁচার মেঝের সামনে ঢালু তৈরি করা হয়।
- খাঁচার মেঝের উপর ডিম পাড়লে গড়িয়ে খাচার বাইরে চলে আসে।
- খাঁচার বাইরে ডিম জমা হওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
- যান্ত্রিকভাবে ডিম সংগ্রহের জন্য ২ সারিতে খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- উভয় সারির নিজ দিয়ে কনভেয়র বেল্ট থাকে।
- ডিম গড়িয়ে এই বেল্টের উপর পড়লে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিম সংগ্রহ ঘরে চলে যায়।

১৩.২ খাঁচা থেকে ডিম সংগ্রহ

- খাঁচায় লেয়ার পালন করলে ডিম পাড়ার জন্য আলাদা কোনো বাক্সের প্রয়োজন হয় না।
- মুরগি খাঁচায় মেঝেতেই ডিম পাড়ে। খাঁচার তল বা মেঝে এমনভাবে তৈরি করা থাকে যেন ডিম পাড়ার সাথে সাথেই গড়িয়ে সামনের দিকে চলে আসে।
- ডিম গড়িয়ে আসার পর জমা হওয়ার জন্য খাঁচার সামনের দিকে বাড়তি তলের ধার বা কোনো উপরের দিকে বাঁকা করা থাকে। বাঁকা করা স্থানে এসে ডিম স্থির হয়। মুরগি এই ডিমের নাগাল পায় না।
- লিটার পদ্ধতির মতোই দিনে ২-৩ বার ডিম সংগ্রহ করে ট্রেতে রাখতে হয়।
- এক্ষেত্রে ডিম পরিষ্কার থাকে ।

- ডিম জমা হওয়ার স্থানে নরম প্যাড ব্যবহার করলে ডিমে ফাটল সৃষ্টি হয় না।
- অটোমেটিক বেল্টের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে ডিম সংগ্রহ করা যায়। সেক্ষেত্রে ডিম গড়িয়ে এসে বেল্টের উপর পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর বেল্ট ঘুরতে থাকে এবং ডিম নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয়।

১৩.৩ ডিম উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ

মুরগির ডিম উৎপাদনের সাথে বা ডিম উৎপাদনহ্রাস পাওয়ার সাথে যে বিষয়গুলো জড়িত সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. খাদ্য : খাদ্য উপাদানে পরিবর্তন ঘটলে, যেমন- খাদ্যে গম বা ভুট্টা প্রদান না করলে অথবা নতুন কোনো উপাদান হঠাৎ বেশি দিলে, খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলে যেমন, ম্যাশ খাবারের পরিবর্তে পিলেট খাবার প্রদান করলে, খাদ্য প্রদানের সময় পরিবর্তন করলে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে।

২. খাদ্যমান : খাদ্যের গুণাগুণ ভালো না হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যে সব উপাদান না থাকলে এবং খাদ্যে কোনো দোষ দেখা দিলে আমিষ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির অভাব হলে ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে।

৩. পানি : পর্যাপ্ত পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কোনো কারণে বন্ধ থাকলে ডিম উৎপাদন কমে যায়।

৪. মেঝের জায়গা : ঘরে প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা কম থাকলে, মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে বা গাদাগাদি হলে বা ঠোকরা-ঠুকরি করলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. তাপমাত্রা : অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা মুরগি সহ্য করতে পারে না। ঘরের তাপমাত্রা ৫০° ফা. এর কম বা ৮০° ফা. এর বেশি হলে ডিম উৎপাদন হঠাৎ কমে যেতে পারে বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুরগি সাধারণত ৭০° ফা. তাপমাত্রায় কাম্য হারে ডিম পাড়ে।

৬. উত্তেজনা ও ভয় : মুরগি হঠাৎ স্থান পরিবর্তন করলে, এক ফার্ম থেকে অন্য ফার্মে নিলে, এমনকি এক ফার্মের অভ্যন্তরে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিলে, নতুন কোনো অতিথি দর্শনার্থী বা একসঙ্গে বেশি লোক, বন্য জীব জন্তু বা যানবাহন, অস্বাভাবিক শব্দ ইত্যাদি থেকে আতঙ্কিত হয় বা ভয় পায়। ফলে ডিম উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৭. কুঁচেভাব ও পালক বদলানো : মুরগির মধ্যে কুঁচে ভাব দেখা দিলে বা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পালক বদলালে উৎপাদন কমে যায়। পালক বদলানোর শুরুতে পালক বদলানো বন্ধ করার জন্য উচ্চ আমিষ যুক্ত খাদ্য প্রদান করতে হবে।

৮. রোগ-ব্যাধি : মুরগির ঝাঁকে কোনো রোগব্যাধি দেখা দিলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায়। মুরগির মধ্যে কৃমি থাকলে এবং উকুন ,মাইট ও টিকের আক্রমণ হলে এদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং উৎপাদন কমে যায়। ককসিডিওসিস, রানীক্ষেত, ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস, এগড্রপ সিনড্রম ইত্যাদি রোগ হলে ডিমের সংখ্যা কমে যায়।

৯. বংশগত দোষ : বংশগতভাবে কোনো কোনো মুরগির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দোষত্রুটি থাকতে পারে। ২০২০

যেমন- কিছু মুরগি ২-৩ দিন পর পর ডিম দেয়। আবার কিছু মুরগি আছে দীর্ঘদিন পর পর ডিম দেয়।

১০. আলো নিয়ন্ত্রণ : ডিমপাড়া মুরগির ঘরে ১৬ ঘন্টা আলো প্রদানের পরিবর্তে কম আলো প্রদান করলে ডিম উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

১১. মুরগির বয়স : সাধারণত ১৯-২০ সপ্তাহ বয়সে মুরগি ডিম দিতে শুরু করে এবং ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত একটানা গড়ে ৭৫-৮৫% ডিম দিয়ে থাকে।

১২. ঋতু পরিবর্তন : শীতকাল খামার মালিকদের জন্য অধিক লাভের জন্য উপযুক্ত সময়। গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে মুরগি অধিক ডিম দিয়ে থাকে।

১৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো মেনে না চললে বা সার্বিক পরিচ্ছন্নতার অভাব ঘটলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

১৪. ডিম পাড়া বাক্স : ডিমপাড়া বাক্স যদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় না থাকে তবে মুরগির ডিম উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে এবং মেঝেতে ডিমপাড়ার হার বেড়ে যাবে।

১৫. খাবারের পরিমাণ : খাবারের পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে ফ্যাটি লিভার সিনড্রম দেখা যায়। ফলে ডিমের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে কমে যায়। খাবারের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলেও ডিমের সংখ্যা কমে যাবে। খাবারের পরিমাণ সঠিকভাবে দিলে এবং প্রোটিনের ভাগ যদি ঠিক থাকে তাহলে ডিমের সংখ্যা আবার বেড়ে যাবে।

১৬. মুরগির দেহে হরমোনের অভাব হলে ডিম উৎপাদন কমে যায়।

১৩.৪ ডিমের অস্বাভাবিকতা :

মুরগির ডিম সব সময় একই আকার আকৃতির হয় না। ভিতর ও বাইরের গঠনে কিছু পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। যেমন–

(১) দ্বিকুসুম ডিম : একটি ডিমের মধ্যে ২টি কুসুম থাকে, ফলে ডিমটি আকারে অনেকটা বড় হয়। এই ডিম ফুটানো যায় না।

(২) রক্ত ছিটা ডিম : ডিম্বাশয় বা ডিম্বনালিতে রক্তক্ষরণের ফলে ডিমের মধ্যে বিভিন্ন অংশে অনেক সময় কিছুটা জমাট রক্ত দেখা যায়। এ ডিম খেলে ক্ষতি নেই।

চিত্র : ১৩.৩ রক্ত ছিটা ডিম

(৩) চাম ডিম/খোসাবিহীন ডিমঃ

খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব বা ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত সঠিক না থাকলে পর্দার মতো পাতলা খোসাযুক্ত ডিম হতে পারে। এছাড়া প্রথমদিকে পাড়া ডিম বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পাড়া ডিমের খোসা পাতলা হতে পারে।

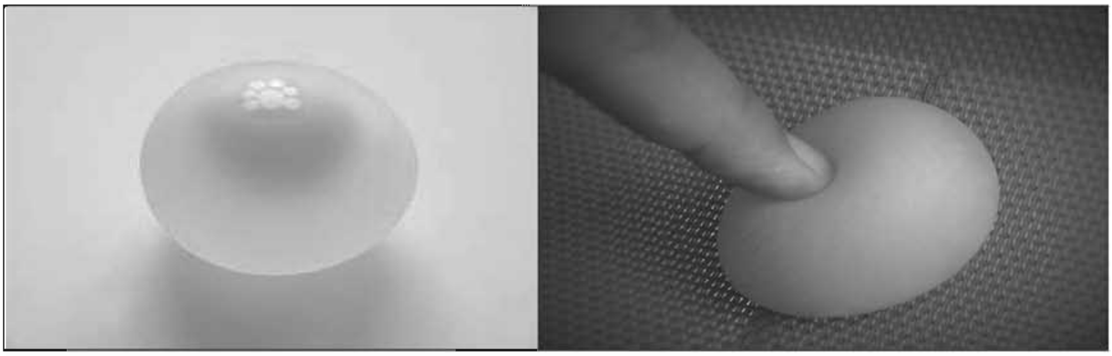

চিত্র : ১৩.৪ চাম ডিম

(৪) কুসুমবিহীন ছোট ডিম :

শরীরের কোনো পদার্থ বা জমাট রক্ত যদি কোনো কারণে ডিম্বনালির ভিতর প্রবেশ করে এবং এটি যদি কুসুমের মতোই ডিম্বনালির বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে চলে আসে, তাহলে ঐ পদার্থটি ঘিরে ডিমের অন্য সব অংশ তৈরি হবে। কুসুমবিহীন এরূপ ডিমে কুসুমের পরিবর্তে অন্য জিনিস দেখা যায় এবং ডিমটি আকারেও কিছুটা ছোট হয়।

(৫) ডিমের ভেতর ডিম :

যদি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম কোনো কারণে ডিম্বনালিতে শেষ প্রান্ত থেকে পুনরায় প্রথম প্রান্তে যায় এবং আগের মতো শেষ প্রান্তে নামতে থাকে, তবে ঐ ডিমের উপর ডিম্বনালি থেকে ডিমের সাদা অংশ, খোসা ইত্যাদি সৃষ্টি হবে। ফলে ডিমের মধ্যে ডিম দেখা দেবে।

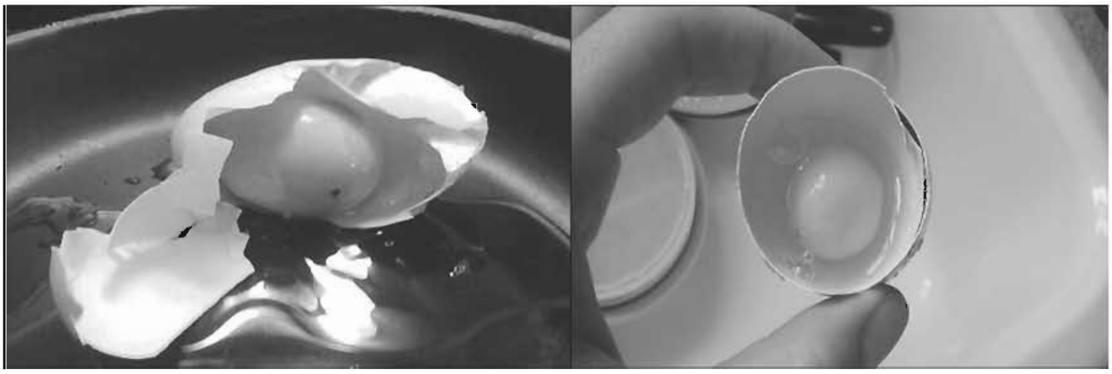

চিত্র : ১৩.৫ ডিমের ভেতর ডিম ও শ্বেত কুসুম ডিম

(৬) শ্বেত কুসুম ডিম :

মুরগির রক্তশূন্যতা বা রক্তস্বল্পতা বা মুরগি রোগাক্রান্ত হলে ডিমের কুসুম হলদে না হয়ে সাদা হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খাদ্যে হলুদ রং সৃষ্টিকারী খাদ্যোপদানের অভাব হলে ডিমের রং সাদা হয়।

১৩.৫ খামার থেকে দৈনিক ডিম সংগ্রহ

- শীতের সময় সকাল ১০-১১ টা ও বিকাল ৪.০০-৪.৩০টার সময় ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
- গরমের সময় সকাল-বিকেল ছাড়াও দুপুরে আরও একবার ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
- ডিম সংগ্রহের সময় বাক্সে ১টি ডিম রাখতে হয়।
- সন্ধ্যাবেলা বাসায় কোনো ডিম না রেখে সকালে বাসার দরজা খোলার সময় একটি করে ডিম রাখা যায়।
- ডিম পাড়ার প্রাথমিক অবস্থায় মুরগিগুলো মেঝেতে ডিম পাড়লে তা প্রতি ১ ঘণ্টা পর পর সংগ্রহ করতে হবে এবং ঐ মুরগিগুলোকে চিহ্নিত করে ডিম পাড়ার বাক্সে তুলে দিয়ে বাক্সে ডিম পাড়ার অভ্যাস করাতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লিটার পদ্ধতিতে লেয়ার ঘরে একক ডিম পাড়া বাক্সের পরিমাপ কত?
২. ডিম পাড়া বাসা স্থাপনের কৌশল কী?
৩. অস্বাভাবিক ডিম কত প্রকার?
৪. ডিম পাড়ার শুরুর কত দিন আগে ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করতে হবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মেঝেতে ডিম পাড়ার কারণসমূহ কী কী ?
২. ডিম পাড়া বাক্স কত প্রকার ও কী কী ?
৩. একক বাক্সের বৈশিষ্ট উল্লেখ কর।
৪. শীতকালে ডিম সংগ্রহের সময় লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাঁচা থেকে ডিম সংগ্রহের কৌশল আলোচনা কর।
২. ডিম উৎপাদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ কী কী, আলোচনা কর।
৩. বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক ডিমের বর্ণনা কর।
৪. খামার থেকে দৈনিক ডিম সংগ্রহের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়
ডিম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

১৪.১ ডিম সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

ডিম সংরক্ষণ করার বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষত গ্রীষ্মকালে ডিম নষ্ট হওয়া বা পচে যাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি। এ মৌসুমে বিশেষত মুরগির ডিম অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ডিম সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ ও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

দেশীয় প্রথায় ডিম সংরক্ষণ :
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ মানুষরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ করে থাকে। যথা-

১) মাটির বাড়িতে ডিম সংরক্ষণ:-

প্রথমে মাটির হাঁড়ির মধ্যে ডিম রাখা হয়। পরে হাঁড়ির অর্ধাংশ ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এভাবে সংরক্ষিত ডিমের মেয়াদ স্বল্পমেয়াদি বিধায় এটি তেমন কার্যকর পদ্ধতি নয়। ঠাণ্ডায় সহজ পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ঘরের কাঁচা মেঝেতে একটি গর্ত করা হয়।ঐ গর্তের মধ্যে বসানো হয় একটি মাটির হাঁড়ি। হাঁড়ির চারপাশে কাঠ কয়লা দিয়ে ভরাট করা হয়। প্রতিদিন কয়েকবার পানি দিয়ে কাঠ কয়লা ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এতে হাঁড়ির মধ্যভাগ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঐ হাঁড়ির মধ্যে ডিম রেখে মাটির সরা বা ঢাকনা দিয়ে হাঁড়িটি ঢেকে দেওয়া হয়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম বেশ কিছুদিন ভালোভাবে টিকে থাকে। ফলে এটিকে ডিম সংরক্ষণের একটি মোটামুটি লাগসই প্রযুক্তি বলা যায়।

২) সিদ্ধ করে ডিম সংরক্ষণ

৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানির মধ্যে ১৫ মিনিট ধরে ডিম সিদ্ধ করলে তা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য রাখা যায়। গ্রামের হাট, ফেরিঘাট, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন প্রভৃতি জনবহুল স্থানে ফেরি করে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করা হয়। ১০০ টি সিদ্ধ ডিম একই দিনে বিক্রি না হলে তা পরদিন এবং প্রয়োজনবোধে আরও একদিন পর্যন্ত রেখেও বিক্রি করা হয়। এভাবে সিদ্ধ করার পর অন্তত ২ দিন পর্যন্ত ডিম ভালো থাকে।

৩) ডিমের খোসার ছিদ্র বন্ধ করে ডিম সংরক্ষণ

ডিমের খোসা বা উপরিভাগের আবরণে থাকে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। বাইরের গরম বাতাস এসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা বের হয়ে আসে জলীয় বাষ্প আকারে। এসব ছিদ্র দিয়ে নানা ধরনের অণুজীব প্রবেশ করে ডিমকে পচিয়ে দেয় বা নষ্ট করে। এসব সূক্ষ্ম ছিদ্র খালি চোখে দৃশ্যমান নয়। তবে ডিমের এসব ছিদ্র যদি বন্ধ করা যায় তবে ডিমের ভেতরের গুনাগুণ অপরিবর্তিত থাকে।

(ক) সরিষার তেল ব্যবহার :

ডিমকে ১ মিনিট খাঁটি সরিষার তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে ডিমের খোসার গায়ের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তেলে ডোবানো ডিম তুলে স্বতন্ত্র পাত্রে রেখে দিতে হয়। এভাবে রাখা ডিম বেশ কিছুদিন ভালো থাকলেও খাওয়ার সময় ডিমে সরিষার তেলের ঝাঁজ পাওয়া যেতে পারে।

(খ) মিনারেল তেল ব্যবহার :
বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন মিনারেল তেলের মধ্যে ডিম ডুবিয়ে পরে তুলে তা শুকিয়ে রাখতে হয়। এভাবে তেলে ডুবিয়ে পরে শুকানোর ফলে ডিমের মধ্যকার জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হতে পারে না। এভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনারেল তেল নিতে হয়। একটি তারের জালের খাচার মধ্যে ভরে নিয়ে খাঁচাটিসহ মিনারেল তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর খাঁচাসহ তুলে নিতে হয়।

আজকাল আধুনিক পন্থায় ডিমের উপরে মিনারেল তেল উত্তমরূপে স্প্রে করা হয়। তারপর ঐ ডিম প্যাকেট বন্ধ করা হয়। এভাবে ডিম সংরক্ষিত থাকলেও ব্যবহৃত মিনারেল তেলে যদি কেনো গন্ধ বা স্বাদ থাকে তবে তা ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে।

(গ) চুনের পানি ব্যবহার :
কোথাও কোথাও চুনের পানির মধ্যে ডিম ডুবিয়ে রেখে পরে তা সংরক্ষণ করা হয়। চুনের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে ডিমের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে।

ডিম সংরক্ষণের জন্য প্রথমে একটি পাত্রে ১ লিটার পানি নিতে হয়। পানিতে ১০০ গ্রাম লবণ ভালোভাবে গুলে তারপর গরম করতে হয়। লবণ মেশানো পানি চুলা থেকে নামিয়ে রাখতে হয়। ঐ পানি ঠান্ডা হওয়ার পর তার মধ্যে ২৫০ গ্রাম চুন উত্তমরূপে গুলে নিতে হয়। পাত্রটি ১ দিন রেখে দিতে হয়। পাত্রের নিচে তলানি জমে। ওপরের পরিষ্কার পানি আরেকটি পাত্রে এমনভাবে ঢেলে নিতে হয় যাতে নিচের তলানি নড়ে না যায়। ঐ পরিষ্কার পানির মধ্যে তারের খাঁচাসহ ডিম ডুবিয়ে দিতে হয়। খাঁচাসহ ডিম তুলে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে দিলে ডিম শুকিয়ে যায়। ডিম সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সহজ ও উত্তম পদ্ধতি।

(ঘ) সোডিয়াম সিলিকেটের সাহায্যে :
এ পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের জন্য প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে তা গরম করে পরে আবার ঠাণ্ডা করতে হয়। পানি ঠাণ্ডা হলে ৯:১ অনুপাতে ঠাণ্ডা পানি ও সোডিয়াম সিলিকেট একত্রে মেশাতে হয়। তারের খাঁচাসহ ডিম ঐ সিলিকেট পানির মধ্যে ২০ মিনিট কাল ডুবিয়ে রাখতে হয়। এরপর খাঁচা তুলে নিয়ে ছায়ায় রাখলে ডিম শুকিয়ে যায়। ডিমের গায়ে সিলিকেট পানি শুকিয়ে গেলে ডিমের গায়ের সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে। শুকানোর পর ডিম প্যাকেটবন্ধি করে কোনো ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হয়। তবে ডিমের সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করে সংরক্ষণ করার ফলে এসব ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো যায় না।

ডিম সংরক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ তথ্য :
ডিম যদি ফেটে যায় বা ডিমের গায়ে যদি ময়লা থাকে তবে তা সংরক্ষণ করা যায় না। ডিমের খোসার গায়ে লেগে থাকা ময়লা নরম ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করতে হয়। সামান্য কুসুম গরম পানিতে তুলা, স্পঞ্জ বা কাপড়ের টুকরা ভিজিয়ে তা দিয়ে ডিমের গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা যায়।

কোনো অবস্থাতেই ডিম পরিষ্কার করার জন্য ঠাণ্ডা পানি বা কোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না। রসুন, পেঁয়াজ বা গন্ধযুক্ত অন্য কোনো দ্রব্যের পাশে ডিম রাখা অনুচিত। কারণ গন্ধ খুব সহজেই এবং দ্রুত ডিমের মধ্যে শোষিত হয়।

২০২০

উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ :

১) হিমাগার সংরক্ষণ :

বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম হিমাগারে ১ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে তাপমাত্রা রাখা হয় ১২° সেলসিয়াস। খাবার ডিম সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রাখতে হয় যথাক্রমে ০-৩° সেলসিয়াস ও ৬০% আলোক্ষিত আর্দ্রতা।

২) গভীর হিমায়িত ডিম :

এ পদ্ধতিতে ডিম ভেঙে ভেতরের কুসুম ও সাদা অংশ শূণ্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়েও কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বেকারি, কনফেকশনারি এবং ন্যুডলস্ তৈরির কারখানায় ব্যবহারের জন্য এভাবে ডিম সংরক্ষণ করা হয়।

৩) শুকনো ডিম :

ডিম শুকানোর পদ্ধতিসমূহ :

(ক) ডিম ভেঙে ভেতরের তরল কুসুম ও সাদা অংশ 'ক্লারিফায়ার' যন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয়।

(খ) ছাঁকনির সাহায্যে ডিমের চ্যালাজা এবং ভাইটিলিন পর্দাসমূহ আলাদা করে ফেলা হয়।

(গ) তারপর ৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উষ্ণ বাতাস ডিমের জলীয় অংশ শোষণ করে নেয় এবং ডিম গুঁড়া গুঁড়া পাউডার হয়ে যায়।

এভাবে শুকানো পাউডারকৃত গুঁড়া ডিম অবিলম্বে প্যাকেটবন্দি ও সিলমোহর করতে হয়। বাতাসে কিছুক্ষণ থাকলে ও ডিম বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। অনেক সময় ডিমের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্যাকেটে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হলে তা ডিমের মধ্যে অণুজীবের প্রবেশ এবং বংশ বিস্তার রোধ করে। প্যাকেটজাত গুঁড়ায় ২% এর অধিক আর্দ্রতা থাকা অনুচিত।

১৪.২ ডিম প্যাকেজিং পদ্ধতি:

ডিমের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য ডিমের যথাযথ প্যাকেজিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিম পরিবহনের ক্ষেত্রেও যেমন প্যাকেজিং দরকার, আবার ডিম বিপণনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংখ্যক ডিম প্যাকেট করা হয়ে থাকে।

ডিম পরিবহনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের এগ ট্রে তে ডিম সাজিয়ে ডিমের ক্রেটে ভরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। বাঁশের ঝুড়িতে প্যাক করেও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের আড়তে ডিম আনা হয়।

যদি বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যায় সুপার মার্কেটগুলোতে মোটা কাগজের বা প্লাস্টিকের ট্রেতে ১২টা বা ৬টা ডিম পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে বিক্রি করা হয়। অনেক সময় পলিথিনের পরিবর্তে কাগজের প্যাকেটের মধ্যে কাগজের ট্রেতে ডিম বসিয়ে বিক্রি করা হয়। তবে খুচরা দোকান থেকে ডিম কিনতে গেলে কাগজের প্যাকেট বা পলিথিনের ব্যাগে ভরে ডিম সরবরাহ করা হয়।

১৪.৩ ডিমের পরিবহন :

দূরের বড় বাজারে ডিম পাঠাতে হলে যত্ন ও সতর্কতার সাথে প্রেরণ করতে হবে। না হলে ডিমে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে ডিম পরিবহন করে নিয়ে আসা হয়। ৩ টি পদ্ধতিতে সাধারণত ডিম পরিবহন করা হয়। যথা :-

২০২০

ক) বাঁশের ঝুড়িতে ডিম পরিবহন :
এ পদ্ধতিতে তলা চ্যাপ্টা বাঁশের ঝুড়িতে ডিম পরিবহন করা হয়। ঝুড়ির তলাতে ২ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছিয়ে তার উপর তুস বা কাঠের গুঁড়া বিছিয়ে ডিম সাজাতে হয়। এর উপর আবার তুস বিছিয়ে পুনরায় ডিম বসানো হয় এভাবে কয়েক স্তরে ডিম সাজানো যায়। সর্ব উপরে খড়ের টুকরা দিয়ে মুখ চট দিয়ে সেলাই করতে হয়।

খ) প্লাস্টিকের ট্রেতে ডিম পরিবহন :
বর্তমানে প্লাস্টিকের তৈরি ট্রেতে নিরাপদে ডিম বসিয়ে পরিবহন করা হচ্ছে। ১টি ট্রেতে ৩০টি ডিম বাসানো যায়। ২০টি ট্রে আবার ১টি ডিমের ক্রেটে ভরা যায়। এভাবে ক্রেট ভর্তি ডিম সহজেই রিকশা ভ্যানে, পিক আপে, ট্রাকে, বাসে, ট্রেনে, নৌকায়, এমনিক সাইকেলে করেও পরিবহন করা যায়। এতে ডিম রাখার জন্য পৃথক খোপ থাকে বিধায় ডিমগুলি পরস্পর ঠোকাঠুকি খায় না।

গ) কাঠের বাক্সে ডিম পরিবহন :
হালকা ও কম দামি কাঠ দিয়ে বাক্স তৈরি করে ডিম পরিবহ করা যায়। বাক্সের তলায় খড়ের টুকরো বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কাঠের গুঁড়া বা তুষ বিছিয়ে স্তরে স্তরে ডিম সাজাতে হবে। এরপর বাক্সের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে ডিম শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাক্সের গায়ে "সাবধান, ডিম আছে" কথাটি লিখে দেওয়া ভালো।

১৪.৪ ডিম বাজারজাতকরণ :
দেশে অধিকাংশ ডিম গ্রামের কৃষকের বাড়িতে উৎপাদন হয়। কৃষক সাধারণত সাপ্তাহিক হাটে বা বাজারে বিক্রি করে। আবার ফেরিওয়ালা সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং হাট থেকে ডিম সংগ্রহ করে পাইকারদের নিকট বিক্রি করে। পাইকার খুচরা বিক্রেতা (স্থানীয়ভাবে) অথবা বড় শহরের আড়তদারের নিকট ডিম বিক্রি করে।

তবে মাঝারি ও বড় খামারিদের নিকট থেকে ভোক্তা পর্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে ডিম পৌছায় :

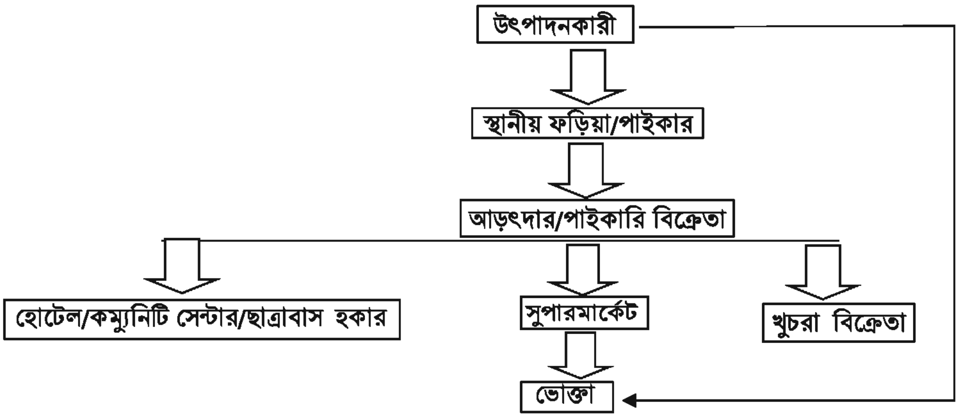

চিত্র ১৪.১ ডিম বাজারজাতকরণের চ্যানেল

তবে ডিম বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী অনুপস্থিত থাকলে উৎপাদানকারীরা ন্যায্যমূল্য পাবে ও ভোক্তা সঠিক মূল্যে ডিম ক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সমবায় সমিতির ধারণা চালু করলে খামারীরা উপকৃত হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশীয় প্রথায় ডিম সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো কী কী?
২. ডিমের খোসার ছিদ্র বন্ধ করে সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি গুলো কী কী?
৩. উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো কী কী?
৪. কত তাপমাত্রায় গরম পানির মধ্যে ১৫ মিনিট ধরে ডিম সিদ্ধ করতে হয়।
৫. সিদ্ধ করে ডিম সংরক্ষণের তাপমাত্রা কত?
৬. ডিম সংরক্ষণের হিমাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ডিম বাজারজাতকরণের বর্তমান চ্যানেল সম্পর্কে ডায়াগ্রাম আলোচনা কর।
২. বাঁশের ঝুড়িতে ডিম পরিবহন পদ্ধতি লিখ।
৩. প্লাস্টিকের ট্রেতে ডিম পরিবহন পদ্ধতি লিখ।
৪. ডিমের কয়েকটি ব্যবহার লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিম প্যাকেজিং পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।
২. ডিম পরিবহনের পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।
৩. শুকানো পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ ব্যাবস্থা লিখ।

২০২০

জব নং-০১

লেয়ার হাইব্রিড মুরগি শনাক্ত করণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

বাণিজ্যিকভাবে ডিম উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পোল্ট্রি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দুটি উচ্চ ফলনশীল ডিম উৎপাদনকারী জাতের মুরগির লাইনের মধ্যে দিয়ে মিলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক লেয়ার হাইব্রিড মুরগি সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করা হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১. বাণিজ্যিক লেয়ার হাইব্রিড মুরগি শনাক্ত করতে পারবে।
২, বাণিজ্যিক লেয়ার হাইব্রিড মুরগি উৎপাদন বৈশিষ্ট্য জানতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) প্রাপ্ত বয়স্ক একাধিক লেয়ার হাইব্রিড মুরগি
২) মুরগি রাখার দুটি খাঁচা।
৩) অ্যাপ্রণ ও দস্তানা।
৪) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১. এক বা একাধিক উৎপাদকের লেয়ার হাইব্রিড সংগ্রহ কর ।
২. অ্যাপ্রন ও দস্তানা পরে নাও।
৩. পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লেয়ার হাইব্রিড মুরগিগুলো ধরে নিয়ন্ত্রণে নাও ।
৪. বিভিন্ন ধরনের লেয়ার হাইব্রিড মুরগিসমূহকে পাশাপাশি রেখে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে
৫. লেয়ার হাইব্রিড মুরগির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

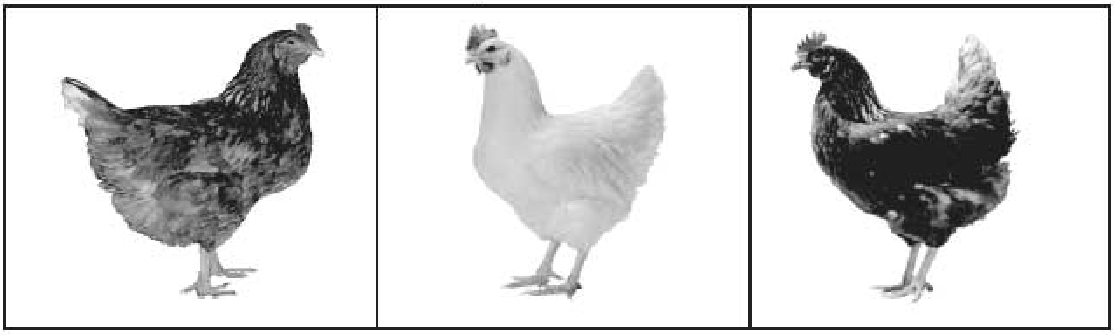

চিত্র : ১.১ হাই সেক্স ব্রাউন হাই লাইন হাই সেক্স ব্রাউন

ক) সাধারণত খাবার ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
খ) এরা কখনো কুঁচে হয় না, ফলে ডিমে তা দেয় না।
গ) বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ২৮০-৩০০টি।
ঘ) ডিম পাড়া শুরুর গড় বয়স ১৮-২০ সপ্তাহ।

২০২০

ঙ) ডিমের গড় ওজন সাদা ৫৮-গ্রাম, বাদামি-৬২ গ্রাম।
চ) সাধারণত বাদামি রঙের মুরগি বাদামি খোসার ও সাদা রঙের মুরগি সাদা খোসার ডিম দেয়।
ছ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, শুধু খামারে নিবিড়ভাবে পালন করতে হয়।
জ) প্রাকৃতিক খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না।
ঝ) দৈহিক আকৃতি মাঝারি, সর্বদা সজাগ, বাদামি মুরগি তুলনামূলকভাবে বড়।

বাংলাদেশে সাধারণত নিম্নলিখিত লেয়ার হাইব্রিড মুরগিসমূহ বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হয়।

জাতের নাম	ডিম উৎপাদন/বছর (টি)	ডিমের খোসার রং
ইসা ব্রাউন	২৭০-২৮০	বাদামি
হাইসেক্স লেয়ার সাদা	২৭০-২৮৫	সাদা
হাইলাইন লেয়ার	২৭০-২৯০	বাদামি
স্টার ক্রস ব্রাউন লেয়ার	২৭০-২৯০	বাদামি
বিভি-৩০০	২৮০-৩০০	বাদামি
লোহমেন	২৭০-২৮০	বাদামি
বোভানস লেয়ার	২৮০-৩১০	বাদামি
ব্রাউন নিক	২৮০-৩১০	বাদামি
নিক চিক	২৭০-২৮০	বাদামি
বোভানস ব্রাউন	২৭২-২৮২	বাদামি

সাবধানতা

১) সাবধানে মুরগিগুলো ধরো যেন আহত না হয়।
২) লেয়ার হাইব্রিডের উৎপাদন বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জেনে নাও।

প্রশ্ন : ১. লেয়ার হাইব্রিডের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
২. লোহমেন হাইব্রিডের উৎপাদন বৈশিষ্ট্য লিখ।

জব নং-০২
লেয়ার মুরগি বাছাইকরন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

লেয়ার মুরগির পৃথকীকরণ পোল্ট্রি খামারীদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগির বিভিন্ন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তুলনা পূর্বক পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। দুইটি মুরগি পাশাপাশি রেখে বৈশিষ্ট্য গুলি তুলনা করে লেয়ার মুরগি পৃথক করা হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১) ছাত্র-ছাত্রীরা লেয়ার মুরগি শনাক্ত করতে পারবে।
২) ননলেয়ার ও লেয়ার মুরগির পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগি
২) মুরগির খাঁচা

কাজের ধারা :

১) প্রথমে দুটি মুরগি পাশাপাশি খাঁচায় রাখ।
২) ননলেয়ার ও লেয়ার মুরগির নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে পার্থক্য পর্যবেক্ষণ কর।

চিত্র:২.১ লেয়ার মুরগির ক্লোয়েকা

চিত্র: ২.২ ননলেয়ার মুরগির ক্লোয়েকা

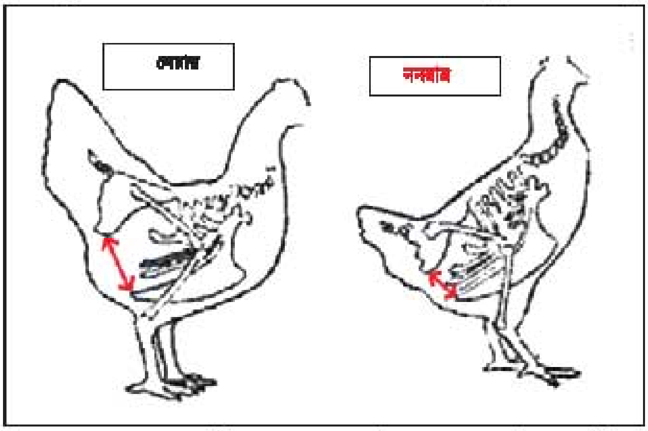

চিত্র ২.৩ : লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগি

বৈশিষ্ট্য	লেয়ার মুরগি
মাথার ঝুঁটি	উজ্জ্বল লাল দেখাবে
কানের লতি	উজ্জ্বল লাল দেখাবে
চোখ	লাল দেখাব
পালক	উজ্জ্বল লাল দেখাবে
পায়ুপথ	বড় এবং ভেজা ভেজা হবে
পিউবিক বোন	দুটি পিউবিক বোনের মাঝে ফাঁক বেশি হবে।

সতর্কতা :

১) মুরগি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কর যাতে পরীক্ষণ করলে ছোটাছুটি না করে এবং আহত করতে না পারে।
২) শরীর থেকে দূরে ধরতে হবে যেন গায়ে বিষ্ঠা না লাগে।
৩) তুলনাকারী বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রশ্ন :

১) পিউবিক বোন কয়টি ও কোথায় থাকে?
২) লেয়ার মুরগি কী?
৩) চোখ দেখে কীভাবে লেয়ার মুরগি চিনবে?

জব নং-০৩
নন-লেয়ার মুরগি বাছাইকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ননলেয়ার মুরগির পৃথকীকরণ পোল্ট্রি খামারীদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে মুরগির বিভিন্ন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ পূর্বক তুলনা করে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। দুইটি মুরগি পাশাপাশি রেখে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনা করে লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগি পৃথক করা হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১. ছাত্র-ছাত্রীরা ননলেয়ার মুরগি শনাক্ত করতে পারবে।
২. লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগির পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগি
২. মুরগির খাঁচা

কাজের ধারা :

১. প্রথমে দুটি লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগি পাশাপাশি খাঁচায় রাখ।
২. লেয়ার ননলেয়ার মুরগির নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে পার্থক্য করো।

চিত্রঃ৩.১ লেয়ার মুরগির ক্লোয়েকা

ননলেয়ার মুরগির ক্লোয়েকা

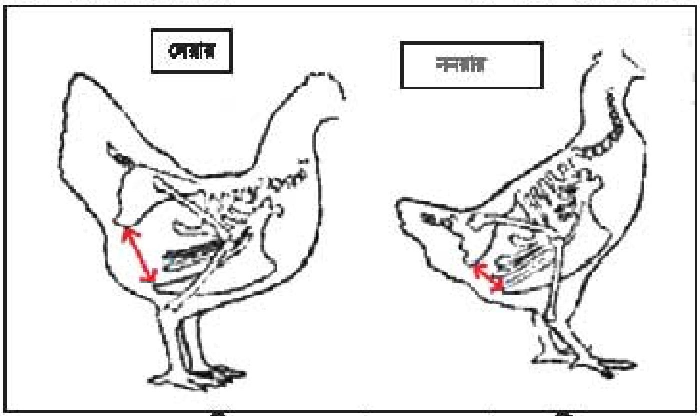

চিত্রঃ ৩.২ লেয়ার ও ননলেয়ার মুরগি

বৈশিষ্ট্য	নন লেয়ার মুরগি
মাথার ঝুঁটি	তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল দেখাবে
কানের লতি	অনুজ্জ্বল দেখাবে
চোখ	ঘোলাটে দেখাবে
পালক	অনুজ্জ্বল দেখাবে
পায়ুপথ	ছোট এবং শুষ্ক হবে
পিউবিক বোন	পিউবিক বোনের মাঝে ফাঁক কম হবে

সতর্কতা :

৪) মুরগি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করো যাতে পরীক্ষণ করলে ছোটাছুটি না করে এবং আহত করতে না পারে।

৫) শরীর থেকে দূরে ধরতে হবে যেন গায়ে বিষ্ঠা না লাগে।

৬) তুলনাকারী বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রশ্ন :

১. ননলেয়ার মুরগির বৈশিষ্ট্য লিখ।

২. পালক দেখে কীভাবে নন-লেয়ার মুরগি চিনবে?

জব নং-০৪

জবের নাম : অধিক ও কম উৎপাদনশীল মুরগির পার্থক্য

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

লাভজনক খামার পরিকল্পনার জন্য কম উৎপাদনশীল মুরগি বাছাই করে ছাঁটাই করা এবং অধিক উৎপাদনশীল মুরগি নির্বাচন করে পুন : স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুরগিকে মূল্যায়ন করে অধিক ও কম উৎপাদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) অধিক উৎপাদনশীল মুরগি নির্বাচন করতে পারবে।
২) কম উৎপাদনশীল মুরগি বাছাই ও ছাঁটাই করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

৩) একই বয়সের অধিক ও কম উৎপাদনশীল মুরগি
৪) মুরগির খাঁচা
৫) অ্যাপ্রণ ও দস্তানা
৬) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১) অধিক ও কম উৎপাদনশীল মুরগি সংগ্রহ কর।
২) অ্যাপ্রণ ও দস্তানা পড়ে নাও।
৩) একটি মুরগি ধরে নিয়ন্ত্রন করে নিম্নে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাচাই কর।

যাচাইকারী বৈশিষ্ট্য	অধিক উৎপাদনশীল	কম উৎপাদনশীল
১) দেহের আকার	১) দেহ ত্রিকোণ করে	১) দেহ মাংসযুক্ত ও ভারী
২) দৈহিক ওজন	২ দেহ তুলনামূলক ভারী	২ দেহ তুলনানুলক ভারী
৩) পালক	৩) দেহের সাথে আট সাট ভাবে লেগে থাক এবং উজ্জল	৩) দেহের পালক অগোছালো এবং অনুজ্জল
৪) কুঁচে হওয়ার স্বভাব	৪) মোটেই কুঁচে হয় না	৪) ঘন ঘন কুঁচে হয়
৫) পায়ের নলার পালক	৫) পালকবিহীন	৫) পালক যুক্ত হতে পারে
৬) মাথার ঝুঁটি	৬) উজ্জল	৬) অনুজ্জল

চিত্র : ৪.১ অধিক উৎপাদনশীল মুরগির ঝুঁটি (উজ্জল) এবং কম উৎপাদনশীল মুরগির ঝুঁটি (অনুজ্জল)

৪) উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুরগিগুলোকে বাছাই করে কম উৎপাদনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল মুরগি গুলোকে পৃথক খাঁচায় রাখ।

৫) কম উৎপাদনশীল মুরগিগুলোকে খাঁমার থেকে ছাটাই কর।

সতর্কতা :

১. মুরগি ভালোভাবে সাবধানে ধরি যেন মুরগি ছুটে না যায় এবং বিষ্ঠা শরীরে না লাগে।

২. যাচাইকারী বৈশিষ্ট্য গুলো সঠিকভাবে যাচাই করি।

প্রশ্ন : -

১. পালক দেখে কীভাবে অধিক ও কম উৎপাদনশীল মুরগি পৃথক করবে?

২. দৈহিক ওজন দেখে অধিক উৎপাদন ও কম উৎপাদনশীল মুরগি কীভাবে শনাক্ত করবে?

৩. মাথার ঝুঁটিতে উৎপাদনের কী প্রতিফলন ঘটে?

জব নং -০৫
জবের নাম : মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা মুরগি পালনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জীবাণু থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পোল্ট্রির ঘর পরিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে বাজার থেকে জীবাণুনাশক সংগ্রহ করে কোম্পানির নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) ভালভাবে পোল্টির ঘর পরিষ্কার পরিছিন্ন করতে পারবে।
২) ছাত্র/ছাত্রীর জীবাণুনাশক মিশ্রনের দক্ষতা অর্জন করবে।
৩) জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে ঘর জীবাণুমুক্ত করতে শিখবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্র :

১) স্প্রেয়ার

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) জীবাণুনাশক
২) পানি
৩) বালতি
৪) অ্যাপ্রন ও দস্তানা
৫) ঝাড়ু

কাজের ধারা :

১) প্রথমে বিশ্বস্ত উৎস থেকে জীবাণুনাশক সংগ্রহ কর।

ডেটল	স্যাভলন	সেপটি ক্লিনস	প্রভিসেভ

২) ঘরটি ঝাড়ু দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নাও।
৩) নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান করে নাও।
৪) নির্দেশিত পরিমাণ পানি একটি বালতিতে নাও।
৫) নির্দেশিত মাত্রায় জীবাণুনাশক ঐ পানিতে মিশাও।
৬) মিশ্রনটি ভালোভাবে নাড়াচাড়া কর।
৭) তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি স্প্রেয়ারে তোল।
৮) এবার ঘরের মেঝে এবং দেয়ালে জীবাণুনাশক স্প্রে কর।

সতর্কতা :

১) জীবাণুনাশক অবশ্যই মাত্রা মোতাবেক মিশাতে হবে।

২) জীবাণুনাশক যেন শরীরে না লাগে ও নিঃশ্বাসে না যায় ।

প্রশ্ন :

১) জীবাণুনাশক কোন কোন জায়গায় প্রয়োগ করতে হয়?

২) জীবাণুনাশক নির্ধারিত মাত্রায় মেশাতে হবে কেন?

৩) মুরগির ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হয় কেন?

জব নং-০৬

জবের নাম : মুরগির ঘরে খাবার ও পানির পাত্র স্থাপন

জবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

মুরগির খামারে খাবার ও পানির পাত্র সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জবটিতে খামারে মুরগির বয়স ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পানি ও খাবার পাত্রের সংখ্যা হিসেব করে তা সুষ্ঠুভাবে সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) মুরগির খামারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও খাবার পাত্রের সংখ্যা হিসাব করে বের করতে পারবে।

২) পানির পাত্র ও খাবার পাত্র খামারে সঠিক জায়গায় স্থাপন করা

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) অটো ড্রিংকার।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) খাবার পাত্র।

২) পানির পাত্র।

কাজের ধারা :

১) মুরগির খামারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানি ও খাবার পাত্র হিসাব করে বের করে সংগ্রহ কর। (পানির পাত্র ৪০টির জন্য একটি এবং খাবার পাত্র ২০টির জন্য একটি হিসেবে)

চিত্র : ৬.১ মুরগির ঘরে খাদ্য ও পানি পাত্র স্থাপন

২০২০

২) মুরগির ঘরের মেঝেতে ৬ ইঞ্চি-৮ ইঞ্চি পুরু করে লিটার স্থাপন করো।
৩) ঘরের মধ্যে সঠিক দূরত্বে খাবার ও পানির পাত্রের স্থান চিহ্নিত কর।
৪) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানির ও খাবার পাত্র লিটার হবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় (মুরগির বুক বরাবর) স্থাপন কর।
৫) পানির পাত্র ও খাবার পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত কর।

সতর্কতা :

১) পানির পাত্র ও খাবার পাত্র সম্পূর্ণ ঘরে নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যেন সকল মুরগি খেতে পারে।
২) পানি ও খাবার পাত্র একই সারিতে স্থাপন না করে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে স্থাপন কর।

প্রশ্ন :

১) কোন ধরনের পানির পাত্র মুরগি পালনে সবচেয়ে বেশি উপযোগী?
২) একটি গোলায় বড় পানির পাত্রে কয়টি মুরগি পানি পান করতে পারবে?
৩) খাবার পাত্র কোথায় স্থাপন করতে হয়?

জব নং-০৭

জবের নাম : মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মুরগির বিছানাকে ইংরেজিতে বলা হয় লিটার। মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে লিটার পদ্ধতি অন্যতম। এ পদ্ধতিতে উপযুক্ত লিটার নির্বাচিত করে পরিষ্কার ও শুকনো লিটার জীবাণুমুক্ত করে ঘরে সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১) উপযুক্ত লিটার নির্বাচন করতে পারবে।
২) লিটার সঠিকভাবে স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) কাঠের গুঁড়া, তুস, আখের ছোবড়া, ছাই ইত্যাদি
২) ঝাড়ু
৩) চুন
৪) জীবাণুনাশক
৫) বালতি
৬) মগ

কাজের ধারা :

১) নিরাপত্তা মূলক পোষাক পড়ে নাও।
২) প্রথমে ঘরের মেঝে ভালোভাবে ঝাড়ু দিয়ে নাও।
৩) তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে মেঝে ধুয়ে নাও।

২০২০

চিত্র : ৭.১ মুরগির ঘরে লিটার স্থাপন

৩) নির্বাচিত লিটারের উপাদানগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নাও।
৪) ঘরের মেঝে শুকিয়ে নাও।
৫) লিটার ঠান্ডা হবার পরে মেঝেতে ৩"-৪" উঁচু করে বিছিয়ে দাও।
৬) লিটার মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখ জমাট বাঁধে কীনা।
৭) লিটার মাঝে মাঝে ওলট-পালট করে চুন মিশিয়ে দাও।
৮) লিটারের বিষ্ঠা নিয়মিত পরিষ্কার করে দাও।
৯) লিটার ভিজা ভিজা হয়ে গেলে লিটার পরিবর্তন করার ব্যবস্থা কর।

সতর্কতা :

১) লিটার যাতে মেঝেতে সমানভাবে পুরু হয় সেদিকে খেয়াল রাখ।
২) লিটার যাতে ভিজা ও জমাট বাঁধা না থাকে তা খেয়াল কর।

প্রশ্ন :

১) লিটার বিছানোর পূর্বে ঘরের মেঝেতে কী করতে হবে?
২) লিটার ভালো কীনা কীভাবে বুঝবে?
৩) লিটারে কেন চুন দেওয়া হয়?

২০২০

জব নং-৮

জবের নাম : খাঁচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি পালন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

বর্তমানে বেশিরভাগ বাণিজ্যিক লেয়ার খামারসমূহে খাঁচায় মুরগি পালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে লোহার তার দ্বারা নির্মিত একাধিক তলবিশিষ্ট খাঁচায় মুরগি পালন করা হয়। এতে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক মুরগি পালন করা যায় এবং মুরগির ডিম সংগ্রহসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে সহজ। খাঁচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উপকরণ ক্রয়, খাঁচা ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) খাঁচায় মুরগি স্থানান্তর করতে পারবে।
২) খাঁচায় মুরগি পালন করতে পারবে।
৩) সুষমভাবে খাদ্য, পানি, ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালোমানের ডিম উৎপাদন করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) হাইগ্রোমিটার
২) থার্মোমিটার
৩) সিরিঞ্জ
৪) ডিবিকার

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১)	খাদ্য	৬)	বালতি
২)	ডিমের ট্রে	৭)	টিকা
৩)	ডিমের ঝুড়ি	৮)	ঔষধপত্র
৪)	চট পর্দা	৯)	ট্রলি
৫)	কোদাল		

কাজের ধারা :

১. ঘর নির্বাচন করে যথাযথভাবে পরিষ্কার কর।
২. ঘরে খাঁচা, হাইগ্রোমিটার, থার্মোমিটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন কর এবং ফিউমিগেশন করে ঘর জীবাণুমুক্ত কর।
৩. খাঁচায় মুরগি প্রতিস্থাপিত কর। প্রতি ৩টি মুরগির জন্য মাপ (দৈর্ঘ্য ১৮" এবং প্রস্থ ১৭" সামনের উচ্চতা ১৭.৫" এবং পিছনের উচ্চতা ১৫")।
৪. খাঁচায় পানি ও খাদ্য সরবরাহ কর। বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য তালিকা মোতাবেক এবং লেয়ার মুরগির জন্য দৈনিক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ১১৫-১২০ গ্রাম খাদ্য/দিন।

২০২০

৫. আলোক প্রদান: বাড়ন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে শিডিউল মোতাবেক এবং ডিমপাড়া মুরগির দৈনিক ১৬ ঘণ্টা আলো ও ৮ ঘণ্টা অন্ধকার দাও। প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব ৭ ফুট উচ্চতায় স্থাপন কর।

৬. তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ কর : লেয়ার মুরগির ঘরের কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা ৬০-৬৫%।

৭. ঘরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত কর।

চিত্র : ৮.১ খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন

৮. সূচি মোতাবেক ভ্যাকসিন ও অন্যান্য ওষুধ প্রদান কর।
৯. বাড়ন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে (১৪ সপ্তাহ) ঠোঁট কাট।
১০. লেয়ার শেড থেকে দিনে ২ বার ডিম সংগ্রহ কর।
১১. নির্ধারিত সময় পরে কম ডিম দেওয়া মুরগিগুলো ছাঁটাই কর।
১২. রোগাক্রান্ত মুরগির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও।
১৩. ৭২ সপ্তাহ পরে মুরগি বিক্রি করে দাও।
১৪. সকল তথ্য রেকর্ড শীট ও রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ কর।

সতর্কতা :

১) বৈদ্যুতিক বাল্ব এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন আলো খাঁচায় প্রতি ধাপে ঠিকমতো লাগে।
২) পানির পাত্র নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
৩) অসুস্থ মুরগির জন্য ভিন্ন খাঁচা, পানি ও খাবার পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন :

১) খাঁচা পদ্ধতিতে লেয়ার মুরগি থেকে কোন গ্রেডের ডিম বেশি পাওয়া যায়?
২) ডিম দিনে কয় বার সংগ্রহ করতে হয়?
৩) তিনটি মুরগির জন্য খাঁচার মাপ কত?

জব নং -৯

জবের নাম : লেয়ার বাচ্চা ব্রুডিং

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

কাঙ্ক্ষিত ডিম উৎপাদনের জন্য লেয়ার বাচ্চার সঠিক ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা খুব প্রয়োজনীয়। মুরগির বাচ্চা অবস্থায় যেহেতু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের অঙ্গগুলি পুরোপুরি গঠিত হয়না তাই তাদের কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান করে, খাদ্য, পানি, আলো, টিকা ও ওষুধ প্রয়োগসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করতে হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১) বাচ্চা ব্রুডিং-এর ঘর প্রস্তুতকরণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে পারবে।
২) বয়স অনুযায়ী তাপমাত্রা প্রদান, টিকাদান ও ঔষধ প্রদান করতে পারবে।
৩) বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা বুঝে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১. থার্মোমিটার
২. হাইগ্রোমিটার
৩. সিরিঞ্জ
৪. নিডল
৫. ব্রুডার
৬. নিক্তি
৭. স্প্রে মেশিন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১)	লেয়ার বাচ্চা	৭)	লিটার
২)	ড্রপার	৮)	পেপার (পুরাতন)
৩)	পানির পাত্র	৯)	চট/পর্দা
৪)	খাবার পাত্র	১০)	চুন
৫)	চিকগার্ড	১১)	জীবাণুনাশক (আইয়োসান/পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট)
৬)	হোভার		

কাজের ধারা:

ক) সহজে আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে এমন একটি ঘর নির্বাচন কর।
খ) ঘরটি ভালোভাবে পরিষ্কার কর।
গ) জীবাণুনাশক দিয়ে ঘরটি ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত কর।
ঘ) ঘরটি শুকানোর পর মেঝেতে শুষ্ক লিটার বিছিয়ে দাও ৩ ইঞ্চি - ৪ ইঞ্চি পুরু করে।
ঙ) ঘরটির সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনানুসারে (এক/একাধিক) ব্রুডার স্থাপন কর। ৩০০-৪০০টি বাচ্চার জন্য ১টি ৪ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ব্রুডার নাও।

চ) বাচ্চার সংখ্যানুসারে ব্রুডারের চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে চিকগার্ড স্থাপন কর।
ছ) চিকর্গাডের ভিতরে লিটারের উপর পেপার বিছিয়ে দাও।
জ) পেপারের উপর প্রয়োজনানুযায়ী খাবার ট্রে ও পানির ট্রে স্থাপন কর।
ঝ) থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটার বাচ্চার গলার সমান উচ্চতায় ঝুলিয়ে দাও।
ঞ) বাচ্চাছাড়ার ১২ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু করে থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপ কর এবং খেয়াল রাখো তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আছে কি-না।
ট) প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা উঠলে চিকগার্ডের ভিতরে একদিনের বাচ্চা ছাড়।

ব্রুডিং পিরিয়ডে বিভিন্ন বয়সে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বাচ্চার বয়স (সপ্তাহ)	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (০ ডিগ্রী ফারেনহাইড)
১ম	৯৫
২য়	৯০
৩য়	৮৫
৪র্থ	৮০
৫ম	৭৫
৬ষ্ঠ	৭০

ঠ. ব্রুডিংকালে তাপমাত্রা কম-বেশি হলে বাচ্চার অবস্থান নিম্নরূপ লক্ষ করা যায় তা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করঃ

বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় :-

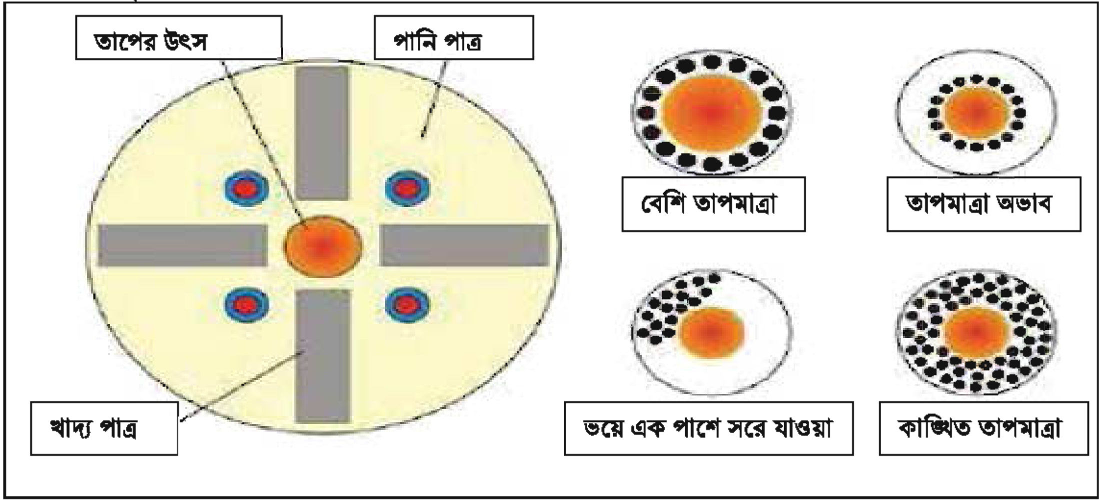

চিত্রঃ-৯.১ বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা নির্ণয়

ড) ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে তালিকা মোতাবেক প্রয়োজনীয় স্টাটার রেশন ও বিশুদ্ধ পানি পরিবেশন কর।
ঢ) নির্ধারিত তালিকা মোতাবেক ওষুধপত্র ও টিকা প্রদান কর।
ণ) ছয় সপ্তাহ পর ব্রুডার এবং চিক গার্ড সরিয়ে ফেল এবং
ত) এরপর বাচ্চাকে গ্রোয়ার শেডে স্থানান্তর কর।
থ) সকল তথ্য রেকর্ড শীট ও রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ কর।

সতর্কতা :

১) লিটার ভিজে গেলে দ্রুত সরিয়ে নতুন লিটার দিতে হবে।
২) পানির পাত্র প্রতিদিন জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
৩) টিকাদান কর্মসূচি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন :

১) ব্রুডিং ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে?
২) ব্রুডারের নিচে বাচ্চার অবস্থান দেখে তাপমাত্রা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে আছে কীনা কীভাবে বুঝতে পারবে?
৩) ব্রুডিং অবস্থায় আর্দ্রতা বেড়ে গেলে কীভাবে কমাতে হবে?

জব নং- ১০

জবের নাম : মুরগির ঠোঁট কাটা

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ঠোঁট কাটা বা ডিবিং মুরগির খামার ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লিটারের চেয়ে খাঁচায় পালিত মুরগির জন্য এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লেয়ার মুরগির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ঠোকরাঠুকরি কমানোর জন্য নির্দিষ্ট বয়সে ঠোঁট কাটা হয়। ঠোঁট কাটার ফলে বিভিন্ন বদঅভ্যাস দূর হওয়ার পাশাপাশি খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং মুরগি ডিম পাড়ার দিকে অধিক মনোযোগী হয়। খামারে ইলেকট্রিক ব্লেডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে উত্তপ্ত হলে মুরগির ঠোঁট ঠেসে ধরে প্রয়োজনীয় অংশ কাটা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) ছাত্র-ছাত্রীরা ডিবিকার মেশিন পরিচালনা করতে পারবে।
২) সঠিকভাবে ঠোঁট কাটতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) ডিবিকার মেশিন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) মুরগি
২) বিদ্যুৎপ্রবাহ
৩) মুরগির খাঁচা

কাজের ধারা :

১. মুরগির ঠোঁট কাটার ১ সপ্তাহ পূর্ব হতে নির্ধারিত মাত্রায় ভিটামিন কে, বি ও সি খেতে দাও।
২. প্রথমে বৈদ্যুতিক ডিবিকারে বিদ্যুৎ সংযোগ দাও ।
৩. অ্যাপ্রন ও দস্তানা পরে মুরগি সাবধানে ধরে নিয়ন্ত্রণে নাও। অসুস্থ ও দুর্বল মুরগি বাদ দাও।
৪. বৈদ্যুতিক ডিবিকারের ব্লেডটি লোহিত তপ্ত হলে বাম হাতের সাহায্যে একটি মুরগি নিয়ে ডান হাতের সাহায্যে মাথা ধরে হোল ব্লেডে এর ঠোঁট চেপে ধর ।
৫. এরপর ব্লেডটিকে মাত্র ২ সেকেন্ডের জন্য চলতে দাও এবং হোল ব্লেড থেকে মুরগির ঠোঁট সরিয়ে আন।

২০২০

চিত্র-১০.১ ডিবিকার যন্ত্র

৬. কাটার পর তপ্ত ব্লেডের সঙ্গে ভালোভাবে ঘসে কাটারাইজ কর যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় ।

৭. উপরের ঠোঁট কাটার সময় নাসারন্ধ্র থেকে ৬-৭ মি. মি. সামনে কাটো (১২ সপ্তাহ বয়সের ক্ষেত্রে)। বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে ৩-৪ মি. মি. সামনে কাট খেয়াল রাখো যেন নাসারন্ধ্র পুড়ে না যায়। বাচ্চা মুরগির ৪ সপ্তাহ এবং বাড়ন্ত মুরগির ১৪ সপ্তাহ বয়সে ঠোঁট কাট।

চিত্র : ১০.২ ঠোঁট কাটার ছবি

৮. নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁট অপেক্ষা কম কাট ।

৯. ঠোঁট কাটার পর মুরগিগুলোকে আলাদা খাঁচায় রেখে পর্যায় ক্রমে একইভাবে অন্য মুরগি গুলোর ঠোঁট কাট।

১০. উপরোক্ত একই পদ্ধতি অবলম্বন করে মুরগির নখ কাটো। তবে খেয়াল রাখো যাতে একই দিনে ঠোঁট এবং নখ কাটা না হয়।

১১. ঠোঁট ও নখ কাটার পর মুরগিগুলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় রাখো এবং পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা কর। পরবর্তী ১ সপ্তাহ ভিটামিন কে,বি ও সি খাওয়ানো অব্যাহত রাখো।

সতর্কতা :

১) ঠোঁট যাতে বেশি কেটে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখোতে হবে।

২) অতিরিক্ত গরমের সময় ঠোঁট কাটা উচিত নয়।

৩) অসুস্থ ও টিকাদানকৃত মুরগির ঠোঁট কাটা যাবে না।

২০২০

প্রশ্ন :

১) মুরগির ঠোঁট কতটুকু কাটতে হবে?

২) কী কী উপায়ে ঠোঁট কাটা যায়?

৩) ঠোঁট কাটার পর রক্তপাত হলে কী ব্যবস্থা নিবে?

জব নং-১১

জবের নাম : লেয়ার খামারের প্রকল্প স্থাপন (১০০০ লেয়ারের জন্য)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের জন্য খামার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। খামার পরিকল্পনার আয় ও ব্যয়ের খাত সমূহ চিহ্নিত করা হয়। এতে আয় ও ব্যয়ের খাত সমূহের হিসাব বাজার দর যাচাই পূর্বক করা হয়। মোট আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে নীট আয় হিসাব করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) লেয়ার মুরগির খামার পরিকল্পনা করতে পারবে।

২) খামারের আয় ও ব্যয়ের খাত সমূহ আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

৩) খামার আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় এবং নীট লাভ হিসাব করে বের করতে পারবে।

কাজের ধারা:

০১. খামার পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উপকরণ, কাঁচামাল বিক্রিকৃত ডিম ও মুরগি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর এবং তাদের বর্তমান বাজার দর যাচাই কর।

০২. মুরগির খামারে বাসস্থান তৈরি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের খাতের হিসাবের মোট ব্যয় লিপিবদ্ধ কর।

০৩. এরপরে আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ পৃথকভাবে হিসাব কর।

০৪. খামারের আয়ের খাতগুলো পৃথকভাবে হিসাব কর।

০৫. সর্বশেষে মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে নীট লাভ হিসাব কর।

নিম্নে একটি ১০০০ লেয়ার মুরগির খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখানো হলো:

স্থায়ী ব্যয় :

ক্রমিক নং	খরচের বিবরন	টাকার পরিমান
১	জমি ২৫০০ বর্গফুট	
২	মুরগির ঘর তৈরি বাবদ খরচ ৬০০ বর্গফুট প্রতি বর্গফুট ১০০০/- টাকা হিসেবে	৬০০০০০.০০
৩	অফিস কাম গোডাউন তৈরি বাবদ ১০০ বর্গফুট প্রতি বর্গফুট ১০০০/- টাকা হিসেবে।	১০০০০০.০০
	মোট	৭০০০০০.০০

২০২০

যন্ত্রপাতি ক্রয় :

ক্রমিক নং	খরচের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	খাঁচা ক্রয় (প্রতিটির জন্য ২০০/- টাকা হিসেবে) ১০০০টি×২০০/-	২০০০০০.০০
২	থার্মোমিটার (প্রতিটি ১০০/- টাকা হিসেবে) ২টি×১০০/-	২০০.০০
৩	হাইগ্রোমিটার (প্রতিটি ২৫০/- টাকা হিসেবে) ২টি×২৫০/-	৫০০.০০
৪	চট/পর্দা	৫০০০.০০
৫	ডিমের ট্রে (প্রতিটি ৩০/- টাকা হিসেবে) ১৫০টি× ৩০/-	৪৫০০.০০
৬	অন্যান্য (বালতি, কোদাল, বেলচা ইত্যাদি)	৩০০০.০০
৭	যন্ত্রপাতি ক্রয় মোট	২১৩২০০.০০
মোট স্থায়ী ব্যয়	স্থায়ী ব্যয়:	৭০০০০০.০০
	যন্ত্রপাতি ক্রয় মোট	২১৩২০০.০০
	মোট	৯১৩২০০.০০

আবর্তক ব্যয় :

ক্রমিক নং	খরচের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	মুরগি ক্রয় ১০০০টি প্রতিটি ৩৫০/- হারে	৩৫০০০০.০০
২	খাদ্য ক্রয় ১০০০×৯৫গ্রাম×৩৬৫×৪২টাকা/কেজি / ১০০০	১৪৫৬৩৫০.০০
৩	ঔষধপত্র ও টিকা	১০০০০.০০
৪	বিদ্যুৎ ও পানি ১০০০×১২	১২০০০.০০
৫	শ্রমিকের মজুরি : ১জন × ৬০০০টাকা× ১২ মাস	৭২০০০.০০
৬	ব্যাংক সুদ ৬০০০০০.০০×১২%(ব্যাংক লোন ৬০০০০০.০০ দেখানো হয়েছে)	৭২০০০.০০
৭	অবচয় মূল্য : ঘরের ৮০০০০০.০০ এর ৫% + যন্ত্রপাতির ২১৩২০০.০০ এর ১০%মোট (৪০০০০.০০+২১৩২০.০০)	৬১৩২০.০০
৮	অন্যান্য	১০০০০.০০
	মোট আবর্তক ব্যয়	২০৪৩৬৭০.০০

আয় :

১	ডিম বিক্রি: ২৮৫টি×১০০০×৭/-(প্রতিটি ৭/-- টাকা হিসেবে)	১৯৯৫০০০.০০
২	বাতিল মুরগি বিক্রি: ৯৫০×১.৫কেজি×১৪০/-(প্রতিটি ১৯৫/- টাকা হিসেবে)	১৯৯৫০০.০০
৩	লিটার বিক্রিঃ	৫০০০০.০০
		২২৪৪৫০০.০০

২০২০

লাভের হিসাব :

মোট আয়	২২৪৪৫০০.০০
মোট ব্যয়	২০৪৩৬৭০.০০
নীট লাভ	২০০৮৩০.০০

নীট বাৎসরিক লাভঃ দুই লক্ষ আটশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

সতর্কতা :

১) যন্ত্রপাতি ও উপকরণের বাজার দর সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে।

২) ডিম বিক্রির সময় বাজার মূল্য পুন: পুন: যাচাই করতে হবে।

প্রশ্ন :

১) অবচয় মূল্য হিসাব বা স্থান ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় কেন?

২) মুরগির মৃত্যু হার ধরে খামার পরিকল্পনা করা হয় কেন?

জব নং-১২

জবের নাম : লেয়ার খামারে টিকাদান পদ্ধতি

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

লেয়ার খামারে রোগ প্রতিরোধ ও সুষম উৎপাদনের ধারা বজায় রাখতে টিকা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের টিকা কলেরা, গামব্রো, রানীক্ষেত ইত্যাদি বিশ্বস্ত থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ জীবাণুমুক্ত করে টিকাদান সূচী মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

উদ্দেশ্য :

১) বিভিন্ন ধরনের টিকার সঙ্গে পরিচিতি হতে পারবে।

২) টিকাদান কালে বিভিন্ন টিকা গোলাতে পারবে।

৩) লেয়ারের বিভিন্ন ধরনের টিকাদান সঠিকভাবে করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

২) সিরিঞ্জ

৩) অটো ভেক্সিনেটর

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) বিসিআরডিভি

২) আরডিভি

৩) গামবোরো টিকা

২০০ ৪) মারেক্স টিকা

৫) ফাউল পক্স টিকা
৬) ফাউল কলেরা টিকা
৭) জীবাণুনাশক (আইয়োসান/লাইজল)
৮) পাতিত পানি/ডায়লুয়েন্ট
৯) বীকার

কাজের ধারা:

১. টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে নাও।
২. বিশ্বস্ত উৎস হতে টিকাবীজ সংগ্রহ করি।
৩. সূচি মোতাবেক সুস্থ বাচ্চার শেডে যাও।
৪. টিকা প্রদানের সময় হলে দিনের ঠাণ্ডা অংশে (সকাল বা সন্ধ্যা) ছায়াযুক্ত স্থানে টিকাবীজ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়লুয়েন্ট বা পাতিত পানির সাথে মিশ্রিত কর (বসন্ত টিকার ক্ষেত্রে)।
৫. এরপর বাচ্চা/মুরগিকে সঠিকভাবে ধরে আয়ত্তে আনো ও নিম্নলিখিতভাবে টিকা প্রদান কর।

বিসিআরডিভি টিকা প্রদান

ক) ১০০ মাত্রার ভায়াল ৬ সিসি পাতিত পানিতে মেশাও। খ) প্রতি বাচ্চাকে ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোঁটা করে টিকা দাও। গ) এই ভ্যাকসিন ৩-৭ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ কর।	

চিত্র : ১২.১ বিসি আরডিভি টিকা

আরডিভি টিকা প্রদান :

ক) ১০০ মাত্রার ভ্যাকসিন ১০০ সিসি বিশুদ্ধ পানিতে মেশাও। খ) ১ সি সি করে রানের মাংসে ইনজেকশন দাও। গ) ২ মাস বয়সে ১ম বার এবং ৬ মাস পর পর এই টিকা প্রয়োগ কর।	

চিত্র:১২.২ আরডিভি টিকা

গামবোরো রোগের টিকা প্রদান:

ক) টিকাবীজ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডায়ালুন্টের সাথে মিশাও। খ) ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোটা করে প্রয়োগ কর । গ) সাধারণত: ৩-১১ দিন বয়সে ১ম বার এবং ১৮-২১ দিন বয়সে ২য় ডোজ প্রয়োগ কর ।	

চিত্র ১২.৩গামবোরো রোগের টিকা

ফাউল পক্স রোগের টিকা প্রদান:

ক)১০০ মাত্রার ভায়াল ৩ সিসি পাতিত পানিতে মেশাও। খ) পাখার নিচে পালক বিহীন স্থানে বাই ফর্ক নিডল দিয়ে রক্ত শিরার উপর প্রয়োগ কর । গ) যদি আশপাশের খামারে এই রোগের প্রভাব বেশি দেখা দেয় তবে ১৫ দিন বয়সে পিজিয়ন পক্স টিকা দাও । ঘ) ৩২তম দিন বয়সে প্রথম বার এবং ১ বছর পর বুস্টার ডোজ প্রয়োগ কর।	

চিত্র : ১২.৪ ফাউল পক্স

ফাউল কলেরা রোগের টিকা প্রদান

ক)এই ভ্যাকসিন ২.৫ মাস বয়সে ১ সি সি করে রানের মাংসে ইনজেকশন দাও । খ)প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়ার ১৫ দিন পর পুনরায় ১ সি সি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ কর । গ)তারপর ৬ মাস পরপর ১ সি সি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ কর।	

চিত্র:১২.৫ ফাউল কলেরা

৬. টিকাদানকৃত বাচ্চাকে পৃথক রাখ।
৭. গরমকালে ১ঘন্টা ও শীতকালে ২ঘন্টার মধ্যে টিকাদান শেষকর।
৮. অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুঁতে ফেল।
৯. পুন : ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ কর।

সতর্কতা :

১) নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি/কম কোনো টিকা প্রদান করা যাবে না।
২) দিনের ঠান্ডা অংশ এবং বড় খামারের ক্ষেত্রে রাতে টিকাদান সম্পন্ন করতে হবে।
৩) অবশিষ্ট টিকা ও ভায়াল মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন : -

১. ভাইরাল টিকা কত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করবে?
২. টিকা প্রদানের পূর্বে কী কী বিষয় বিবেচনা করবে?
৩. মিশ্রিত টিকাবীজ কত সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়?

জব নং-১৩

জবের নাম : লেয়ার মুরগির সুষম খাদ্য তৈরিকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

খামারের মোট ব্যয়ের ৬০-৭০% খাদ্য খাতে হয়ে থাকে। তাই সুষম খাদ্য তৈরি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লেয়ার মুরগির বয়স অনুপাতে তিন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হয় যথা : স্টারটার, গ্রোয়ার ও লেয়ার। এজন্য পুষ্টিমানের তালিকা অনুযায়ী হিসাব করে রেশন ফরমুলেশন করে খাদ্য উপাদান সমূহ মিশিয়ে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বস্ত উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ভুট্টা, চাউলের কুঁড়া, তিলের খৈল ইত্যাদি সংগ্রহ করে মুরগির চাহিদার ভিত্তিতে রেশন তৈরি করা হয়।

উদ্দেশ্য :

১) লেয়ার মুরগির রেশন তৈরি করতে পারবে।
২) খাদ্য উপাদান নির্বাচন ও মিশ্রণ করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) নিক্তি
২) ক্যালকুলেটর

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা	৭)	ঝিনুক চূর্ণ	১৩)	কক্সিডিওস্ট্যাট
২) কাগজ, কলম, পেনসিল	৮)	খাদ্য লবন	১৪)	সিটিসি
৩) ভূট্টা	৯)	ফিশ মিল	১৫)	এনজাইম
৪) চালের কুঁড়া	১০)	প্রোপ্যাক	১৬)	টক্সিন বাইন্ডার
৫) তিলের খৈল	১১)	ডিসিপি	১৭)	পলিথিন
৬) সয়াবিন মিল	১২)	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	১৮)	বস্তা

কাজের ধারা:

১. তালিকা মোতাবেক ভালো মানের খাদ্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ কর।
২. বয়স ও উৎপাদন অনুসারে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানের তালিকা মোতাবেক রেশন ফরমুলেশন কর।
৩. খাদ্য উপাদানসমূহ তালিকা মোতাবেক মেপে পৃথক পৃথক পাত্রে রাখ।
৪. কম পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমূহ একসাথে মিশ্রিত কর।
৫. কম পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের সাথে পর্যায়ক্রমে মেশাও।
৬. খাদ্য উপাদানসমূহ ভালোভাবে মিশ্রিত করার পর ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ কর ও মুরগিকে খেতে দাও।
৭. নিম্নে লেয়ার মুরগির নমুনা খাদ্য তালিকা প্রদান করা হলো:

লেয়ার খাদ্য তালিকা

উপাদানের নাম	লেয়ার স্টারটার (০-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার গ্রোয়ার(৯-১৮ সপ্তাহ)	লেয়ার (১৯ সপ্তাহের উর্ধ্বে)
গম/ ভুট্টা ভাঙ্গা (কেজি)	৫০	৪৭	৪৫
তিলের খৈল (কেজি)	১০	১২	১০
প্রোটিন কনসেনট্রেট ৬০%(কেজি)	৫	৫	৭
বোনমিল ও মিটমিল৫০%(কেজি)	৩	-	-
সয়াবিন মিল(কেজি)	১২	৬	৬
রাইস মিল(কেজি)	১৬	২৬.৫	২৬.৭
ঝিনুব চুন(কেজি)		৪	৮
ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট(গ্রাম)	৯২৫	-	-
লবণ(গ্রাম)	২৫০	৫০০	৫০০
জি এস ভিটামিন(গ্রাম)	৩০০	২৫০	-
এল ভিটামিন(গ্রাম)	-	-	৩০০
ডট(গ্রাম)	৫০	৫০	-
সালকিন/সালষ্টপ(গ্রাম)	২০০	২০০	২০০
সর্বাটক্স/মল্ডষ্টপ(গ্রাম)	১০০	২০০	১০০
মিথিয়নিন(গ্রাম)	৫০	৫০	৫০

২০২০

লাইসিন(গ্রাম)	১০০	১০০	১০০
কলিন(গ্রাম)	২৫	৫০	৫০
মোট (কেজি)	১০০	১০০	১০০

সতর্কতা :

১) প্রতিটি সতেজ খাদ্য উপাদান ব্যবহার করতে হবে।

২) টক্সিন বাইন্ডার মিশণ সুষম ও যথোপযুক্ত মাত্রায় করতে হবে।

৩) মিশ্রিত খাদ্য ৭-১০ দিনের বেশি রাখা যাবে না।

প্রশ্ন :

১) আমিষ জাতীয় কোন কোন খাদ্য উপাদান রেশন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে?

২) লেয়ার ও বাচ্চা মুরগির রেশনে কোন উপদানটি ব্যবহারের বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়?

৩) লেয়ার মুরগির রেশনে ঝিনুকচূর্ণ ব্যবহার করা হয় কেন?

জব নং-১৪

জবের নাম : মুরগির খামারে তথ্য সংরক্ষণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

পোল্ট্রি খামারে তথ্য সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পোল্ট্রি খামার লাভজনকভাবে পরিচালনা করার ও তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরণের রেকর্ড শীট ও রেজিস্ট্রার প্রয়োজন। মুরগি পালনের ধরণ, উৎপাদন অবস্থা, খামারের কাজ ও ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রেকর্ড শীট ও রেজিস্টার তৈরি করে সে মোতাবেক খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেকর্ড করা হয়। লেয়ার খামারে উৎপাদন তথ্য, খাদ্য গ্রহন তথ্য, ভ্যাক্সিনেশন তথ্য রোগের তথ্য, মুরগির বয়স, মুরগির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য রাখা আবশ্যক। সঠিক ভাবে পরিচালনার স্বার্থে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহ সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

উদ্দেশ্য :

১) খামারের টিকাদান কর্মসূচী প্রণয়ন করতে তথ্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

২) মুরগির উৎপাদন পর্যায় জানতে সহায়তা করে।

প্রয়োজনীয় উপকরন :

১) কাগজ

২) কলম

৩) বক্স ফাইল/রেজিস্ট্রার

কাজের ধারা :

১.খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের নমুনা সংগ্রহ কর

২. প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম ও পেন্সিল সংগ্রহ কর।

৩. খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের রেকর্ড রেকর্ডশীট ও রেজিস্টারের একটি তালিকা তৈরি কর। ২০২০

৪. প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে সংগৃহীত নমুনা রেকর্ডশীট ও রেজিস্টারের সাথে তুলনা করে নিজস্ব খামারের জন্য রেকর্ডশীট ও রেজিস্টার তৈরি কর।

নিম্ন লিখিতভাবে খামারে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের রেকর্ডশীট ও রেজিস্টার তৈরি করা যায়।

গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর
লেয়ার খামারের রেকর্ডশীট

ফ্লকের তথ্যসমূহ (লেয়ার)

.... তারিখ থেকে .... তারিখ পর্যন্ত

ফ্লক নং ব্যাচ নং দল নং

মুরগির সংখ্যা :
মুরগির জাত :
মুরগির বয়স :
ডিম উৎপাদনের বয়স :
ডিম উৎপাদন সময় (দিন) :
ডিম উৎপাদনের সংখ্যা :
ডিম উৎপাদনের হার :
মোট মৃত্যুর সংখ্যা :
মৃত্যুর হার :
প্রতিটি মুরগির পূর্ব মূল্য :
প্রতিটি মুরগির বর্তমান মূল্য :
অবশিষ্ট মুরগির সংখ্যা :
মোট খাদ্য গ্রহণ :
দৈনিক পাখিপ্রতি খাদ্য গ্রহণ :
আয়-ব্যয়ের হিসাব :

ব্যয়ের বিবরণ	মূল্য (টাকা)	আয়ের বিবরণ	মূল্য (টাকা)
মোট আয়		মোট ব্যয়	

লাভ / লোকসান

মতামত :

২০২০

ইউনিট কর্মকর্তার স্বাক্ষর বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর
ডিম পাড়া মুরগির সাপ্তাহিক রেকর্ড শীট

ফ্লক নং পেন নং ব্যাচ নং দল নং

মুরগির বর্তমান বয়স (সপ্তাহ/মাস):

ডিম উৎপাদনের বয়স(সপ্তাহ/মাস):

শুরুতে মুরগির সংখ্যা :

এ সপ্তাহের শুরুতে মুরগির সংখ্যা :

এ সপ্তাহের শেষে মুরগির সংখ্যা :

দিবস	তারিখ	ডিম উৎপাদন			মৃত্যু	খাদ্য সরবরাহ	আর্দ্রতা	তাপমাত্রা	টিকা/ঔষধ সরবরাহ	দায়িত্ব পালনকারীর স্বাক্ষর
		ভালো ডিম	ভাঙ্গা ডিম	মোট						
এ সপ্তাহে মোট										
পূর্ব সপ্তাহ পর্যন্ত মোট										
অদ্যাবধি সর্বমোট										

এ সপ্তাহে মোট মুরগির মৃত্যুর হার (%) : অদ্যাবধি মুরগির গড় মৃত্যুর হার (%) : এ সপ্তাহে মুরগি প্রতি দৈনিক খাদ্য গ্রহণ : অদ্যাবধি মুরগি প্রতি মোট খাদ্য গ্রহণ :	এ সপ্তাহে ডিম পাড়ার শতকরা হার (%) : এ পর্যন্ত গড় ডিম পাড়ার শতকরা হার (%) : এ পর্যন্ত প্রতিটি মুরগি গড়ে ডিম দিয়েছে :
ইউনিট কর্মকর্তার স্বাক্ষর	বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর
ব্রয়লার খামারে রেকর্ড শীট

ফ্লকের তথ্যসমূহ (ব্রয়লার/ ককরেল)

.... তারিখ থেকে .... তারিখ পর্যন্ত

ফ্লক নং ব্যাচ নং দল নং

মুরগির সংখ্যা :

মুরগির জাত :

জন্ম তারিখ :

প্রাপ্তি স্থান :

বাচ্চা আনার তারিখ :

বাচ্চা বিক্রির তারিখ :

বাচ্চা পালনের কার্যকরী দিন :

বাচ্চার মৃত্যুর সংখ্যা :

মৃত্যুর হার :

বিক্রীত বাচ্চার সংখ্যা :

বাচ্চার প্রারম্ভিক গড় ওজন (গ্রাম) :

বাচ্চার চুড়ান্ত গড় ওজন (গ্রাম) :

মোট খাদ্য গ্রহন :

গড়ে দৈনিক খাদ্য গ্রহণ :

খাদ্য দক্ষতার হার :

টিকা প্রয়োগ সূচি :

তারিখ	টিকার নাম	প্রয়োগ পদ্ধতি

চিকিৎসা

তারিখ	রোগের নাম	ঔষধ প্রয়োগ

আয় ব্যয়ের হিসাব :

ব্যয়ের বিবরণ	মূল্য (টাকা)	আয়ের বিবরণ	মূল্য (টাকা)
মোট আয়		মোট ব্যয়	

লাভ / লোকসান

মতামত :

ইউনিট কর্মকর্তার স্বাক্ষর বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

২০২০

গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর
ডিম ফুটানোর রেকর্ড শীট

পদ্ধতি	ব্যাচ নং	দল নং

১	ডিম বসানোর তারিখ	:	
২	বাচ্চা ফুটার সম্ভাব্য তারিখ	:	
৩	বাচ্চা ফুটার তারিখ	:	
৪	কার্যকরি দিন	:	
৫	ডিমের সংখ্যা	:	
৬	ডিমের ধরন	:	
৭	ডিম সংগ্রহের উৎস	:	
৮	ফুটন্ত বাচ্চার সংখ্যা	:	
৯	বাচ্চা ফুটার হার (%)	:	
১০	গড় তাপমাত্রা	:	
১১	গড় আর্দ্রতা	:	
১২	ডিমের ক্যান্ডলিং	:	

	তারিখ	উর্বর	অনুর্বর	বাতিল	মোট	উর্বর ডিমের হার
১ম ক্যান্ডলিং						
২য় ক্যান্ডলিং						
৩য় ক্যান্ডলিং						

১.আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়ের বিবরণ	মূল্য (টাকা)	আয়ের বিবরণ	মূল্য (টাকা)
মোট ব্যয়		মোট আয়	

মোট লাভ/ ক্ষতি

মতামত:

পরিদর্শকের স্বাক্ষর বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

২০২০

গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর
ডিম ফুটানোর দৈনিক রেকর্ড শীট

পদ্ধতি	ব্যাচ নং	দল নং

তারিখ ও দিবস	সময়	তাপমাত্রা	আর্দ্রতা	ক্যান্ডেলিং	অন্যান্য	মন্তব্য	স্বাক্ষর

পরিদর্শকের স্বাক্ষর বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

সতর্কতা :

১) উৎপাদনের সকল তথ্য থাকতে হবে।
২) সকল ব্যয়ের তথ্য থাকতে হবে।
৩) বিভিন্ন তথ্য অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভরশীল হতে হবে।
৪) সকল কর্মসূচির উল্লেখ থাকবে।

প্রশ্ন :

১) ডিম ফুটানোর রেকর্ড শীটে কী কী তথ্য থাকে ?
২) লেয়ার খামারে কী কী তথ্য রাখা দরকার?
৩) টিকাদান কর্মসূচি প্রণয়ণে তথ্য কী সহায়তা করে?

জব নং-১৫

জবের নাম : খামারের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

জৈব নিরাপত্তা বলতে পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনা ও এর সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি বর্গের নিরাপত্তাকে বুঝায়। পোল্ট্রি পালনের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যাক্তির জীবাণুমুক্ত হওয়ার উপর খামারের জৈব নিরাপত্তা বহুলাংশে নির্ভর করে। মুরগি ক্ষুদ্র প্রাণী বিধায় এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। হাইব্রিড মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো কম। সেজন্য খামার পরিচালনার সময় খেয়াল রাখতে হয় যেন খামারে রোগ প্রবেশ করতে না পারে। যে সমস্ত কারণে রোগ ছড়ায় তা অনুসন্ধান করে তা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণই জীব নিরাপত্তা।

জবের উদ্দেশ্য :

১) জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।
২) খামারে রোগ নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) অটো স্প্রেয়ার
২) জীবাণুনাশক
৩) নিরাপত্তামূলক পোষাক

কাজের ধারা :

১) খামার স্থাপনের সময় অন্য পশু পাখির খামার থেকে যতটা সম্ভব দূরে স্থাপন কর।
২) প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলো-বাতাস নিশ্চিত কর।
৩) সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা।
৪) খামারে নতুন মুরগির সময় কোয়ারেনটাইন পদ্ধতি অনুসরণ কর ।
৫) খামারের প্রবেশপথে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর
৬) খামারের প্রবেশপথে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবস্থা নিশ্চিত কর।
৭) ইঁদুর, চিকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ এবং পশু-পাখি যাতে খামারে প্রবেশ করতে না পারে সেটা নিশ্চিত কর।
৮) কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি প্রয়িন করে টিকা প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৯) মৃত মুরগি যথাযথভাবে সৎকারের ব্যবস্থা করা।
১০) খামারের বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ দ্রুত উপযুক্ত জায়গায় সরিয়ে ফেলা।

সতর্কতা :

১) জৈব নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত সবগুলো কাজই করতে হবে, কোনোটি বাদ দিলে চলবে না।
২) খামারের প্রবেশদ্বার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রশ্ন :

১) জৈব নিরাপত্তার উদ্দেশ্য কী?
২) কোয়ারেনটাইন কী ও তা কীভাবে করা হয়?
৩) হ্যাচারীবাহিত রোগ প্রতিরোধের উপায় কী?

জব নং-১৬

জবের নাম : খামার পরিদর্শণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

পোল্ট্রি পালনে খামার পরিদর্শন একটি অত্যাবশকীয় বিষয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রযুক্তি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি ঘটে। এক্ষেত্রে প্রথমে একটি আদর্শ খামার যাচাই করে, খামার কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে তাদের অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত দিনে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

জবের উদ্দেশ্য :

১) ছাত্র/ছাত্রী উদ্বুদ্ধ হয়।

২) নতুন প্রযুক্তির সাথে ছাত্র/ছাত্রীদের পরিচিতি ঘটে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

১) পরিবহনের জন্য গাড়ি

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১) তৈরিকৃত প্রশ্ন শীট

২) কলম

৩) কাগজ

কাজের ধারা :

১. যে খামারটি পরিদর্শন করা হবে তার কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে তাদের অনুমতি সাপেক্ষে খামার পরিদর্শনের জন্য তারিখ ও সময় নির্ধারন করা।

২. প্রয়োজনে যথাযথ পরিবহন নিশ্চিত করা।

২. নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে খামারে উপস্থিত হওয়া।

৩. খামারে প্রবেশের সময় নিজেকে জীবাণুমুক্ত করে নির্ধারিত পোশাক পরে খামারে প্রবেশ কর।

৪. কর্তৃপক্ষের গাইড মোতাবেক খামার পরিদর্শন করা।

৫. খামার পরিদর্শনের সময় প্রশ্নোত্তর শীট অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

নিম্নে খামার পরিদর্শনের নমুনা প্রশ্নোত্তর শীট তৈরি করে সে. মোতাবেক তথ্য সংগ্রহ কর

খামার পরিদর্শনের তথ্যাবলি

১. খামারের নাম :

২. খামারের ঠিকানা :

৩. মালিকের নাম :

৪. খামারের প্রকার : বাণিজ্যিক/পারিবারিক :

৫. অর্থ জোগানের উৎস :

৬. খামারে মুরগির ধরন :

২০২৫ ৭. জাত/হাইব্রিডের নাম :

৮. পালন পদ্ধতি :
৯. মুরগির বয়স :
১০. মুরগির সংখ্যা
১১. ঘরের সংখ্যা ও আকার :
১২. বর্তমান উৎপাদন অবস্থা :
১৩. খাদ্য ও পানি পাত্রের সংখ্যা :
১৪. দৈনিক খাদ্য প্রদানের তথ্যাবলী :
পরিমাণ.
শক্তি
আমিষ
ক্যালসিয়াম
ফসফরাস
লাইসিন
মিথিওনিন
১৫. পানি, আলো, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :
১৬. লিটারের অবস্থা :
১৭. মুরগির স্বাস্থ্যগত অবস্থা :
১৮. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথ্যাবলি :
১৯. খামারের রোগ নিয়ন্ত্রণ (জীব নিরাপত্তা) ব্যবস্থা :
২০. খামারের কৃমি মুক্তকরণ, ঔষধ প্রয়োগ ও টিকাদান ব্যবস্থাপনা :
২১. মুরগির মৃত্যু হার :
২২. খামারের রেকর্ডপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ ব্যবস্থা :
২৩. উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা :
২৪. খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব :
২৫. লিটারের ব্যবস্থাপনা :
২৬. মৃত মুরগির সৎকার ব্যবস্থা :

৬. খামার পরিদর্শণ শেষে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে খামার ত্যাগ কর।

সর্তকতা :
১) খামারের প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই নিজেকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
২) খামার সাবধানে পরিদর্শন করতে হবে যাতে খামারের কোনো ক্ষতি না হয়।
৩) প্রশ্নোত্তর কালে বিব্রতকর প্রশ্ন এড়িয়ে যাও।

প্রশ্ন :
১) খামার পরিদর্শন কেন প্রয়োজন?
২) খামার পরিদর্শনের পূর্বে নিজেকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে কেন?
৩) তোমার কাছে মনে হয়েছে এমন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কী কী ? ২০২০

তথ্য উৎস

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক
১	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফামিং-১	মো: মাহবুবুর রশীদ
২	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফামিং-২	মো: মাহবুবুর রশীদ
৩	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফামিং-১	ড: এ এইচ এম মোস্তফা
৪	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফামিং-২	ড: এ এইচ এম মোস্তফা
৫	ষ্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটি শীট- নবম শ্রেণি	মো: জহুরুল ইসলাম
৬	ষ্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটি শীট- দশম শ্রেণি	মো: জহুরুল ইসলাম
৭	গৃহপালিত পাখির রোগ ও প্রতিকার(বি এ ই)	ড: আ ন ম আমিনুর বহমান
৮	গৃহপালিত পাখির পালনও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা	প্রফেসর ড: এস এম বুলবুল
৯	আধুনিক পদ্ধতিতে লাভজনক হাঁস-মুরগি পালন	ড: মাহবুব মোস্তফা
১০	পশুপালন ও পশুচিকিৎসা	ডা: নীলোৎপল ঘোষ
১১	গৃহপালিত পশু পাখির চিকিৎসা	ড: মো: জালাল উদ্দিন সরকার
১২	গৃহপালিত পাখির পালন	ড: মো: মোফাচ্ছের
১৩	আধুনিক হাঁস-মুরগি পালন শিক্ষা	সুভাষচন্দ চট্টোপাধ্যায়
১৪	মাছ, পশু, পাখি ও কৃষি গাইড	সিরাজুল করিম
১৫	সহজ উপায়ে হাঁস-মুরগি পোল্ট্রি	কৃষিবিদ কামাল হোসেন
১৬	হাঁস-মুরগি-কবুতর-কোয়েল পালন ও চিকিৎসা	আবদুল্লাহ্ আল-মামুন
১৭	পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা	ড: এম এ সামাদ
১৮	হাঁস-মুরগি-কোয়েল পালন	ড: সাহাবদ্দিন খান
১৯	ব্রয়লার মুরগি পালন চিকিৎসা ও মাংস বৃদ্ধি উপায়	ড: মো: আখতার হোসেন চৌধুরী
২০	পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা	মো: আবদুর রাজ্জাক মিয়া
২১	হাঁস-মুরগি পালন ও চিকিৎসা	প্রভাসচন্দ্র দাস
২২	কোয়েল পালন	ড: আ ন ম আমিনুর বহমান
২৩	আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন	মিজানুর রহমান
২৪	কৃষিশিক্ষা (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) প্রথম পত্র	ড. মো: আনিছুর রহমান
২৫	কৃষিশিক্ষা (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) দ্বিতীয় পত্র	ড. মো: আনিছুর রহমান

২০২০

খোদা হাফেজ

২০২০ শিক্ষাবর্ষ

পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য